ওয়েস্টার্ন

পাতকী
জ্বলন্ত পাহাড়

কাজী মাহবুব হোসেন



সেবা প্রকাশনা

দুটি বই একত্রে

ওয়েস্টার্ন
দুটি বই একত্রে

পাতকী

কাজি মাহবুব হোসেন

নির্বিবাদী, শান্তিপ্রিয় মানুষ জাভেদ বক্স, কারও সাতে-পাঁচে নেই। লোকালয় ছেড়ে বহুদূরে দুর্গম এক উঁচু এলাকায় র‍্যাঞ্চ করেছে সে। কিন্তু সেই জনবিরল, বিরান জায়গাতেও শান্তি নেই—হঠাৎ টেক্সাস থেকে বিশ-পঁচিশ জনের একটা সশস্ত্র দল এসে হাজির, ভিটে ছাড়া করবে তাকে গায়ের জোরে। রুখে দাঁড়াল বাঙালী যুবক।

জ্বলন্ত পাহাড়

পালাচ্ছে জেকব। পিছনে ধাওয়া করে আসছে ফ্রীডম শহরের একদল লোক। ধরতে পারলে ফাঁসিতে ঝোলাবে ওরা তাকে। কেন? ওদের ধারণা, অন্যায়ভাবে পিঠে গুলি করে হত্যা করেছে সে ওই শহরেরই একজন—ডেরিককে। কিন্তু জেকবের আরেক নাম শক্তপাল্লা! সবাই জানে হারানো ওয়্যাগনের সোনা লুকানো আছে নরমন কুয়ার আশেপাশেই কোথাও—পথ দেখিয়ে সেই কুয়ার কাছে কেন নিয়ে এল ওদের জেকব? খেলাচ্ছে ওদের?

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

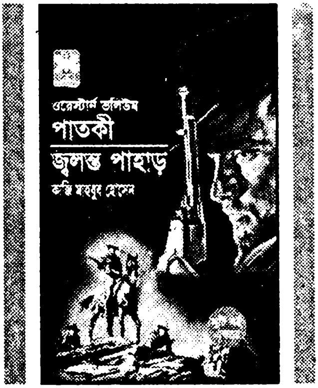
ওয়েস্টার্ন

পাতকী

জ্বলন্ত পাহাড়

[দুটি বই একত্রে]

কাজি মাহবুব হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-8241-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail. Sebaprok@citechco.net
Web Site. www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

PATAKI

JALANTA PAHAD
Two Western Novels
By: Qazi Mahbub Hussain

সেবা
প্রকাশনী

চল্লিশ টাকা


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
স্ক্যানিং এডিটিং
শুভম
B
শু ভ ম
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ওয়েস্টার্ন

পাতকী

জ্বলন্ত পাহাড়

কাজী মাহবুব হোসেন

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুরিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **গ্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **ইফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসুরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দস্যু, ঘাতক, ঘায়েল **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ **আবু মাহদী:** পাঞ্জার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস। **সুস্ময় আচার্য:** অপবাদ **সায়েম সোলায়মান:** সঙ্কট।

পাতকী

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৩

এক

ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন চারদিকে কেউ একটা বৃষ্টির ফোঁটায় বোনা পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে। ঘোড়ার খুর অনেকখানি ডেবে যাচ্ছে বৃষ্টি ভেজা নরম মাটিতে। বর্ষাতি গায়ে ঘোড়ার পিঠে কুঁজো হয়ে বসে ঘোড়া চালাতে চালাতে তার সুন্দর উষ্ণ কেবিন আর এক কাপ গরম কফির কথাই ভাবছিল জাভেদ। হঠাৎ আর একটা ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন নজরে পড়ল ওর।

মানুষের পায়ের চাপে লোকটা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকেই হেলে পড়ে ঘাস। কিন্তু ঘোড়া ছুটিয়ে গেলে ঘোড়ার খুর ঠিক উল্টোদিকে নুইয়ে দেয় ঘাসকে। যে ট্রেইলটা জাভেদের চোখে পড়ল, সেটা দক্ষিণ-পশ্চিমের জনমানবহীন নির্জন পাহাড়ের দিক থেকে এসে আরও নির্জন পাহাড়ের দিকে গেছে তার র‍্যাঞ্চের ওপাশে।

ভুরু কুঁচকে চোখ ছোট করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েও কিছুই নজরে পড়ল না তার—কেবল একটা লোকের ঘোড়ায় চড়ে ওই পাহাড়ের দিকে চলে যাবার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে হাঁটু-সমান ঘাস বিছানো মাঠে।

'অবাক কাণ্ড!' নিজে নিজেই বলে উঠল জাভেদ, 'এমন দিনে কারও ওই পাহাড়ের দিকে যাবার কী এমন দরকার পড়তে পারে?'

শুধু এমন দিনে বলে নয়, ভাল দিনেও কারও ওদিকে কোন দরকার থাকতে পারে না।

দুনিয়ার প্রায় কোনকিছুই কারণ ছাড়া ঘটে না বলে জাভেদের বিশ্বাস। এর কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে বিব্রত বোধ করছে সে। কয়েকদিন ধরেই এদিকে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। নিউ মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চলে এর মধ্যে কেউ প্রমোদ ভ্রমণে বেরুবে না।

ঘোড়াটা যে চালকবিহীন ছিল তাও নয়। কারণ চালক না থাকলে কোন ঘোড়া এত সোজা চলবে না, আর এত জোরেও ছুটবে না।

স্বাভাবিকভাবে এই ট্রেইলটা জাভেদের চোখে পড়ার কথা নয়, কারণ এই পথে সে যাতায়াত করে না। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে সে তার ফার্মের জন্তুগুলোকে বিশ মাইল দূরে ভ্যালে ডি স্যান অ্যানটোনিও বলে পরিচিত একটা জায়গায় সরিয়ে নিতে আরম্ভ করেছে। পানি আর ঘাস, দুটোই যথেষ্ট পরিমাণে আছে ওখানে।

তিনদিন আগেই সে আরও বারোটা গরু-মহিষ তাড়িয়ে নিয়ে পৌঁছে দিতে গেছিল ওখানে। ওই এলাকায় পাহাড়ী সিংহের উৎপাত হচ্ছে দেখে ফাঁদ তৈরি করে দুটো সিংহ মেরে সে তার প্রায় তিনশো জীবজন্তুর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করে এসেছে।

ফেরার পথে নজরে পড়েছে এই ট্রেইল। ঘণ্টাখানেকের বেশি পুরোনো

নয় এটা।

এদিক দিয়ে যে-ই গিয়ে থাক না কেন, ঘটনাচক্রে সে এই পথ দিয়ে যায়নি। ইচ্ছা করেই এই পথ সে বেছে নিয়েছে যেন অন্যের নজরে না পড়ে—নইলে ওখানে পৌঁছানোর আরও ভাল আর সহজ পথ অনেক ছিল।

জাভেদের র‍্যাঞ্চ অনেকটা দূরে পাহাড়ের ভিতর লুকানো। যে কোন প্রচলিত চলার পথ থেকে বেশ দূরে। র‍্যাঞ্চটা একাই চালায় জাভেদ। ওকে সাহায্য করে জিকো ওয়াইল্ড, আধা ইন্ডিয়ান লোকটা। আর্মি ছাড়ার পর থেকে জাভেদের সাথেই আছে সে।

ট্রেইলটার দিক বা উপস্থিতি কোনটারই একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ সে খুঁজে পেল না। অযৌক্তিক কিছুই পছন্দ করে না জাভেদ, তাই তার মনের মধ্যে একটা খটকা রয়েই গেল।

মাঠের প্রান্তে এসে চওড়া গুয়াডালুপ ক্যানিয়নটার দিকে চাইল সে। ধীরে ধীরে উপরে উঠে যাওয়া ঢালটা বেয়ে অনেক উপরে উঠে তারপরে তার র‍্যাঞ্চ। ধরে আসা বৃষ্টিতে এখন র‍্যাঞ্চের কেবিনটা আর তার আশেপাশের গাছগুলো বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে তিন মাইল দূরে প্রায় এক হাজার ফুট উঁচুতে ওর র‍্যাঞ্চ।

একটু অস্বস্তির সাথে ভাল করে র‍্যাঞ্চ আর আশেপাশের পুরো এলাকাটা খুঁটিয়ে দেখল সে। অজানা আগন্তুক উত্তর বা পশ্চিমের পাহাড়ের দিকে গেছে। জাভেদের ধারণা পশ্চিমেই গেছে সে।

সারাটা জীবন জাভেদকে নিজের নিরাপত্তা নিজেকেই নিশ্চিত করতে হয়েছে। অযথা নিরর্থক ঝুঁকি নেওয়ার পক্ষপাতী সে কোনদিনই ছিল না। এই জন্য ছেলেবেলায় তার খেলার সাথীদের কাছ থেকে তাকে অনেক মস্করা সহ্য করতে হয়েছে। তবে পরবর্তী জীবনে এই গুণটাই অনেকবার রক্ষা করেছে তার জীবন। নিজে ঝুঁকি নেয় না সে—কিন্তু যারা নিয়েছে তাদেরকে কবরে যেতে সাহায্য করেছে সে বিনা দ্বিধায়।

আজও ঝুঁকি নিল না সে। ধীরে, খুব সাবধানে, সাধারণত যে পথে যায় সেই পথে না গিয়ে অন্য পথ ধরে গাছের আড়াল দিয়ে এগিয়ে চলল। নবাগতের চিন্তাটা মাথা থেকে যাচ্ছে না তার, অথচ র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি এসেও অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না ওর। কেবল একটা ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা এঁকেবেঁকে আকাশে উঠে যাচ্ছে তার কেবিনের চিমনি থেকে। এ ছাড়া কোনকিছুই নড়ছে না কোথাও। আস্তাবলের পিছনে এসে ঘোড়া থামাল জাভেদ। আর একবার চারদিক ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল সে।

সামনের একখণ্ড পরিষ্কার আঙিনার ওপাশে তার কেবিন। তার পিছনেই পাহাড়টা খাড়াভাবে পাঁচশো ফুট উপরে উঠে গেছে—উপরটা সমতল মালভূমির মত। এই মেসার তলাতেই খুঁজে পেয়েছে জাভেদ র‍্যাঞ্চ করার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ—পানি। প্রচুর পানি।

ডজনখানেক ঝর্না আর ফোয়ারার পানি পাহাড়ের ফাটল আর গুহা বেয়ে এসে অনবরত জমা হচ্ছে পাহাড়ের ঠিক নীচেই গামলার মত একটা বিরাট গর্তে।

ওখান থেকে উপচে পড়া জলের ধারাটা আগে র‍্যাঞ্চ থেকে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে ভ্যাচেক্রীকে হারিয়ে যেত। কিন্তু এখন জাভেদ সেটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে কিছুটা পানি ব্যবহার করে তার বাগান আর একর তিনেক জমি চাষ করার জন্য, আর বাকিটা একসারি ছোট ছোট চৌবাচ্চায় জমিয়ে রাখে তার পোষা জন্তু-জানোয়ারের জন্য।

ছোটকাল থেকেই এদিক ওদিক চরে বেড়ানোর অভ্যাস ছিল জাভেদের। একদিন একটা পুরোনো ইন্ডিয়ান ট্রেইল ধরে চলতে চলতে হঠাৎ আবিষ্কার করে সে এই জায়গা। কেবল বন্য জীবজন্তু ছাড়া আর কোন জীবনের সাড়া ছিল না এখানে। কোনদিন এখানে মানুষের পা পড়েছে বলে মনে হয়নি, তাই এখানেই গড়েছে সে তার কেবিন আর র‍্যাঞ্চ। এর চারপাশে বহুমাইল পর্যন্ত বিস্তৃত কেবল নির্জন এলাকা।

এই এলাকার নির্জনতাই তাকে আজ সন্দিগ্ধ করে তুলেছে। শহরের আশেপাশে তিনচারটে গুণ্ডা দলের খবর তার জানা আছে, কিন্তু তাদেরও কেউ আইন ফাঁকি দিয়ে পালাবার জন্য এই পথ বেছে নেবে না কখনও। লোকটা জাভেদের অজানা কোন শত্রু না হলে তার একাকী এভাবে এদিকে আসার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই থাকতে পারে না।

প্রায় ছয় ফুট লম্বা, চওড়া কাঁধ আর ছিমছাম শক্তিশালী গড়ন জাভেদের। হাসির রেখা সাধারণত তার ঠোঁটে না ফুটে কালো চোখ জোড়াতেই ফুটে উঠতে দেখা যায়। কথা বলার চেয়ে শোনে সে বেশি। তাকে ঘাঁটাতে গেলে যে তার ফল শুভ হয় না সেটা সে কয়েকবারই প্রমাণ করেছে শহরে। কিন্তু নির্জনতা তার খুব প্রিয় বলে শহর থেকে এতদূরে এসে ডেরা করেছে সে।

চার বৎসর হলো র‍্যাঞ্চটা করেছে জাভেদ। এতদিনে তার ফার্মের পশু কেবল বেড়েইছে, কারণ একটাও বিক্রি করেনি সে। বরং আরও কিছু কিনেছে ঝর্ণা থেকে ছেঁকে তোলা সোনার বিনিময়ে। তার দৈনন্দিন খরচ পুষিয়ে নিয়েছে সে ন্যাসিমিয়েনটো আর স্যাংগ্রে ডি ক্রিস্টোর পাহাড়গুলোতে রাইফেল দিয়ে শিকার করে। চার বৎসর এখানে একা কাটিয়েও তার ধার মোটেও কমেনি–শিকারে অভ্যাস তাকে আরও তীক্ষ্ণ, সাবধানী আর সচেতন করে তুলেছে। ওই লোকটার অনেক রকম কারণই থাকতে পারে এই গুয়াডালুপ ক্যানিয়নে আসার, কিন্তু পুবের পাহাড় অতিক্রম করে এত কঠিন পথ ধরে আসার কোন দরকার ছিল না তার। একমাত্র সবার অলক্ষ্যে লুকিয়ে এখানে পৌঁছতে হলেই কেউ ওই পথ ব্যবহার করবে। কার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে চাইছে ও? জাভেদের, না জিকোর কাছ থেকে?

একাকী থাকা পছন্দ করলেও অতিথিপরায়ণ বলে নাম আছে তার। তবে কেন কেউ সোজা পথে না এসে এভাবে লুকিয়ে এসেছে? সে কি তার শত্রু? ক্ষতি করতে চায়?

প্রায় পনেরো মিনিট ঝোপের আড়ালে ঘোড়ার পিঠে নিজেকে গোপন রেখে দাঁড়িয়ে রইল সে। তার সমস্ত সত্তা তাকে বিপদের আগাম দিচ্ছে।

বৃষ্টিটা কিছুক্ষণের জন্য থেমেছিল, আবার অল্প অল্প আরম্ভ হলো। শীত এসে যাচ্ছে, যে কোন সময়ে তুষার পড়তে শুরু করতে পারে।

ভুরু কুঁচকে আর একবার সে একে একে কেবিন, পাহাড়, জঙ্গল আর মেসার উপরের ধারটা লক্ষ করে দেখল। যদি কোন শত্রু বা চোর তাকে খুন করে কিছু রসদ আর ঘোড়া চুরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসে থাকে তবে সে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করবে তার সচরাচর চলাচলের পথে। ইচ্ছা করেই ওই পথ দিয়ে আজ ফেরেনি সে। তার আঙিনাটা মেসার উপরের রিম থেকে বা কেবিনের পিছনের ঢাল থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু গুদাম ঘরটায় সে নিজেকে মোটামুটি আড়াল রেখেই পৌঁছতে পারবে।

জাভেদের গেল্ডিং ঘোড়াটা অস্থিরভাবে মাটিতে পা ঠুকল। ঘোড়া থেকে নেমে বর্ষাতিটা খুলে ফেলল জাভেদ। নীল জিনসের শার্ট রয়েছে তার পরনে। বহুবার ধোলাইয়ের ফলে শার্টের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে কয়েক জায়গায়। উলের ট্রাউজার্স নীচের দিকে ভাঁজ করে উঁচু বুটের মধ্যে ঢুকানো। কোমরের ডানদিকে একটা ছয় ঘোড়ার কোল্ট ঝুলছে বেশ একটু নিচুতে। বেল্ট সরিয়ে কোল্টটাকে সুবিধামত জায়গায় নিয়ে এল সে, তারপর নিজে ঘোড়ার আড়ালে থেকে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে আস্তাবলে ঢুকল।

প্রথমেই ঘোড়ার যত্ন নিল সে। জিন নামিয়ে রেখে লাগাম খুলে দিল। একটা ছালার টুকরো দিয়ে ঘোড়ার গা ডলে দিতে দিতে আবার মাথার মধ্যে সমস্যাটাকে উল্টে পাল্টে দেখল। হয়তো অযথাই ঘাবড়াচ্ছে সে, এমনও হতে পারে যে লোকটা হারিয়ে গিয়ে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কেবিন থেকে কোনরকম শব্দ কানে এল না তার। জিকো সাধারণত এসে হাজির হয় জাভেদ ফিরলেই–কিন্তু আজ সে এল না। সামান্য ফাঁক করা দরজা দিয়ে সে কেবিনটাকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল। অন্ধকার হয়ে এসেছে, জিকো কখনোই আলো ছাড়া ঘরে থাকবে না–অথচ কোন আলো জ্বলছে না ঘরে।

জিকোর ঘোড়াটা আস্তাবলেই আছে, তার জিনটাও ঠিক জায়গা মতই রয়েছে। তবে কেন তাকে অভ্যর্থনা করতে এল না জিকো? আলো কেন জ্বলছে না ঘরে?

অবশ্য পায়ে হেঁটে কোথাও গিয়ে থাকতে পারে জিকো। কিন্তু জিকোকে ভাল করেই জানে জাভেদ–উপায় থাকলে বাড়ি থেকে আস্তাবল পর্যন্ত, ব্যস, এর বেশি হাঁটতে সে রাজি নয়। তবে কি সে কেবিনেই আছে? রোজকার মত বেরিয়ে না এসে তাকে সাবধান করে দিতে চাইছে কোন ব্যাপারে? নাকি সে অসুস্থ বা আহত হয়ে পড়ে আছে ঘরে?

সাবধান করতে চাইলে ঠিক কোন্ ব্যাপারে সাবধান করতে চাইছে সে?

র‍্যাঞ্চের পরিস্থিতি যেন ওই ঘোড়সওয়ারের আবির্ভাবেই কিছুটা বদলেছে। সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে জাভেদ। যদি কেউ কেবিনে তার জন্য অপেক্ষা করত তবে নিশ্চয়ই সে আলো জ্বেলে সব কিছুই যতটা সম্ভব স্বাভাবিক আছে দেখানোর চেষ্টা করত। কেবিনের দরজার কাছে কিছু পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে–দাগগুলো আবার ভাল করে পরীক্ষা করল সে।

আস্তাবল থেকেই দেখা যাচ্ছে কেবিন থেকে একটা পায়ের ছাপ গুদামের দিকে খানিকটা এগিয়ে আবার ফিরে গেছে। এগিয়ে যাওয়ার শেষ ছাপটা পিছল খাওয়া–আর ফিরে যাবার ছাপগুলো একটু দূরে দূরে আর আকারে কিছুটা বড়

দেখাচ্ছে। অর্থাৎ কেবিন থেকে কেউ গুদামের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল, মাঝপথে কোন কারণে ভয় পেয়ে থেমেই দৌড়ে ফিরে গেছে আবার কেবিনের ভিতর।

চারদিক নিশ্চুপ। বৃষ্টি পড়ার মৃদু একটানা শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নেই।

বাড়ির ভিতরে ভয় পাবার কিছু থাকলে জিকো ওদিকে ফিরে যেত না। সুতরাং ভয়ের কারণটা ছিল বাইরে। পূর্ব আর উত্তর-পূর্ব দিক থেকে কোন ভয়ের কারণ নেই। ওদিকটা একেবারে খোলা, লুকোবার কোন জায়গা নেই। দক্ষিণ-পশ্চিমে লুকোবার জায়গা আছে বটে কিন্তু জাভেদ ওই দিক দিয়েই ফিরেছে, কোন কিছু তার নজরে পড়েনি। আর মাত্র দুটো সম্ভাবনাই আছে, তার একটা এতই অসম্ভব যে বাদ দিলেও চলে, কিন্তু অন্যটার সাথে আগন্তুকের গতিবিধি বেশ মিলে যায়।

মেসার উপর থেকে কারও পক্ষে জিকোর দিকে গুলি ছোঁড়া সম্ভব নয়, কারণ জাভেদ আর জিকো ছাড়া ওর উপর উঠার পথ আর কারও জানা নেই। কিন্তু কেবিনের পিছনে পাহাড়ের ঢাল থেকে কেউ গুলি চালালে, যেখান থেকে জিকো ফিরে গেছে সেই জায়গাটা দেখতে পাবে।

মনে হচ্ছে এটাই ঠিক। ওখানেই কেউ লুকিয়ে ছিল বা এখনও আছে। সে যেদিক দিয়ে ফিরেছে তাতে তাকে দেখতে পাবে না ওই লোক ওখানে বসে। গুদাম ঘরের কাছাকাছি যাওয়ার আগে লোকটা তাকে দেখতে পাবে না।

জাভেদ আস্তাবলেই আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে পারে চারদিক ভাল করে অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত, অথবা এখনই এগিয়ে গিয়ে ওকে একটা গুলি করার সুযোগ দিতে পারে।

যদি ধরে নেওয়া যায়, কেউ জিকোর দিকে গুলি করেছিল, তবে বুঝতে হবে সে যে-ই হোক না কেন, তাকে এবং সম্ভবত জিকোকেও হত্যা করাই ওর উদ্দেশ্য।

তবে এসবই ওর কল্পনা, সত্যি নাও হতে পারে। কিন্তু জাভেদ যখন ক্যানসাসে জেনারেল হফম্যানের অধীনে আর্মি ট্রেনিঙে ছিল, সেখানেও তাকে ঝুঁকি এড়িয়ে চলারই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ওখানে সীমান্ত এলাকায় সে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। এর পরেও তাকে যখন স্যান্তা ফে পাঠানো হয় যোদ্ধা হিসাবে, সেখানেও দুটো মারাত্মক ইন্ডিয়ান আক্রমণ গেছে ওদের উপর দিয়ে। কেবল সাবধানী ছিল বলেই এখনও বেঁচে আছে সে। দুই বৎসর টেক্সাসে কম্যাঞ্চিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর।

কিছু একটা অঘটন ঘটেছে এ ব্যাপারে সে মোটামুটি নিঃসন্দেহ। হয়তো এই মুহূর্তে জিকো মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পড়ে আছে কেবিনের ভিতরে। ওকে সাহায্য করতে গিয়ে নিজে মারা পড়া নেহাতই বোকামি হবে। জিকোকে সাহায্য করতে হলে প্রথমে বিপদটাকে সরাতে হবে তার পথ থেকে।

আস্তাবলের দরজা থেকে পিছনে সরে গিয়ে পায়ের গোড়ালিতে বসে একটা সিগারেট ধরাল সে। কেবিনের পিছনের ওই ঢালে একজন মানুষ লুকাবার জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে, কিন্তু একটা আস্ত ঘোড়া কিছুতেই ওখানে লুকানো যাবে না।

সুতরাং লোকটার ঘোড়া নীচের পাহাড়ের গাছগুলোর ভিতরে কোথাও লুকানো থাকবে। র‍্যাঞ্চের পুব দিকে লুকানোর কোন জায়গা নেই, কিন্তু পাহাড়ের বাঁকে কিছু ছড়ানো গাছ আর ঝোপ আছে, আরও নীচে ঘন জঙ্গল। ওই ঢালে কোথাও নিজের ঘোড়াটাকে লুকিয়ে রেখে, যেখান থেকে এই র‍্যাঞ্চটার উপর নজর রাখা যায় তেমন জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে অপেক্ষা করছে লোকটা জাভেদের জন্য।

একঘণ্টার মধ্যেই চারদিক আঁধার হয়ে যাবে। তখন আর ওর ওখানে বসে থাকার কোন মানেই থাকবে না। সুতরাং লোকটা নিশ্চয়ই ঘোড়ায় চেপে কোনখানে গিয়ে রাতের জন্য আশ্রয় নেবে। আগামীকাল আবার ফিরে এসে সুযোগ খুঁজবে।

একটা ইঁদুরও আশ্রয়ের জন্য একটার বেশি গর্তের ব্যবস্থা রাখে, আর জাভেদ তো মানুষ! আস্তাবলের পিছনের দেয়ালে আর একটা দরজার ব্যবস্থা করে রেখেছিল সে এই ধরনের বিশেষ পরিস্থিতির জন্যই। বানানোর পরে আজই প্রথম ওই দরজা ব্যবহার করার দরকার পড়ল তার। দরজাটা এমনভাবে খাপে খাপে কাটা কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যে বাইরে থেকে দেখে কারও বোঝার উপায় নেই ওখানে একটা দরজা থাকতে পারে।

আলগোছে ওই দরজা দিয়ে বেরিয়ে আস্তাবলের পিছনে জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য হলো জাভেদ। ওই লোকটা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে ওকে দেখতে পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অত্যন্ত দ্রুত চক্রাকারে ঘুরে নিজেকে আড়াল রেখে এগিয়ে চলল সে যেখানে ঘোড়াটা লুকানো আছে বলে সে ধারণা করছে, সেই দিকে। একটা ঝোপের পিছনে দম নেওয়ার জন্য দাঁড়াল জাভেদ। ভুল করছে না তো? হয়তো সত্যিই পায়ে হেঁটে জিকো কোথাও গেছে।

কিন্তু কোথায়? তার ঘোড়াটা রয়েছে আস্তাবলে, বৃষ্টি পড়ছে—এর মধ্যে কোথায়ই বা যেতে পারে জিকো—আর তা ছাড়া সেই রহস্যজনক ঘোড়সওয়ারই বা কোথায় অদৃশ্য হলো?

ওই ঢালের উপর থেকে কেউ কাউকে অ্যামবুশ করে মারতে চাইলে সে নিজেও তৈরি থাকবে বিপদ দেখলে সরে পড়ার জন্য। ঘোড়াটাকে লুকালেও বেশি দূরে রাখবে না। জাভেদ ভেবে দেখল সেরকম সম্ভাব্য জায়গা মাত্র চারটে আছে। একটা হচ্ছে ঢালের উপরই পাথরে একটা বিরাট গর্ত, আর একটা যেখানে কতগুলো বড় বড় পাথর কাছাকাছি পড়ে আছে, তৃতীয়টা একফালি ঘন ঝোপ আর চতুর্থটা হচ্ছে র‍্যাঞ্চ থেকে প্রায় দুশো ফুট নীচে পাহাড়ের মধ্যে একটা বড় খাঁজ। ওই খাঁজ থেকেই সবচেয়ে সহজে ওই ঢালে ওঠা বা নামা যায়, আর ওখান থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে পালানোও সবচেয়ে সোজা।

সমান ধারায় বৃষ্টি পড়ে চলেছে। মৃদু বাতাসে গাছের পাতাগুলো নড়ছে। বাতাসে দু'একটা ঠাণ্ডা বৃষ্টির ফোঁটা তার ঘাড় বেয়ে নীচে নামছে। বর্ষাতির নীচে তার উইনচেস্টারের মাথাটা মাটির দিকে মুখ করে ধরে পরবর্তী সুবিধাজনক জায়গার দিকে দ্রুত পায়ে সরে যাচ্ছে জাভেদ।

প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। যে কোন সময়ে লোকটা তার ঘোড়ার কাছে ফিরে আসার জন্য রওনা হতে পারে। প্রতি পদক্ষেপেই বিপদ ঘটতে পারে এখন

জাভেদের। তাই ভাল করে চারদিক না দেখে একপাও এগুচ্ছে না সে।

অনেক উপরে একটা ছোট পাথর গড়ানোর শব্দ হলো।

ফাঁকা জায়গাটা একছুটে পার হয়ে বড় বড় পাথরগুলোর কাছে পৌঁছে গেল জাভেদ। কোন ঘোড়া লুকানো নেই ওখানে–কোন পায়ের ছাপও নেই। হাতে সময় খুব কম। নীচের খাঁজটাই সবচেয়ে সম্ভাব্য জায়গা ধারণা করে সেদিকেই এগুলো সে।

পাতায় বৃষ্টি পড়ার মৃদু শব্দ হচ্ছে। দিনের আলোকে প্রায় পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে ঘনিয়ে আসা রাত্রির কালো অন্ধকার।

একটা পাথরের আড়ালে অন্ধকার ছায়ায় একটু দাঁড়াল জাভেদ। চোখ, কান, নাক–সমস্ত সত্তা দিয়েই পারিপার্শ্বিক অবস্থাটাকে যাচাই করে বুঝে নিতে চেষ্টা করল সে, তারপর আবার গাছের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে চলল। খাঁজের কাছে এসে বাঁক ঘুরেই ঘোড়াটাকে দেখল জাভেদ।

পাহাড় থেকে কিছুটা বেরিয়ে এসেছে একটা পাথর, তারই নীচে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে ঘোড়াটা।

তা হলে তার ধারণাই ঠিক!

একটা পাইন গাছের গুঁড়ির সাথে সেঁটে দাঁড়াল জাভেদ। পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে এখন চারদিক।

গাছের পাতাগুলোর সাথে ফিসফিস করে কথা বলছে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো। পাখিরা নড়াচড়া বন্ধ করেছে। খরগোশ আর পাখিরা বৃষ্টির মধ্যে আশ্রয় খুঁজে নিয়ে আজ রাতের মত অবসর নিয়েছে। নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে ঘোড়াটা, তার আশেপাশের পাথরগুলো পানিতে ভিজে কালো দেখাচ্ছে।

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। রাইফেলটাকে এবার অন্য হাতে আলগা করে ধরল জাভেদ। ডান হাতের ঠাণ্ডা হয়ে জমে আসা আঙুলগুলোকে নেড়েচেড়ে কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনল সে। খাঁজটা অন্ধকারের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে, প্রায় ধরাই যায় না ওটা কোথায়। ঘোড়াটা একটু নড়ে উঠতেই ভিজে জিনটা একটু চকচক করে উঠল।

পাথরে বুটের ঘষা খাওয়ার আওয়াজ পাওয়া গেল হঠাৎ–একটা নুড়ি গড়িয়ে পড়ল।

আলতোভাবে রাইফেলটা দুহাতে কোমর পর্যন্ত তুলে ধরল জাভেদ। দরকার হলেই তুলে দ্রুত গুলি ছুঁড়বে।

একটা মুহূর্ত নিঃশব্দে কেটে গেল। তারপরেই আবার বালির উপর পায়ের শব্দ উঠল। একটা কালো আকৃতি ছায়ার মত এগিয়ে গেল খাঁজটার দিকে। লোকটা তার ঘোড়ার কাছে পৌঁছবার একটু আগে মুখ খুলল জাভেদ।

'কাকে খুঁজছ তুমি?'

শাঁ করে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। একটা ছোট আলোর ঝলক জাভেদের দিক নির্দেশ করল অন্ধকারে। জবাবে উইনচেস্টারটাও তার বক্তব্য পেশ করল। বুলেটের ধাক্কাটা অনুভব করল জাভেদ গাছটার উপর। গাছের বাকল চৌচির হয়ে ছিটকে তার চোখে-মুখে লাগল। আর একটা গুলি করল জাভেদ। লোকটা যে

অত্যন্ত ক্ষিপ্র আর ভাল পিস্তল চালাতে পারে তা বোঝা গেছে ওর জাভেদের কথা কানে যাওয়া মাত্র ঘুরে গুলি করা দেখে। লোকটাকে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখল সে-ঘোড়াটা নাক দিয়ে একটা শব্দ তুলে সভয়ে একটু পিছিয়ে গেল। গাছের আড়ালে আর একটু সরে গিয়ে অপেক্ষা করল জাভেদ।

বোকার মত এখনই ওর দিকে ছুটে যাবে না সে। লোকটা আসলেই গুলি খেয়ে পড়েছে না ভান করছে নিশ্চিত জানে না জাভেদ। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে সে। বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

ঘোড়াটা আবার নাক ঝাড়ল, বারুদের গন্ধ পছন্দ হচ্ছে না ওর। বাতাসে জাভেদের বর্ষাতির কোনাটা একটু নড়ে উঠল।

লালচে আগুনের শিখা দেখা গেল আবার, বর্ষাতিতে একটা টান অনুভব করল জাভেদ। সাথে সাথেই পরপর দুবার গুলি করল সে ওদিকে লক্ষ্য করে।

আবার চুপচাপ-বৃষ্টির শব্দ। অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে এখন। মাটিতে পড়ে থাকা দেহটা দেখতে পাচ্ছে সে।

সে জানে লোকটা মরে গেছে, কিন্তু তবু অপেক্ষা করে রইল ও।

কাকে মেরেছে সে? কী করছিল সে এখানে, শহর আর লোকালয় ছেড়ে এতদূরে? এই জায়গাটা সে কীভাবে চিনল? মাত্র জনা ছয়েক লোক এসেছে তার র‍্যাঞ্চে এই গত চার বৎসরে।

খুন করতে এসেছিল লোকটা তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ তা না হলে অন্ধকারে মানুষের গলা শুনেই গুলি করে বসত না। গুলি চালানোয় পটু ছিল লোকটা। খুব চতুরতার সাথে সে ঘুর পথে অলক্ষ্যে আসতে চেয়েছিল এখানে।

মিনিটের পর মিনিট পার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তবু অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইল জাভেদ। অনেক সময়েই দেখা গেছে এসব ক্ষেত্রে যে প্রথম নড়েছে সে-ই মারা পড়েছে। অনেক দেখে ধৈর্য ধরতে শিখেছে সে। আরও কতক্ষণ পর দম বেরুনোর শব্দের সাথে মাটিতে বুট ঠোকার শব্দ শুনল জাভেদ। মরেছে লোকটা।

আর একটা গাছের পিছনে এগিয়ে এসে দাঁড়াল সে, আবার গুলি করার জন্য রাইফেলটা তৈরি আছে তার।

লোকটার খোলা হাতের পাশে পড়ে থাকা পিস্তলের নলটা চকচক করছে। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেল জাভেদ। বারুদ আর রক্তের গন্ধে ঘোড়াটা বাঁধা অবস্থাতেই যতদূর সম্ভব পিছনে সরে গিয়ে বারবার নাক দিয়ে শব্দ করছে।

'রও। রও।'

শান্ত ঠাণ্ডা গলা শুনে আশ্বস্ত হলো ঘোড়াটা। পশুদের পোষ মানাতে ওস্তাদ জাভেদ। ওরা কেন যেন বিশ্বাস করে তাকে। দস্যি পশুও সহজেই ওর বাগ মানে।

রাইফেলটা তৈরি রেখে পা দিয়ে গুঁতো দিল জাভেদ লোকটার গায়ে। কোন সাড়া পাওয়া গেল না দেখে ওকে চিত করল সে। ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বর্ষাতি দিয়ে আড়াল করে একটা ম্যাচ জ্বালাল ওর মুখের সামনে। মুখটা সামান্য হাঁ করা, খোলা চোখ দুটোতে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে।

যুবক-একুশ কি বাইশ বৎসর হবে বয়স। চিকন, লম্বা আর কঠিন একটা

মুখ। ঠোঁট দুটো পাতলা, কপালটা উঁচু। পিস্তলের খাপটা নিচু করে ঝুলানো, সামনের দিকটা পায়ের সাথে ফিতে দিয়ে বাঁধা।

দেহটা তুলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপাল জাভেদ, তারপর রাইফেল আর পিস্তল তুলে নিয়ে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল তার র‍্যাঞ্চের দিকে।

র‍্যাঞ্চের আঙিনায় পৌঁছতেই দরজা খুলে লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এল জিকো। কাছে এসে মরা লোকটার মুখটা বাতির সামনে তুলে ধরে দেখল সে।

'চেনো ওকে?'

'না, তুমি চেনো?' জানতে চাইল জাভেদ।

'না, আমিও ঠিক চিনি না, তবে চেহারাটা যেন কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে।'

জিকোর কপালে একটা পট্টি দেখতে পেল জাভেদ

'ওটা কি এরই কাজ?'

'তোমার জ্যাকেট পরা ছিলাম আমি–প্রায় খতম করে দিয়েছিল আমাকে,' জাভেদের দিকে চাইল সে। 'কিন্তু ঘটনাটা কী, বলো তো?'

'কী জানি, কিছুই মাথায় ঢুকছে না আমার।' ট্রেইলটা দেখার পর থেকে সবকিছু বর্ণনা করল জাভেদ। 'মনে হয় কেউ আমাকে অথবা তোমাকে খুন করতে চাচ্ছে।'

একটু ভাবল জিকো। 'তোমাকেই,' বলল সে। 'আমার শত্রুরা সবাই এখন মৃত।' ঘোড়ার পিঠে মৃতদেহটার দিকে চেয়ে সে আবার বলল, 'ওকে তা হলে আগামীকাল সকালেই কবর দেব?'

'না, কৌতূহলী মানুষ আমি। ঘটনা পুরোপুরি জানতে হবে আমাকে। ওকে ঘোড়ার পিঠে ভাল করে বেঁধে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দেব।'

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে জিকো সমর্থন করল ওকে। 'ঠিক, ওটা করার কথা মাথায় আসেনি আমার।'

'হয়তো বুদ্ধিটা কাজে লাগবে। ঘোড়াটা তার নিজেরও হতে পারে কিংবা ভাড়া করা হয়েছে ওটা, যা-ই হোক ঘোড়াটার বাড়ি ফিরে যাওয়াই স্বাভাবিক। আর ঘোড়াটা যদি এদিককার না হয়, তবে যেখানে সে শেষবার খাওয়া-দাওয়া করেছে, রাত কাটিয়েছে, সেখানেই ফিরবে ও।'

'ভালই শিখেছ তুমি, জাভেদ। ইন্ডিয়ান ফন্দি সবই আয়ত্ত করেছ।'

দেহটা পরীক্ষা করে দেখল জিকো। ওর গায়ে তিনটে গুলি লেগেছে দেখা যাচ্ছে। 'লোকটা কঠিন ছিল বলেই মনে হয়।'

'ক্ষিপ্র আর চতুরও ছিল,' যোগ করল জাভেদ। 'খুব ভাল তাক ছিল ওর। অন্ধকারে দুটো গুলি করেছিল ও, তার একটা সোজা আমার বুকে লাগত মাঝে গাছটা না থাকলে। অন্যটা আমার বর্ষাতি ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। বন্দুকবাজ লোক, মনে হয় এই কাজের জন্যে ওকে ভাড়া করেছিল কেউ।'

'কে হতে পারে?'

সেটাই এখন প্রশ্ন। যে লোকের ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস, কিছু না কিছু শত্রু তার চলার পথে জুটেই যায়। কিন্তু তাই বলে এমন শত্রুতা হয় না যে এত কষ্ট স্বীকার করে এই বিজন জায়গায় ধাওয়া করে আসবে খুন করতে।

'দেখি, লণ্ঠন দাও তো?'

ঘোড়ার মার্কাটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য লণ্ঠন হাতে নিল সে। একটা অর্ধবৃত্তের নীচে কেবল একটা অক্ষর 'টি' লেখা রয়েছে, কোন মার্কা নেই। লোকটার পকেট হাতড়েও কিছু বোঝা গেল না। সামান্য কিছু টাকা রয়েছে পকেটে, কোন চিঠি বা নামধাম পাওয়া গেল না। কিন্তু এখানে আসার একটা কিছু কারণ নিশ্চয়ই ছিল তার।

'জাভেদ,' একটু সময় নিল জিকো কথাটা বলতে, গম্ভীর আর উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে ওর মুখ। 'তোমার খুব সাবধান থাকা উচিত। বোঝাই যাচ্ছে, যে ওকে পাঠিয়েছে খুব সাবধানী লোক সে। কোন প্রমাণই রাখেনি ওরা, যেন ধরা পড়লে বা মারা গেলেও কিছুই ফাঁস না হয়।'

'ঘোড়াটার ব্যাপারে সাবধান হয়নি ওরা।'

'না, কিন্তু ঘোড়াটা এই এলাকার না। ও রকম ছাপ আগে কখনও দেখিনি।'

'সে যা-ই হোক ঘোড়াটাকে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও খাওয়ানো হয়েছে, পানি দেওয়া হয়েছে। দানা খাওয়া ঘোড়া এটা, আমার বিশ্বাস অন্তত এই এলাকাটা চেনার জন্যেও ওকে দু'চারদিন থাকতে হয়েছে। ঘোড়াটা সেখানেই ফিরে যাবে।'

'সকালে ছাড়বে?'

'না, এখনই। ওকে এখনই ছেড়ে দেব আমরা, সকালে আমি পায়ের ছাপ দেখে পিছু নেব ওর।' আকাশের দিকে চাইল জাভেদ। 'বৃষ্টি থেমে যাবে শিগ্‌গিরই, দাগগুলো মাটিতে থেকে যাবে, পিছু নিতে কোন অসুবিধা হবে না।'

ঘোড়াটাকে দক্ষিণ মুখে কিছুটা হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে ওর পাছায় জোরে চাপড় কষাল জাভেদ। ঘোড়াটা একটু লাফিয়ে উঠে পিঠের বোঝা সহ রওনা হয়ে গেল ওই পথে। খুরের শব্দ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে কেবিনে ফিরল ওরা।

'কফি চড়ানো আছে চুলোয়–একটু কড়া হবে কফিটা,' কেবিনে ঢুকে ঘোষণা করল জিকো।

'আর কী আছে?' এতক্ষণে খেয়াল করল জাভেদ সারাদিনের ধকলের পরে এখন ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত আর অবসন্ন বোধ করছে সে।

'বীনস, গরুর মাংস···আর কী চাই?'

লণ্ঠনটা রেখে একটা কুপি ধরাল জিকো। হ্যাট আর বর্ষাতি খুলে দেয়ালের গায়ে ঝুলিয়ে রাখল জাভেদ। তারপর চেয়ারটা টেনে আগুনের কাছে নিয়ে পা-টা একটু গরম করতে বসল সে।

ঘরটা লম্বা ধরনের। আজ অনেকবারই তার এই কেবিনের আরামের কথা মনে হয়েছে ঠাণ্ডায় বাইরে থাকার সময়ে। জাভেদের অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল এই রকম একটা ঘর আর পরিবেশে বাস করবে সে। কেবল একটা মেয়েমানুষের পরশের অভাব এখন–এ ছাড়া সবই রয়েছে এখানে। আরাম আয়েশে থাকার মত শক্ত মজবুত বাড়ি। চমৎকার দৃশ্য চারদিকে। এ ছাড়া নিজেদের নিরাপত্তার জন্যও ভাল ব্যবস্থা রয়েছে এই বাড়িতে। এইসব এলাকায় এর দরকার আছে, কারণ এখানকার মানুষ সব সময়ে আইন মেনে চলে না। জানালাগুলো চওড়া করে

বানানো হয়েছে, হয়তো একদিন ওই জানালার ধারে থাকবে জিরেনিয়াম বা ওই জাতীয় কোন সুন্দর ফুল গাছ—সাদা, লাল, গোলাপী আর বেগুনী ফুল ধরবে তাতে। ঘরের ভিতর পাম্প করে পানি তোলার বন্দোবস্ত রয়েছে—কোন মেয়ের বারবার সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে পানি টানতে হবে না।

'দুটো সিংহ মেরে এসেছি আমি এবার,' হঠাৎ বলল জাভেদ।

'আমাদের স্টকের কী খবর?'

'এতদিনে চারটা কি পাঁচটা গরু মরা পড়েছে মাত্র। সম্ভবত এই সিংহগুলো নতুন আমদানী হয়েছিল। দুটোকেই একই ফাঁদে ধরেছি আমি। সিংহের দেহে শক্তি আছে প্রচুর কিন্তু মাথায় কিচ্ছু নেই। পরপর দুই রাতে একই জায়গায় একই ফাঁদে ধরা পড়েছে ওরা। নেকড়ে হলে এটা সম্ভব হত না।'

শক্ত কাঠামোর লোক জিকো। ইন্ডিয়ান মায়ের দিক থেকে পেয়েছে সে শক্তি, আর আমেরিকান বাপের থেকে পেয়েছে কাজে লেগে থাকার ক্ষমতা। গরম খাবারের প্লেটটা বাড়িয়ে দিয়ে কফি ঢালতে আরম্ভ করল সে। 'টেবিলে বসে খেয়ে নাও জাভেদ, সারাদিন পরিশ্রম করে ক্লান্ত তুমি।'

শার্টের হাতা গুটিয়ে নিয়ে হাতমুখ ধুতে শুরু করল জাভেদ। তার পেশীবহুল হাত দুটো দেখা যাচ্ছে। ঘরে তৈরি সাবান দিয়ে ভাল করে ফেনা তুলে হাতমুখ ধুয়ে নিল ও। তোয়ালে দিয়ে হাত মুখ আর মাথা মুছতে মুছতেও সে চিন্তা করছে ওই অচেনা মৃত লোকটার কথা। ভেবে বের করতে চেষ্টা করছে ওর এখানে আসার পিছনে আসল উদ্দেশ্য কী থাকতে পারে।

ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল সে। ক্লান্তিতে খাওয়ার আর কোন রুচি নেই। গত দুইদিনে একশো মাইলেরও বেশি চলতে হয়েছে তাকে ঘোড়ার পিঠে, সব গরু-মহিষগুলোকে একত্র করার জন্য। অন্য একটা নতুন এলাকায় তাড়িয়ে নিতে হয়েছে ওগুলোকে তার একাই। অনেক কাজও করতে হয়েছে তাকে জলাশয় পরিষ্কার করা, নতুন গরু-মহিষের বাচ্চাগুলোকে মার্কা মারা, দুটো সিংহ ফাঁদ পেতে ধরা, তারপর একটা ভালুক শিকার করা, সবই তার একা হাতেই করতে হয়েছে।

'ভাল কথা,' বলে উঠল জাভেদ। 'আমার ঘোড়ার পিঠে করে কিছু ভালুকের মাংস নিয়ে এসেছি আমি।'

'থাক এখন, এই ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় নষ্ট হবে না ওটা।'

'সিংহের মাংস খেয়েছ কোনদিন?'

'অনেকবারই খেয়েছি। খুবই ভাল। প্রথম এর কথা শুনি আমি কিট কার্সনের একটা লোকের কাছে। পাহাড়ী লোকটার সবচেয়ে প্রিয় খাবার ছিল সিংহের মাংস।'

নিজের কাপে কফি ঢেলে নিয়ে জিকো আবার বলল, 'পেট ভরে খাও, জাভেদ। আরও অনেক খাবার আছে।'

'পিঠে বানিয়েছ তুমি?'

'না।'

মাথা তুলে বাতাসে ভেসে আসা লোভনীয় গন্ধটা শুঁকে দেখল জাভেদ।

'বেয়ার সাইন?'

'আগেই বুঝেছিলাম গন্ধ তোমার নাকে ঠিকই যাবে। ঘরে ঢুকেই যখন তুমি জিজ্ঞেস করলে না, বুঝলাম খুব পরিশ্রান্ত তুমি। আমার মনে আছে ছোটকালে আমার মা যখন ডো-নাট বানাতেন, স্কুল থেকে বা বাইরে থেকে ফিরে আমি ঠিকই গন্ধ পেতাম। তা সে যত ঘণ্টা আগেই বানানো হোক না কেন আমি টের পেতামই।'

'কই দাও দেখি কয়টা? তুমি কোন কাজের না হলেও তোমার হাতের বেয়ার সাইন খাবার জন্যেই তোমাকে রাখতে হত আমার সত্যি, আজ পর্যন্ত কোথাও এত চমৎকার বেয়ার সাইন কাউকে বানাতে দেখলাম না।'

'এমনও দিন গেছে যখন একটানা তিনদিন ধরে আমাকে কেবল বেয়ার সাইনই বানাতে হয়েছে। বানিয়ে ঠেকি লাগিয়ে দিয়েছি কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকেনি একটাও। লোকজন অনেক মাইল দূর থেকেও চলে আসত আমার হাতের বেয়ার সাইন খাবার লোভে।'

এরপর চুপ হয়ে গেল দুজনেই।

কেউ কথা বলছে না। দুজনেই চিন্তামগ্ন। নীরবে খেয়ে চলেছে জাভেদ। হঠাৎ সে খেয়াল করল একাই খাচ্ছে ও। মুখ তুলে প্রশ্ন করল, 'কী হলো, তুমি খাচ্ছ না?'

'আগেই খেয়ে নিয়েছি আমি। ফার্মের জন্তুগুলোকে খাওয়াতে কেবিন থেকে বেরুতেই গুলি চালাল লোকটা। প্রথমে ঠিক করেছিলাম শালাকে দেখে নেব, কিন্তু যখন টের পেলাম ব্যাটা আমাকে বেকায়দায় আটকে ফেলেছে এই কেবিনে, তখন স্থির হয়ে বসে খাওয়াটা সেরেই নিলাম। ছোটকালেই শিখেছি ঘুম আর খাওয়া এ দুটো সুযোগ পেলেই সেরে নিতে হয়।'

উঠে গিয়ে প্লেট বোঝাই করে ডো-নাট নিয়ে এল জিকো। 'সাধ মিটিয়ে খেয়ে নাও, জাভেদ। অনেক বানিয়েছি।'

'জিকো...লোকটা কে ছিল বলে তোমার ধারণা?'

'বন্দুকবাজ—কোন সন্দেহ নেই। পিস্তলের খাপ পায়ের সাথে ফিতে দিয়ে বাঁধা—এমন চমৎকার রাইফেল—প্রথমগুলিতেই আমার কপাল ছিলে দিয়েছে দূর থেকে—ভাড়াটে বন্দুকবাজ গুণ্ডা ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না ও।'

রাইফেলটা নিয়ে যত্নের সাথে পরিষ্কার করতে শুরু করল জাভেদ। ফাঁকে ফাঁকে একবারে আস্ত এক একটা ডো-নাট মুখে পুরছে বা কফিতে চুমুক দিচ্ছে।

বাড়তে বাড়তে এখন সাতশো মত দাঁড়িয়েছে তার গরু-মহিষের সংখ্যা। ল্যাসো দিয়ে বন্য ঘোড়া ধরে পোষ মানিয়ে বেশ ভালই একটা মাসট্যাঙ ঘোড়ার দল গড়ে তুলেছে জাভেদ। সবগুলো জন্তুকে একসাথে না রেখে বিভিন্ন পাহাড়ের ফাঁকে মাঠে চরে বেড়াবার সুযোগ করে দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় রেখেছে সে। তার আশেপাশে আর কোন র‍্যাঞ্চ নেই বলে ওদের এদিক ওদিক চলে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই বিশাল এলাকাটা পুরোপুরি নিজের র‍্যাঞ্চের মতই ব্যবহার করছে জাভেদ। শীতকালে ফার্মের জীবজন্তুকে খাবার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা সত্যিই কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। বরফে ঘাস প্রায় সবই ঢাকা পড়ে যায়। কোথায়

পাহাড়ের আড়ালে ঘাস ঢাকা পড়েনি সেসব জায়গা খুঁজে খুঁজে পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করে নিজের পশুগুলোকে সেই সব এলাকায় রেখে আসে সে।

উপযুক্ত যত্ন পেয়ে দ্রুত হারে বেড়ে উঠেছে তার পশুর সংখ্যা। আগামী বৎসর কিছু বিক্রি করবে বলে স্থির করেছে সে। অনেক খেটে আর বুদ্ধি খরচ করে পশুগুলোকে টিকিয়ে রেখেছে জাভেদ। বিরাট র‍্যাঞ্চ করে বড়লোক হতে সে কোনদিনই চায়নি—তার ছোট আস্তানাতেই তৃপ্ত সে।

ভোরে উঠেই মোজা আর জামা পরে নিল জাভেদ। আগুনটাকে খুঁচিয়ে একটু উস্কে লকলকে আগুন তৈরি করার জন্য কিছু মোটা পাইন কাঠ চাপাল তার উপর। তারপর কেতলিতে পানি ভরে আগুনে চাপাল কফির জন্য।

শেভ করে স্নান সেরে তৈরি হয়ে নিল জাভেদ। দাড়ি রাখে না সে, কিন্তু গোঁফটা কাঁচি দিয়ে ছেঁটে পরিপাটি রাখাই চাই তার। আর ওটা ওকে মানায়ও খুব ভাল।

জিকো এসে ঢুকল। 'তোমার জন্যে প্রেটি ফেস সোরেলটাকে জিন চড়িয়ে সেজে রেখেছি। দিনের অবস্থা ভালই—আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে।'

'ধন্যবাদ, জিকো।'

'আমিও আসব তোমার সাথে?'

'না। এদিকে অনেক কাজ পড়ে আছে, আর তা ছাড়া র‍্যাঞ্চটাকে একেবারে খালি রাখা এখন ঠিক হবে না। র‍্যাঞ্চ পাহারা দাও তুমি, রাইফেলটা হাতের কাছেই রেখো আর কেবিন ছেড়ে বেশি দূরে কোথাও যেয়ো না।'

দাঁত বের করে হাসল জিকো। 'আমি আধা ইন্ডিয়ান, ভুলে যাচ্ছ কেন?'

'ভুলিনি, তোমার ইন্ডিয়ান অর্ধেক ঠিকই নিজেকে সামলাতে পারবে—কিন্তু তোমার আমেরিকান অর্ধেকটাকে নিয়েই ভয়!'

'তোমার জন্যে কিছু খাবার আর বেয়ার সাইন পোঁটলা করে দিয়ে দিয়েছি ঘোড়ার পিঠে।'

বাকস্কিনের কোটটা পরে নিয়ে আস্তাবলের দিকে গেল জাভেদ। সোরেলটা ট্রেইল করার জন্য খুব ভাল। মরগ্যান আর মাসট্যাঙের মিলনের ফল। তাগড়া, আর বেশ ছুটতে পারে।

ঘোড়ায় চেপে বসল জাভেদ। ঘোড়ার পিঠে হাত রেখে জিকো বলল, 'তুমি খুব সতর্ক থেকো। ওই লোকটার মুখ চেনাচেনা বলছিলাম—খারাপ লোকজনের সাথেই ওকে আমি দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।'

জিকো অবশ্য মনে মনে জানে ওকে সাবধান করার কোন দরকার নেই। কি পাহাড়ে কি জঙ্গলে, জাভেদ যে কোন অ্যাপাচির মতই ট্রেইল অনুসরণে পটু। দুই বৎসর টেক্সাসে বনরক্ষী হিসাবে বেশ নাম কিনেছিল সে। তবে ওর চিরকালের অভ্যাস, একেবারে নাচার না হলে কখনও গুলি করে না ও।

মাটিতে ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গতকালের বৃষ্টির পানি অনেকটা কেটে গেছে। গতরাতে র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে প্রথম কিছুদূর ঘোড়াটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে, তারপর গতি কমিয়ে শেষ পর্যন্ত হাঁটা ধরেছে। কয়েকখানে বোঝা যায় ঘোড়াটা থেমে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করেছে, হয়তো পথটা সঠিক ভাবে

চিনে নেবার জন্যই। গুয়াডালুপ ক্যানিয়নে নীচে নেমে সোজা ডান দিকে রওনা হয়েছে ঘোড়াটা।

স্যান সিদ্রো কেবল নামে মাত্র শহর। দুটো বড় আর একটা ছোট দোকান, দুটো বার–আসলে তিনটে, কিন্তু তৃতীয়টা মাঝেমধ্যে থাকার জন্য ঘর ভাড়া দেয় বলে ওরা ওই বারটাকে হোটেল বলে। আর কিছু বাড়িঘর আছে ওখানে–বেশিরভাগই কাঁচা। দুপুরের সামান্য আগেই জাভেদ শহরে পৌঁছল।

চারটে ঘোড়া বাঁধা রয়েছে ঘোড়া রাখার জায়গায়। লোকজন কেউ নেই রাস্তায়। ঘোড়াগুলোর মধ্যে তিনটে একই মার্কার, কিন্তু মার্কাটা এই এলাকায় অপরিচিত। নিজের ঘোড়াটাকেও ওগুলোর পাশে বেঁধে রেখে বারে ঢুকল জাভেদ।

বারের ভিতর চারজন লোক বসা। দুজন জাভেদের অচেনা, তৃতীয়জন এখানকার ডেপুটি শেরিফ বব রকেটি আর চতুর্থজন ন্যাসিমিয়েনটোর ফাঁদ-পাতা শিকারী স্টিভ লোগান।

সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে অভিবাদন সেরে বব জিজ্ঞেস করল, 'কোথাও চলেছ নাকি, জাভেদ? বৎসরের এই সময়ে তোমাকে এদিকে দেখব আশা করিনি।'

'মাঝে মধ্যে ঘর ছেড়ে বেরুতে হয় মানুষকে,' জবাব দিল জাভেদ। কৌতূহলী চোখে অচেনা দুজনকে জরিপ করে নিচ্ছে সে। লোক দুটোর শক্ত সমর্থ চেহারা–কিন্তু এখানে কী করছে এরা? আশেপাশে এখানে কোথাও ওই 'এম' মার্কার র‍্যাঞ্চ নেই, তবে? আর তৃতীয় আর একজনের থাকার কথা, সে-ই বা কোথায়?

ডেপুটি শেরিফ ববও চিন্তা করছে। এর আগে সে দুটো আইন ছাড়া শহরে মার্শালগিরি করে এসেছে। আরও দুই একটা শহরে বিয়ের আগে সে কৃতিত্বের সাথেই শেরিফ আর ডেপুটি শেরিফের কাজ করেছে। কিন্তু বিয়ের পরে দুই ছেলেমেয়ের বাপ সে এখন–ঝামেলা আর চায় না ও, তাই ইচ্ছে করেই শান্তিপূর্ণ নিরিবিলি শহরটায় কাজ নিয়ে বদলি হয়ে এসেছে।

অস্ত্রের ব্যবহার ভালই জানে বব, নিজের কাজও খুব ভাল মতই বোঝে। সেইজন্যই জাভেদকে এত ভয় তার। রীতিমত শঙ্কিত বোধ করছে সে ওকে দেখে।

ওর মত মানুষ আগেও দেখেছে বব। বিল হিকক, কোর্টরাইট এদের দেখেছে সে, কিন্তু জাভেদ একটু অন্যরকম। অনেকটা টিলগ্‌ ম্যান, জিলেট বা জন হিউ-এর মত। মনে মনে সে জানে জাভেদের মত মানুষ একবার খেপলে তাকে সামলানো সত্যিই মুশকিল।

চুপচাপ মানুষ জাভেদ। তাকে মদ খেতে খুব কমই দেখেছে বব। আজকে বারে তার উপস্থিতিতে বেশ অস্বস্তি বোধ করছে সে। নিজের কাজ সে ঠিকই বোঝে, আর সে এ-ও জানে, জাভেদের আজকের এই শহরে হঠাৎ করে হাজির হবার আসলেই কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। মাত্র দুই সপ্তাহ আগেই সে শহর থেকে তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে নিয়ে গেছে। দু'তিন মাসের আগে তার আর নতুন সাপ্লাইয়ের দরকার হবার কথা নয়। সে যে মদ খেয়ে মাতাল হতে বা কারও সাথে দেখা করতে আসেনি তা বোঝাই যাচ্ছে। অভিজ্ঞ শেরিফ আবার মুখ তুলে জাভেদের দিকে চেয়ে দেখল–নিঃসন্দেহের বিপদ ঘনিয়ে আসার পূর্বাভাস দেখতে

পাচ্ছে সে।

নিজের গ্লাসটা নিয়ে অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে পরিস্থিতিটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছে বব। অস্বাভাবিক ঘটনা কি কিছু ঘটেছে? কী এমন ঘটে থাকতে পারে যার কারণে জাভেদ আজ শহরে এসেছে?

উত্তরটা নিতান্তই সোজা। তিনজন অপরিচিত লোক যারা এসেছে শহরে তাদের প্রত্যেকেই কঠিন লোক, সব কয়জনই সশস্ত্র। ওদের পোশাক সাধারণ কাজ করে খেটে খাওয়া মানুষের চেয়ে অনেক কেতাদুরস্ত। পয়সার অভাব নেই অথচ খেটে খায় না, তবে কী করে ওরা–বন্দুকবাজি? ডাকাতি?

'স্টেজ কোচ এসে পৌঁছবার সময় হয়ে এল,' মন্তব্য করল ডেপুটি শেরিফ।

'বৎসরের এই সময়টায় খুব একটা ভিড় থাকে না স্টেজে,' বারের পিছন থেকে বলে উঠল ফ্রেড। 'লোকজনের দোষ দেয়া যায় না এতে,' বারের উপর কনুইয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল সে। 'সবাই তুষার পড়ার আগে শীতের সময় এই অঞ্চলটাকে এড়িয়ে চলে।'

অচেনা দুজনের মধ্যে একজন ফিরে চাইল। 'খুব শীত পড়ে নাকি এখানে?'

মাথা ঝাঁকাল বব তার গ্লাসের দিকে চেয়ে। 'জায়গাটা অনেক উঁচু। সমুদ্র থেকে প্রায় এক মাইল। এই শহর থেকেও আশেপাশের এলাকা আরও উঁচুতে। এই জাভেদের কথাই ধরো,' হাতের ইশারায় জাভেদকে দেখাল বব, 'ওর আস্তানা তো এখান থেকে আরও আধ মাইল উঁচুতে। আর ঠাণ্ডা? তা শূন্যের নীচে চল্লিশ ডিগ্রী পর্যন্ত যেতে আমি নিজেই দেখেছি।'

দরজা খুলে একজন বিশালদেহী লম্বা লোক ঘরে ঢুকল। লম্বায় হয়তো জাভেদের থেকে মাত্র ইঞ্চিখানেক বেশি হবে, কিন্তু ওজনে অন্তত তিরিশ পাউন্ড বেশি। পেশীপুষ্ট কাঁধের উপর ওর চৌকো মাথাটা বসানো। এগিয়ে এল লোকটা। ওজন তার গতির ক্ষিপ্রতা বিন্দুমাত্র খর্ব করেনি। জাভেদের দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েও আবার পরক্ষণেই তীক্ষ্ণ চোখে ফিরে চাইল লোকটা।

'কোথায় যেন তোমাকে দেখেছি আমি,' বলল সে।

'অসম্ভব কী?' জবাব দিল জাভেদ।

'এ দিকেই থাকো নাকি তুমি?'

অচেনা লোক দুজন সিধে হয়ে দাঁড়াল বারের পাশে। শেরিফও সচেতন হলো।

'হ্যাঁ।' ছোট্ট জবাব দিল জাভেদ।

লোকটা একটু ইতস্তত করল, যেন আরও কিছু বলবে কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বাইরে থেকে একটা উঁচু-গলার চিৎকার শোনা গেল। ঘোড়ার খুরের শব্দ তুলে স্টেজ-কোচটা দরজার বাইরে থামল।

জাভেদের মনে হলো বব যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তবু নতুন লোক তিনজন দরজা দিয়ে বেরুবার আগে সে নড়ল না।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। স্টেজ-কোচটা দাঁড়িয়ে আছে দেখা যাচ্ছে। ওটার পিছনে একটা ঘোড়া বাঁধা।

স্টিভ ভিতরে ঢুকল, 'শেরিফ,' বলল সে। 'বাইরে ঘোড়ার পিঠে করে একটা

মড়া নিয়ে এসেছে ওরা।'

বারের পিছন থেকে ফ্রেড বেরিয়ে এল। জাভেদ ছাড়া আর সবাই বেরিয়ে গেল কী হয়েছে দেখতে। নিজের গ্লাসটা আবার ভরে নিল জাভেদ।

কৌতূহলী চোখে স্টিভ ফিরে চাইল ওর দিকে। 'তুমি দেখতে গেলে না?' প্রশ্ন করল সে।

'আমি?' চোখ তুলে ওর দিকে তাকাল জাভেদ, 'মরা মানুষ আগেও দেখেছি আমি।' গ্লাস তুলে ঢক করে এক ঢোকে শেষ করে ফেলল সে হুইস্কিটুকু। আজ যে কেন মদ খেলো তা সে নিজেও জানে না। আসলে মদ খেতে বিশেষ ভাল লাগে না তার। অল্প খেলে মোটেই ধরে না তাকে। আর ধরার মত বেশি খেয়েও দেখেছে, কিন্তু সেই অনুভূতিটা ভাল লাগেনি তার।

আবার দরজাটা খুলে গেল। লোকজন ধরাধরি করে বারে পুল খেলার ছোট বিলিয়ার্ড টেবিলটার উপর রাখল মৃতদেহটা। বিশাল লোকটা ঢুকল ওদের পিছন পিছন। ওর মুখে বিস্ময় আর রাগ ফুটে উঠেছে। ফ্রেড আর ববের সাথে আর একটা লোক ঢুকল, বোঝাই যায় ওই লোকটাই স্টেজ ড্রাইভার।

'এখান থেকে প্রায় মাইল দশেক আগে,' বলছে স্টেজ ড্রাইভার। হঠাৎ দেখি একটা ঘোড়া আমাদের দিকে হেঁটে আসছে। ভাবলাম এটা শেরিফের দেখা দরকার, তাই তোমার কাছেই নিয়ে এলাম।'

বিরক্ত মুখে মৃত লোকটার দিকে চাইল শেরিফ। তার ভাবটা এই যে কেন আবার এই ঝামেলা বয়ে আনতে গেলে তোমরা? চলেই তো যাচ্ছিল—এই দেশ ছেড়ে চলে গেলেই বা কার কী ক্ষতি হত?

'তোমরা কেউ চেনো একে?' প্রশ্ন করল বব।

কেউ জবাব দিল না তার প্রশ্নের। স্টিভ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল জাভেদের দিকে। ব্যাপারটা ববের চোখ এড়াল না।

'কয়েকটা গুলি খেয়েছে লোকটা,' বলে উঠল ফ্রেড। 'আমার মনে হয় এটা গতকাল সন্ধ্যার ঘটনা।' শেরিফ ওর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাতেই সে অপ্রস্তুত ভাবে একটু হাসল। 'যুদ্ধের সময়ে ডাক্তারদের সাথে কাজ করতে হয়েছিল আমাকে, তাই জখম সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আছে আমার,' কৈফিয়ত দিল সে।

'গত সন্ধ্যার ঘটনা হলে অনেক দূর থেকেও এসে থাকতে পারে ঘোড়াটা,' মন্তব্য করল বব।

জাভেদ পরিষ্কার বুঝতে পারছে শেরিফের মাথার ভিতর কী চিন্তা চলেছে। সে ভাবছে, তা হলে এই ঘোড়াটা জাভেদের র‍্যাঞ্চের কাছ থেকেও এসে থাকতে পারে। অবশ্য জেমেজ থেকেও যে আসতে পারে না তা নয়—কিন্তু বব যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে মাথায়।

'সবগুলো জখমই ওর সামনের দিকে হয়েছে,' মন্তব্য করল জাভেদ।

'সেটাই তো স্বাভাবিক,' বলে উঠল স্টিভ লোগান। 'লোকটা যে শাইনি ডিক!'

নামটা শুনেই ঝট করে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল বব। 'বলো কী! কিন্তু সে তো একজন নামকরা ভাড়াটে খুনী, ও এদিকে আসতে যাবে কেন?'

'তা আমি কী করে বলব?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল স্টিভ। 'হয়তো কেউ তার কোন শত্রুর পিছনে পাঠিয়েছিল ওকে।'

'ডিক নিশ্চয়ই অন্তত পাঁচ-ছয়জনকে ঘায়েল করেছে মরার আগে,' বলল ফ্রেড।

'সেটা সবাই জানে,' ওকে সমর্থন করল স্টিভ। 'কতজনকে যে ও খতম করেছে গত সন্ধ্যায় কে বলতে পারে?'

বিশাল দেহ লোকটা স্টিভের দিকে ফিরে ধমকে উঠল, 'চুপ করো, বেশি কথা বলছ তুমি!'

'কেন তোমার পছন্দ হচ্ছে না?' মোলায়েম স্বরেই জিজ্ঞেস করল স্টিভ। ফুটখানেক লম্বা শিকারের ছুরিটা আনমনে নাড়াচাড়া করছে সে।

'থামো তো তোমরা,' বাধ সাধল শেরিফ। জাভেদ বুঝল উপযুক্ত শেরিফ বব, গোলযোগের গন্ধ ঠিকই টের পেয়েছে লোকটা।

দরজা খুলে একটা লোক ঢুকেই বিশাল লোকটাকে সম্বোধন করে বলল, 'ম্যাট, মিস পেজ যাবার জন্যে তৈরি, গাড়ি নিয়ে এসেছি আমি।'

ওদের সাথে জাভেদও বেরিয়ে এল রাস্তায়, পিছন পিছন ববও এল।

একজন লম্বা যুবক মেয়েটাকে স্টেজ থেকে নামতে সাহায্য করছে। গাঢ় বাদামী রঙের চুল মেয়েটার। জাভেদ ওর দিকে তাকাতেই মেয়েটাও চোখ তুলে চাইল—সবুজ চোখ ওর। মিস পেজকে সাথে করে এক্কাগাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল লোকটা। ম্যাটও যোগ দিল ওদের সাথে। ম্যাট লোকটাকে কী যেন বলতেই সে ক্রুদ্ধ চোখে কটমট করে ফিরে তাকাল তার দিকে। ম্যাটকে বকাঝকা করল লোকটা নিচু স্বরে, মেয়েটা নীরবে দাঁড়িয়ে শুনছে।

মনস্থির করে ফেলেছে বব। সে ওদের দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি এখানে বসবাস করবে বলে ঠিক করেছ?'

ম্যাট ঘুরে ববের দিকে ফিরে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমরা আপাতত ডেভিডের বাড়িটা ভাড়া নিয়েছি, আমাদের গরু-মহিষগুলো এসে পৌঁছলেই আমরা ভাচে ক্রীকের দিকে সরে গিয়ে র‍্যাঞ্চ খুলব।'

বব কী যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই জাভেদ বলে উঠল, 'ওদিকে র‍্যাঞ্চ পাওয়ার কোন আশা নেই তোমাদের।'

সবার চোখ জাভেদের উপর পড়ল।

'কেন আশা নেই জানতে পারি?' উদ্ধত কণ্ঠে জানতে চাইল ম্যাট।

'কারণ, কাজ সারতে পারেনি সে,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল জাভেদ।

দুই

বাতাসে একটা শুকনো ঝরা পাতা উড়িয়ে নিয়ে গেল বড় রাস্তার উপর দিয়ে। এক্কাগাড়ির খচ্চরটা একটু নড়ে উঠতেই ওর গলায় বাঁধা ঘণ্টাটা মৃদু শব্দে বেজে

উঠল। জাভেদের কথা কয়টা বাতাসকে ভারি করে তুলেছে। সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসেছে সে।

যে লোকটা মেয়েটাকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করেছিল সে ঘুরে দাঁড়াল। 'তোমার এ কথার মানে কী?' জানতে চাইল সে।

পাতলা ছিপছিপে গড়ন লোকটার। মুখটা সুদর্শন কিন্তু বোঝা যায় ওই মুখের পিছনে লুকিয়ে আছে বর্বরতা। জাভেদ আগেও এই ধরনের চেহারার অন্তরালে কুৎসিত মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। অস্থির চিত্ত হয় এরা। এই অস্থির মনোভাবই এদের নিজের বা অন্যের অনর্থক মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

'আমার নাম জাভেদ বক্স। "জে" মার্কা র‍্যাঞ্চের মালিক আমি। আর ভাচে ক্রীক আমার এলাকা।'

'বুঝতে পারছ না তুমি,' এবারে কথা বলে উঠল মিস পেজ যেন অবুঝ কোন শিশুকে বোঝাচ্ছে, ঠাণ্ডা সংযত কণ্ঠস্বর। 'ভাচে ক্রীকের সাথে চল্লিশ দাগ জমি আমাদের সম্পত্তি।'

'ভাচে ক্রীকে একটাই র‍্যাঞ্চ আছে আর ওখানে মাত্র একটা র‍্যাঞ্চ করার মতই জায়গা আছে–সেই জায়গা আমার।' কোন রকম দ্বিধা না করেই ঘোষণা করল জাভেদ।

এক হাতে তার স্কার্টটা ঠিক করে নিল মেয়েটা। তার আশ্চর্য রকম পাতলা ঠোঁটে একটা পোশাকী হাসি লেগে রয়েছে। ঠাণ্ডা চোখে যাচাই করে দেখছে সে। 'আমার সত্যিই দুঃখ হচ্ছে তোমার জন্যে, কিন্তু আমি নিরুপায়। ভুল করছ তুমি, ওই জমি আমাদের সম্পত্তি সেই ১৮৪৪ থেকে। যারা অন্যায় ভাবে জবর দখল করে ওটা ভোগ করেছে এতদিন তাদের উঠে যেতেই হবে।'

'নিজের দাবি সম্বন্ধে তোমরা এতই নিশ্চিত যে আগেই ভাড়াটে খুনী পাঠিয়েছিলে জায়গার দখল নেবার জন্যে?'

মারমুখো হয়ে এক পা এগিয়ে এল ম্যাথিউ। 'কী বলতে চাও তুমি?'

'কথাটা যেভাবে খুশি নিতে পারো তোমরা।' ম্যাটই ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক লোক, ওর চোখে চোখে চেয়েই কথাগুলো বলল জাভেদ। মাথা মোটা লড়িয়ে লোক ম্যাট, ওকে সহজে সামলানো যাবে না। সেটা বোঝাই যায়। 'যে দল নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ভাড়াটে বন্দুকবাজ পাঠায়, তাদের যে নিজেদের দাবি সম্পর্কে কোন আস্থা নেই তা জলের মত পরিষ্কার।'

'তুমি কি কোন ব্যাপারে আমাদের দায়ী করছ?'

'শাইনি ডিক এখানে ছেলেখেলা খেলতে আসেনি। আমার কর্মচারীকে গুলি করে সামান্য আহত করেছে সে। শুনেছি ডিককে ভাড়া করতে অনেক টাকা লাগে। আমার ধারণা ওকে পাঠানো হয়েছিল আমাকে হত্যা করে তোমাদের দাবি নির্বিরোধে প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই।'

ওদের কথা আর বেশিদূর গড়াতে দিল না বব। কথার মাঝেই বাধা দিয়ে সে বলে উঠল, 'জাভেদ, ঠাণ্ডা মাথায় আমাদের বিচার করে দেখতে হবে ব্যাপারটা। ওদের যদি সত্যিই কোন দাবি...'

'ওদের কাগজপত্র যদি কিছু থাকে কানাকড়িও দাম নেই তার,' রূঢ় ভাবে

বলে উঠল জাভেদ। 'গুয়াডালুপ ক্যানিয়নে ভাচে ক্রীক ছাড়া এমন কোন জায়গা নেই যেখানে আর একটা র‍্যাঞ্চ করে একটা প্রাণীও বাঁচিয়ে রাখা যাবে। ভাচে ক্রীক আমার জায়গা, আমি সরাসরি জানিয়ে দিচ্ছি যে "জে" মার্কা ছাড়া অন্য কোন পশুকে চরতে দেয়া হবে না ওই এলাকায়।'

গাড়ির পিছনের চাকার দাঁড়ায় একটা পা তুলে দিয়ে দাঁড়িয়েছে মলিন বাকস্কিনের জামা পরা পাহাড়ী শিকারী স্টিভ। মিটিমিটি হাসিমুখে কথা শুনছে আর তামাশা দেখছে সে।

মেয়েটা আবার কথা বলে উঠল। 'আমার নাম নীনা পেজ। ভাচে ক্রীকের আশেপাশের অনেকটা জমি আমার দাদার নামে লিখে দিয়েছিলেন গভর্নর আর্মিজো। আমার দলিলে তার সব শর্তাবলী স্পষ্টভাবেই লেখা রয়েছে। তবে তুমি নিশ্চয়ই জমিটার কিছু উন্নতি করেছ, সেজন্যে আমি তোমার ক্ষতিপূরণ দিতে পারি,' হাতের ব্যাগটা খুলল মেয়েটা। 'আর তোমার যা স্টক আছে তাও আমি কিনে নিতে রাজি আছি।'

আপোষে সব মীমাংসা হয়ে যাবার সুযোগ দেখে লাফিয়ে উঠল বব। 'সে তো খুব ভাল কথা,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল সে। 'কী বলো, জাভেদ?'

'জমিটা আমার এবং আমারই থাকবে। একটু কষ্ট স্বীকার করে সান্তা ফেতে খবর নিলেই তোমরা জানতে পারবে আর্মিজোর কোন দলিল বা চুক্তির কতটুকু দাম দেয়া হয়।'

হতবুদ্ধির মত নীনার দিকে মুখ তুলে চাইল ম্যাট। এর জবাব তার জানা নেই, নীনার কিছু বলার অপেক্ষায় রইল সে।

'তুমি কি একটা মেয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবে নাকি? আমার তো ধারণা ছিল পশ্চিমের লোকেরা সত্যিকার পুরুষ।'

মুখের কথায় টলার পাত্র নয় জাভেদ। সে জবাব দিল, 'খেলায় যখন নেমেছ, সুন্দরী, ছেলেই হও আর মেয়েই হও, যে-ই আমার জমিতে পা দেবে তার বুকেই বিঁধবে আমার বুলেট। আমার জমি নিতে হলে কেবল মুখের মিষ্টি কথায় কাজ হবে না। কোন মেয়ে যদি পুরুষের খেলা খেলতে নামে, প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ীই খেলতে হবে তাকে।'

'শোনো, জাভেদ!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল শেরিফ, 'শাইনি ডিকের সাথে এই ভদ্রমহিলার কোন সম্পর্ক আছে এমন কোন প্রমাণ নেই তোমার কাছে। তোমার কথা তোমাকে ফিরিয়ে নিতে হবে। ক্ষমা চাইতে হবে তোমার এই মহিলার কাছে!'

শেরিফের কথাকে কোন পাত্তা না দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে বারে গিয়ে ঢুকল জাভেদ। বিলিয়ার্ড টেবিলের উপর থেকে দেহটাকে সরিয়ে নিয়ে পিছনের ঘরে একটা টেবিলে রাখা হয়েছে। ওর দেহের কিছুটা অংশ এঘর থেকে এখনও দেখা যাচ্ছে।

বব রকেটিও জাভেদের পিছন পিছন ঢুকল বারে। হেলান দিয়ে বারের উপর ঝুঁকে পড়ে বন্ধুসুলভ গলায় সে জিজ্ঞেস করল, 'চলবে এক গ্লাস?'

'ধন্যবাদ. আমার আর লাগবে না।'

'খুবই দুঃখের বিষয়,...এভাবে ঠিক শীতের আগে দিয়ে নিজের থাকার জায়গাটা পর্যন্ত হারানো...সত্যিই দুর্ভাগ্যের বিষয়।'

জাভেদ কটমট করে ববের দিকে চাইল একবার, কিন্তু কোন জবাব দিল না।

'তোমার জায়গায় আমি হলে ওদের সাথে কথাবার্তা বলে একটা আপোষ মীমাংসা করার চেষ্টা করতাম। ওদের জন্তু-জানোয়ারগুলোও তো শুনছি পথে রয়েছে...পৌঁছল বলে।'

'তোমার হয়েছেটা কী বলো তো, বব? তুমি এখানকার ডেপুটি শেরিফ নাকি ওদের উকিল? ওই জমিটা আমার। আমি ওখানে বাস করি, ওখানেই খেটে খাই, আর আমার দলিলটাও পাকা দলিল। তুমি কি মনে করেছ কেউ আমাকে মিথ্যে ধাপ্পা দিয়ে ওখান থেকে বের করতে পারবে? তোমার যা কাজ তাই করো তুমি, বব–বেশি বুঝতে যেয়ো না।'

রাগে মুখ লাল হয়ে উঠল ববের। 'আইনের লোক আমি, আইন প্রয়োগ করব। তাতে তোমার অসুবিধা হলেও করার কিছু নেই আমার।'

'আমার মনে হয়,' মাঝখানে নরম গলায় ফোড়ন কাটল স্টিভ, 'জাভেদের কথাই বেশি টেকসই হচ্ছে এখানে। আমরা সবাই দেখেছি গত চার বৎসর ধরে ওখানে র‍্যাঞ্চ করে রয়েছে সে–জায়গটাও রয়েছে তার দখলেই, আর তার কাছে পাকা দলিল আছে একথাও জানিয়েছে ও। আমি শেরিফ হলে ব্যাপারটাকে ভাল করে ভেবে দেখতাম।'

ওর কথায় আরও খেপে গেল বব। ওর কথার পিছনে জোরাল যুক্তি আছে অস্বীকার করার উপায় নেই, কিন্তু ওদের মত লোক ধাপ্পা দেবে এটাও তো বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়–বিশেষ করে মেয়েটা কিছুতেই অসৎ হতে পারে না। ওদের আভিজাত্য প্রথম নজরেই ধরা পড়ে। ভাল ঘরের মেয়েদের উচিত সম্মান দিতে শেখানো হয়েছে তাকে। একজন বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা মহিলা জঘন্য একটা ষড়যন্ত্রের সাথে কখনোই জড়িত থাকতে পারে না। তা ছাড়া ওদের যদি কোন দাবিই না থাকবে তবে এত ঝামেলা করে এতসব জন্তু-জানোয়ার নিয়ে অতদূর থেকে ওরা আসবেই বা কেন? টাকা আর ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধা আছে ববের–আর সে দু'টোই আছে এমন অনেক ইঙ্গিত এরই মধ্যে ওদের কাছ থেকে পেয়েছে সে।

'ওরকম একটা মেয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারে না,' বলল বব।

'তোমার যদি মেয়েদের সম্বন্ধে ওই ধারণা থাকে তবে বলতে হবে নারীর একশো এক রূপের মাত্র একটাই দেখেছ তুমি!' হাসল জাভেদ, কিন্তু সেই হাসিতে ঠাট্টার লেশমাত্র নেই।

দরজা খুলে নীনা পেজ, ম্যাথিউ ব্রিকাবি আর সেই সুদর্শন যুবক ঢুকল বারে।

'আমি তোমাকে আবার অনুরোধ করছি, মিস্টার বক্স, ভাচে ক্রীকটা ছেড়ে দাও তুমি।'

ঘুরে মেয়েটার মুখোমুখি দাঁড়াল জাভেদ। 'কেউ তোমাকে খুব ভুল তথ্য সরবরাহ করেছে, মিস পেজ। যে জমি তুমি দাবি করতে এসেছ তা কি নিজে দেখেছ তুমি কোনদিন? তুমি কি সঠিক জানো কীসের মধ্যে ঢুকতে চাচ্ছ তুমি? ওখানে বড় র‍্যাঞ্চ করতে গেলে জানো কী রকম বিপাকে পড়তে হবে তোমাকে?

ওই গুয়াভালুপ ক্যানিয়ন এখান থেকে উত্তরে, চওড়ায় কোথাও আধ মাইল কোথাও বা এক মাইল। কিন্তু উপত্যকায় মাত্র কয়েকশো ফুট চওড়া ওটা। আর এর কোথাও একটা পশুর বড় দলকে খাওয়ানোর মত ঘাস নেই।

'আরও উত্তরে আরও সরু হয়ে এসেছে। শীতকালে আমরা মাঝে মধ্যে তুষারের জন্যে মাসখানেকও আটকা থেকেছি। গ্রীষ্মে অবশ্য বেশ কিছু পশুর খাবার ওখানে পাওয়া যায় কিন্তু শীতে পশুর খাওয়া জোগানো এই এলাকা সম্পর্কে কারও বিশেষ জানা শোনা না থাকলে অসম্ভব। সমতল জায়গার র‍্যাঞ্চারদের এসব শিখে নিতে কয়েক বৎসর লাগবে। যাকেই জিজ্ঞেস করো সে-ই বলবে সমুদ্র থেকে দেড় মাইল উপরে র‍্যাঞ্চ করা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই না।

'আমি বলব এই শীতের আগে দিয়ে এখানে অনেক জন্তু জানোয়ার নিয়ে র‍্যাঞ্চ করতে আসার বুদ্ধি তোমাকে যে-ই দিয়ে থাকুক, খুব ভুল করেছে। এখন আমার পরামর্শ হবে ওগুলো নিয়ে কাছেই কোন ফোর্ট বা মার্কেটে, যেখানে ইন্ডিয়ানদের জন্যে পশু কেনা হয়, গিয়ে ওগুলো বিক্রি করে দাও। তারপর এখানে এক বৎসর নিজেরা থেকে সব দেখার পরও যদি তোমাদের এই এলাকায় র‍্যাঞ্চ করার শখ থাকে তবে তখন তোমরা যে সব জায়গা খালি আছে এখনও তারই একটা বেছে নিতে পারো।'

'ভাচে ক্রীকেই আমার জমি, মিস্টার জাভেদ বক্স,' ঠাণ্ডা স্বরে বলে উঠল মেয়েটা। 'আমি তোমাকে অনেক সাক্ষীর সামনে ভালয় ভালয় জায়গাটা ছেড়ে দিতে বললাম। কিন্তু তা যদি না দাও তবে আমার লোকেরা আমাদের র‍্যাঞ্চের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার জন্যে তোমার ওপর খুব একটা সন্তুষ্ট থাকবে না।'

'খুবই আশ্চর্য কথা,' ধীর শান্ত গলায় বলল জাভেদ। 'তোমরা এখানে কোন ঘর-বাড়ি তৈরির ব্যবস্থা না করেই এই অসময়ে শীতের আগে দিয়ে হাজির হয়েছ! মনে হয় যেন তোমরা আমার কথা আগে থেকেই জানতে, ভেবেছিলে আমাকে তাড়িয়ে আমার ঘরগুলো পাবে। মনে হয় এও তোমরা জেনেই এতগুলো পশু নিয়ে রওনা হয়েছ যে শীতের কিছুটা সময় তোমাদের আগে থেকে জমিয়ে রাখা খাবার খাওয়াতে হবে ওদের—সেখানেও তোমরা আমার জমানো খাবারই ব্যবহার করার পরিকল্পনা নিয়েছিলে। এই জন্যেই কি তোমরা শাইনি ডিককে পাঠিয়েছিলে পথ পরিষ্কার করতে?'

ভুরুতে ভাঁজ পড়ল ববের। নীনা পেজের দিকে চোখ তুলে চাইল সে। এই প্রথম বারের মত তার চোখে সন্দেহের ছায়া পড়ল। কথাগুলো খুবই যুক্তিসঙ্গত, র‍্যাঞ্চ সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান আছে এমন লোকও এই কথার যুক্তি পুরোপুরি বুঝতে পারবে।

দরজার দিকে এগিয়ে গেল নীনা। দরজার কাছে একটু থেমে পিছন ফিরে বলল, 'আমার বক্তব্য শুনেছ তুমি, তোমাকে সবার সামনে ভাচে ক্রীক খালি করে দেবার জন্যে নোটিশ দেয়া হয়েছে। আমার গরু-মহিষগুলো এসে পড়লেই আমি ভাচে ক্রীকের দখল নেব।'

দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল ওরা। সেলুনের স্প্রিঙ লাগানো বাদুড়-পাখা দরজার ডালা দুটো সামনে পিছনে দুলতে থাকল। বার আর স্টেজ-স্টেশনের

ভিতর সবাই নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'ছয়জন আছে ওরা এখানে,' স্টিভ তার মতামত জানাল। 'পশু তাড়িয়ে আনছে যারা তারাও সংখ্যায় ডজনখানেকের কম হবে না,-'হুম, বলা যায় বেশ কঠিন লড়াইয়ে জড়িয়ে গেছ তুমি, জাভেদ।'

'আমার একজনই লোক আছে, কিন্তু সে একাই ওদের একডজনের সমান। তা ছাড়া আমার ঘরে আছে প্রচুর খাবার আর এক হাজার রাউন্ড গুলি। ওরা যদি নিজেদের জন্যে ঝামেলা তৈরি করতে চায় তবে ঠিক জায়গাতেই কড়া নেড়েছে।'

গ্লাসের বাকি মদটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে দরজার দিকে এগুলো জাভেদ। ফেরার পথ ধরতে হবে এখনই, নইলে রাত হয়ে যাবে তার।

দরজার কাছাকাছি পৌঁছে ডাক শুনে থামল সে।

'জাভেদ,' নরম নিচু কণ্ঠে বলল সে। 'আমি ভাবছিলাম একটা কথা-তুমি কি ভেবে দেখেছ, লোকগুলোর চলা-বলা ধরন-ধারণ দেখে মনে হয় ওরা খুব চালু লোক। টাকা পয়সাও ওদের যথেষ্ট আছে বলেই মনে হয়-কিন্তু তাই যদি হবে, তবে ওরা যেখানে ছিল সেই জায়গাটা কী দোষ করল? একমাত্র গরীব লোকদেরই একখান থেকে আর একখানে গিয়ে আস্তানা বাঁধতে দেখা যায় ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্যে। ওরা বড়লোক, ওদের কেন জায়গা পরিবর্তনের দরকার হলো?'

স্টিভের কথাগুলোকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে প্রসঙ্গ পাল্টে বব বলে উঠল, 'আচ্ছা, জাভেদ, ডিক মরেছে সামনের দিকে গুলি খেয়ে, যে-ই মেরে থাকুক ওকে, সে প্রশংসার পাত্র-কিন্তু আসলে ঘটনাটা কী ঘটেছিল বলো তো?'

সংক্ষেপে মাঠের মধ্যে ঘোড়ার চলার দাগ দেখতে পাওয়া থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছে বলল জাভেদ। মনে মনে অবাক না হয়ে পারল না বব। নিজেও সে ভাল লড়তে পারে, ভাল যোদ্ধাও সে। জাভেদ সংক্ষেপে বললেও বাকিটা আঁচ করে নিতে কোন অসুবিধা হলো না তার। বেশির ভাগ লোকই ওই অবস্থায় পড়লে নিশ্চিত ভাবে মারা পড়ত, কিন্তু জাভেদ সেখানে বুঝে শুনে বুদ্ধি খাটিয়ে সামনাসামনি গোলাগুলিতে ডিককে পরাস্ত করেছে!

'ওর কি কোন শত্রুতা ছিল তোমার সাথে?'

'স্টিভ ওর নাম বলার আগে ও যে কে তাই আমি জানতাম না। বব, কোন কিছু ঘটার আগে আমার বিশ্বাস ওদের কাগজপত্রগুলো তোমার একবার ভাল করে পরীক্ষা করা উচিত।'

'কাগজপত্র?'

'ওদের কাছে নকল হলেও কিছু না কিছু কাগজ বা দলিল নিশ্চয়ই থাকবে। ওরা কি খালি হাতে ওদের দাবি জানাতে এসেছে বলে তুমি মনে করো?'

একেবারে বোকা হয়ে গেল বব। সত্যিই তো! শুধু ওদের মুখের কথাতেই সে প্রায় জাভেদকে র‍্যাঞ্চ ছাড়ার আদেশ দিতে যাচ্ছিল! ওরা কয়েকজন অপরিচিত লোক বৈ তো নয়? কাগজপত্রগুলোই ভাল করে দেখতে হবে তাকে। কিন্তু কথা হচ্ছে পড়াশোনায় কোনদিনই ভাল ছিল না সে। যখন সে এই চাকরিটা নিয়েছে তখন ভেবেছিল এবার নির্ঝঞ্ঝাটে কাটবে তার-কিন্তু এ কোন্ ঝামেলায় পড়ল সে?

সন্ধ্যায় র‍্যাঞ্চে পৌঁছতেই জিকো লণ্ঠন হাতে কেবিন থেকে বেরিয়ে এগিয়ে

এল জাভেদের কাছে। একটু আড়ষ্টভাবেই ঘোড়া থেকে জাভেদকে নামতে দেখল সে। আস্তাবলে ঘোড়ার জিন আর লাগাম খুলতে খুলতে জিকোকে আজ দুপুরের সব ঘটনার বর্ণনা দিল জাভেদ।

'কঠিন দল এটা,' শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করল জাভেদ। 'আমার ধারণা এই সবকিছুর পিছনে রয়েছে অ্যালেকজান্ডার শার্প, মেয়েটার পালিত ভাই। কোন কথা বলেনি বটে সে তবে তার হাবভাবে ওই রকমই মনে হলো আমার।'

'ওরা তা হলে ওদের গরু-মহিষ নিয়ে ঢুকতে চাচ্ছে এই ক্যানিয়নে? কিন্তু যদি বেশি তুষার পড়ে এ বৎসর তবে তো ওই জীবগুলোর একটাও বাঁচবে না!'

'সেটা অবশ্য আমাদের স্বপক্ষেই কাজ করবে…ওদের আসলে এই এলাকা সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। আমি অল্প থেকে শুরু করেছিলাম, আমার বেশিরভাগ জন্তুর জন্মই এখানে, বাঁচার তাগিদে জন্তুগুলো এই এলাকার কোথায় ঘাস পাওয়া যাবে চিনতে শিখেছে।'

স্যান সিদ্রো থেকে জাভেদের র‍্যাঞ্চ আটাশ মাইল উত্তরে। এর চেয়ে কাছে অবশ্য দুটো ইন্ডিয়ান গ্রাম আছে–কিছু সাদা মানুষেরও বাস আছে ওসব গ্রামে। তবে এতে জাভেদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। এই কয় বৎসরে কিছু অতিথি আশ্রয় নিয়েছে কখনও কখনও তার র‍্যাঞ্চে–কিন্তু ওদের প্রায় সবাই কোথাও যাওয়ার পথে আশ্রয় নিয়েছিল। ওদের মধ্যে কাউকেই মিস পেজের চর বলে মনে হয় না জাভেদের। হাতের আঙুলে গোণা যায় ওদের, সবাই আইন ফাঁকি দিয়ে লোমা কয়োটির দিকে পালাচ্ছিল।

নীনা পেজ কি জানে এই এলাকাটা আসলে কী রকম? জানে এবড়োখেবড়ো পাহাড়, উঁচু মেসা, চোরা উপত্যকা আর পাহাড়ী মাঠের কথা? জন্তুগুলোকে জাভেদ বেশির ভাগ সময়েই ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে রাখে ওরা বেশি ঘাস পাবে বলে। এখন ওদের রাখা হয়েছে গাদা করা কাটা খড়ের কাছাকাছি। নিজের সুবিধা মত এখানে সেখানে অনেক বেড়া তৈরি করেছে জাভেদ। যেখানে সম্ভব প্রাকৃতিক সুবিধাও বুদ্ধি খরচ করে ব্যবহার করেছে সে ওই কাজে। প্রথম শীতটা তো জাভেদের প্রায় ঘোড়ার উপরই কেটেছে, কোথায় তুষার ঘাস ঢাকা পড়ে না, কোন্‌খানে বাতাসে ঠেলে তুষারের স্তূপ তৈরি করে না, এই সব খোঁজ নিয়ে বেড়িয়েছে ও। ওই নতুন আগন্তুকদের এই এলাকা সম্পর্কে অনেক কিছু শিখতে হবে এখানে টিকে থাকতে হলে।

পাহাড়ী হিমেল হাওয়ায় শীতে কাঁপছে জিকো। সন্ধ্যার পর থেকেই বেশ ঠাণ্ডা হয়ে আসে আজকাল। 'তোমার লোকের দরকার হলে বলো, আমি কিছু লোককে চিনি, ওদের বললেই ওরা আসবে,' বলল সে।

'শোনো জিকো, যদি শেষ পর্যন্ত এই বিরোধ গোলাগুলিতে গিয়ে ঠেকে তবে এর মধ্যে তোমার থাকার কোন দরকার নেই। এটা আমার নিজস্ব লড়াই, আমি…'

'থামবে তুমি? তোমার পক্ষে একা সবদিক সামলানো অসম্ভব। তুমি পারলেও আমি কোনদিন তোমাকে একা ফেলে যাব না এ তুমি ভাল করেই জানো।'

লণ্ঠন হাতে পথ দেখিয়ে কেবিনের দিকে যেতে যেতে সে আবার প্রশ্ন করল,

'ওরা কতটা জমি দাবি করছে?'

'চল্লিশ দাগ। ওদের ওগুলো সব খুঁজে বের করতেই চার-পাঁচ বৎসর লেগে যাবে।'

'তোমার জমি কতটা আছে এখানে? কোনদিন তুমি তা বলোনি আমাকে।'

'তুমি জিজ্ঞেস করোনি কোনদিন তাই আমিও বলিনি। আমার আছে আশি দাগ। আর এর সবটাই আমার লাগবে। আমি ভাবছিলাম সামনের বৎসর কিছু পশু বিক্রি করে কেবল কমবয়সীগুলোকে রাখব আমি। আমার ইচ্ছা, শেষ পর্যন্ত বাড়াতে বাড়াতে স্টকের সংখ্যা পাঁচ-ছয় হাজারে নিয়ে যাব।'

'অনেক ঘেসো জমির দরকার হবে তোমার। অত কোথায় পাবে?'

'একটা জায়গা খুঁজে বের করেছি, অনেক...প্রচুর ঘাস আছে ওখানে।'

কেবিনের ভিতর ঢুকে চমকে উঠল জাভেদ। পুরো কেবিনটাকেই মেজে ঘষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।

'কী হে, তুমি কি কাউকে দাওয়াত দিয়ে এসেছ নাকি?' ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করল জাভেদ।

'না, তা নয়। তবে বলা কী যায়? তুমি ব্যাচেলার মানুষ, শহরে গেছ, কাউকে নিয়েও তো ফিরতে পারো? এবার একটা বিয়ে করা উচিত তোমার।'

'আমি?' অবাক হলো জাভেদ। 'হঠাৎ তোমার এই দুর্বুদ্ধি মাথায় চাপল কী করে? আর এমন মেয়েই বা পাব কোথায় যে আমার মত একটা লোককে বিয়ে করতে রাজি হবে? তা ছাড়া র‍্যাঞ্চার মানুষ আমি, মাথায় শিং না থাকলে প্রাণ থেকে ভালবাসা আসে না আমার–শিংওয়ালা মেয়ে আমি কোথায় পাব?'

জাভেদ উঠে গিয়ে নিজেই খুঁজে পেতে একটা বোঝাই করা বেয়ার সাইনের প্লেট বের করে আনল।

'এখন ওগুলো খেয়ো না বলছি!' শাসন করল জিকো। 'ওগুলো এখন খেলে রাতের খাবার খেতে পারবে না, খিদে মরে যাবে।'

'মনে হচ্ছে তোমারই বিয়ে করা দরকার.' হাসতে হাসতে বলল সে। 'তুমি দিন দিন খিটখিটে হয়ে যাচ্ছ। বহুদিন আগেই বিয়ে করা উচিত ছিল তোমার।'

জাভেদকে অবাক করে দিয়ে জিকো বলল, 'বিয়ে আমি করেছিলাম একসময়ে। একটা শাইয়্যান মেয়েকে বন্দী করে রেখেছিল উতে ইন্ডিয়ানরা। ওকে ওখান থেকে চুরি করে উদ্ধার করে এনে বিয়ে করেছিলাম আমি। খুব সুন্দর আর ভাল ছিল মেয়েটা। উতেদের ভয়ে সব সময়ে তটস্থ থাকত। আমি ওর ভাষা বলতে পারি দেখে স্বভাবতই মেয়েটা আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। একদিন রাতে দুটো ঘোড়া আর মেয়েটাকে নিয়ে পালাই আমি। ওরা আমাদের ধাওয়া করে একশো মাইল মত চলার পরেও ধরতে না পেরে শেষে ফিরে যায়।'

'তারপরে কী হলো?'

'আমরা এখান থেকে আরও উত্তরে বাসা বেঁধেছিলাম দুজনে। একটা ছেলেও হয়েছিল আমাদের। কিন্তু ছেলেটা ঘোড়া থেকে পড়ে মারা যায়। সে-ও ওই উতাদেরই উপদ্রবে। পথের মধ্যে আমাদের হঠাৎ আক্রমণ করে ওরা। প্রথম গুলিতেই আমার স্ত্রী মারা যায়। ছেলেটাকে নিয়ে পালাবার সময়ে ছেলেটাও

মারা পড়ে।'

'ইশ্, বড় করুণ!'

'দুঃখ নেই আমার, যতদিন সে ছিল খুব সুখে দিন কেটেছে আমার। একটা মেয়েকেও আমরা পেলেছিলাম ওই সময়ে। চার-পাঁচ বৎসর সে ছিল আমাদের সাথে, পরে তাকে আমি মেক্সিকোতে একটা কনভেন্টে ভর্তি করে দিই। তেরো বৎসর বয়স ছিল তার তখন।'

'তোমার নিজের মেয়ে না সে?'

'না, তবে ওকে নিজের মেয়ের মতই ভালবাসি আমি। একটা ওয়্যাগন ট্রেন থেকে কোম্যাঞ্চিরা ওকে নিয়ে গেছিল ওর বাবা-মাকে হত্যা করে। আমি চারটে ঘোড়ার বিনিময়ে ওকে পাই। দুই বৎসর কনভেন্টে থাকার পরে সে একটা সম্ভ্রান্ত মেক্সিকান পরিবারের সাথেই বসবাস করছিল। ওরা যখন স্পেনে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্যে চলে গেল তখন সে রয়ে ˉয়। ওদের সাথে স্পেনে যেতে চায়নি সে।'

প্লেট ভর্তি করে খাবার নিয়ে টেবিলে বসল জাভেদ। কেবিনের উষ্ণতাটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করছে সে।

'তারপর? এখন কোথায় সে? আর দেখা হয়নি ওর সাথে তোমার?'

গলা খাঁকারি দিয়ে চুপ করে বসে রইল সে। জাভেদ ওর দিকে চেয়ে দেখল জিকোর মুখটা কেমন পাংশু দেখাচ্ছে। উদ্বিগ্ন স্বরে সে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে? শরীর খারাপ লাগছে তোমার?'

'না, ঠিক তা না,' মুখ কাঁচুমাচু করে বলল সে। 'মানে…এখানে আসছে জেনি।'

'কী!' আবেশ ছুটে গেল জাভেদের। ধড়মড় করে সিধে হয়ে বসল সে। 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এই ঝগড়া বিবাদের মাঝে একটা মেয়েকে এনে কোথায় রাখবে শুনি?'

'কিন্তু কোথায় আর যাবে বেচারী? আর আমি যখন ওকে আসতে লিখেছি তখন এসব ঝামেলা বাধেনি। তা ছাড়া ও লিখেছে দুনিয়ায় আমি ছাড়া আর ওর কেউ নেই।'

উত্তেজিত ভাবে উঠে পায়চারি আরম্ভ করল জাভেদ।

'এটা কি একটা মেয়ের থাকার উপযুক্ত জায়গা হলো? তা ছাড়া তোমার সাথে তো রক্তের সম্পর্কও নেই তার।'

'সেটা না থাকলেও গড়ে উঠেছে। আমাকে সব সময়েই নিয়মিত চিঠি দিত জেনি। সব সময়েই সে কেবল পাহাড়ে আমার কাছে ফিরে আসতে চাইত। ছোটকালে বাপ-মা হারিয়ে আমাকেই সে বাপের মত দেখে। তবে আমি কোনদিনই তার যোগ্য বাপ হতে পারিনি–বুক ভরা আদর জানাতে পারিনি। সে যখনই আমার কাছে আসতে চেয়েছে আমি এটা ওটা নানা অজুহাত দেখিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছি। ভেবেছি ওই মেক্সিকান পরিবারের সাথে থাকাটাই ওর জন্যে ভাল হবে–কিন্তু ওরা চলে যাবার পর এখন ওকে আমি কী বলে ঠেকাব?'

অস্থির বোধ করছে জাভেদ। জিকোকে দোষারোপ করে লাভ নেই, ওই বা

কী করবে? কিন্তু এইভাবে একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে একটা মেয়েকে নিয়ে এসে তাকে বিপন্ন করারও কোন মানে হয় না। তারা দুজনে দরকার হলে ঠাণ্ডায় তুষারের মধ্যে পাহাড়ে পালিয়ে বেড়াতে পারবে, কিন্তু একটা মেয়ে সাথে নিয়ে তো আর তা সম্ভব না? নিজেদেরই খেয়াল রাখবে, না মেয়েটাকে দেখবে?

'না হয় ওকে আমি সাথে করে সান্তে ফিতে রেখে আসব,' মনের ব্যথা চেপে বলল জিকো। 'কিন্তু আসলে সে আমার সাথেই থাকতে চেয়েছিল, বাপের ভালবাসা কোনদিন পায়নি তো?'

জিকোর দিকে চাইল জাভেদ। বারবার নানা বিপাকে পড়ে প্রিয়জনদের হারাতে হয়েছে ওকে। একজন যাওবা আছে তাকেও কাছে রাখার উপায় নেই তার। পরিস্থিতিটাকে হালকা করার জন্য হো হো করে হেসে উঠল জাভেদ।

'ভাল ফাঁসা ফেঁসেছি আমরা, কী বলো? লড়াই করতে জানি আমরা, হয়তো বিপদটা কাটিয়ে উঠতে পারব। কিন্তু মেয়ে? কী জানি আমরা ওদের?'

রাতের খাওয়া শেষ করে বাতি কমিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল সে বাইরে। র‍্যাঞ্চের সবকিছু ঠিক আছে কিনা ঘুমাতে যাওয়ার আগে সেটা নিজে একবার ঘুরে দেখাটা তার চিরকালের অভ্যাস। আজকের খবরটায় মনে হচ্ছে জিকোর যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। অর্থাৎ, এরপরে একাই থাকতে হবে তাকে। দুজন মিলে ওদের ঠেকানো কঠিন কাজ হত, এখন তো ব্যাপারটা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

একমুহূর্তের জন্যও মেয়েটাকে এখানে এনে রাখার কথা তার মনে স্থান পেল না। কনভেন্টে পড়া মেয়ে দূরে থাক, কোন ইন্ডিয়ান মেয়েকেও এখানে বর্তমান পরিস্থিতিতে রাখা ঠিক হবে না। এই কেবিনে বসে তাদের পক্ষে বেশিদিন ধরে ওদের ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। পালাবার একটা প্ল্যান তৈরি রাখতেই হবে–কেবিন থেকে পাহাড়ে সরে যেতে হবে প্রয়োজন হলে।

লড়াইয়ের প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে শত্রুর প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট করা। যতক্ষণ তাদের ইচ্ছেমত নড়াচড়া করার ক্ষমতা থাকছে ততক্ষণ যখন খুশি শত্রুকে আক্রমণ করতে পারবে···কিন্তু কোথাও আটকা বা বাঁধা পড়লেই ধ্বংস অনিবার্য।

লড়াইয়ে জাভেদের নীতিই হচ্ছে আক্রমণ, সব সময় আক্রমণের মুখে রাখতে হবে শত্রুকে। সংখ্যায় প্রতিপক্ষ যত ভারিই হোক না কেন নিজে একা থাকলেও আক্রমণ করতে হবে তাকে। খুব শক্তিশালী শত্রুকেও এই উপায়ে আত্মরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত করে রাখা যায়।

এই লক্ষ্য মাথায় রেখেই বিভিন্ন গুপ্ত জায়গায় খাবার আর গোলাবারুদের সমাবেশ আগে থেকেই করে রেখেছে জাভেদ। এমন ভাবে এগুলো সাজিয়েছে, যেন ধীরে ধীরে জঙ্গল থেকে আরও গভীরে তারপর সেখান থেকে পাহাড়ে সরে যেতে অসুবিধা না হয়। আগামীকাল তার জীব-জন্তুগুলোকে আরও দূরবর্তী উপত্যকায় সরিয়ে নিয়ে যাবে ও।

পরবর্তী দুই দিন ওরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করল জন্তুগুলোকে সরিয়ে নেওয়ার কাজে, আর রাতে অনেক রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকল নিজেদের প্ল্যান ঠিক করার কাজে। পরদিন এসে হাজির হলো বব।

'কাগজপত্র সবই আছে ওদের কাছে,' বলল সে। 'দলিলও আছে ওদের।

গভর্নর আর্মিজো লিখিত ভাবে ওদের এই অধিকার দিয়েছে।'

'কিন্তু আর্মিজোকে জমি বণ্টনের কোন ক্ষমতা দেয়া হয়নি। ওইসব কাগজের আসলে দুই পয়সাও দাম নেই।'

'সেকথা আমি কিছু জানি না, তবে তোমার এ জায়গা ছাড়তে হবে, জাভেদ।'

'কোন কোর্টের নির্দেশ আমি পাইনি, বব, আর আমার দলিলটাকেও কোন কোর্ট অচল বলে রায় দেয়নি। এই লোকগুলো একটা চাল খাটাবার চেষ্টা করছে। জমিটা আর্মিজোর অধীনে ছিল না, এমন কী রাষ্ট্রের অধীনেও এটা ছিল না তখন। সুতরাং আর্মিজোর সই করা দলিল শুধুমাত্র একটা সামান্য কাগজের টুকরোই, কোন দাম নেই তার। আমাকে ওঠানো ওদের সাধ্যের বাইরে।'

'আমাদের একটা আপোষ মীমাংসা করতেই হবে, জাভেদ, আমি চাই না এ নিয়ে একটা তুমুল গোলমাল বাধুক।'

'তা হলে মনে রেখো, দখল আমার। ইচ্ছা করলে ওরা কোর্টে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করতে পারে। সেটাই দাবি প্রতিষ্ঠিত করার আইনসম্মত ব্যবস্থা, লোক ভাড়া করে দখলদারকে হত্যা করাটা নয়।'

'তুমি জানো না ওটা ওদেরই কাজ কিনা।'

'তবে কে?' দরজার দিকে ফিরল জাভেদ, 'এসো বব, ভিতরে বসে আলাপ করা যাক। তুমি যা-ই বলো, আমি এই জায়গা না ছাড়লে ওদের কী করার আছে? জোর খাটাবে? বিশ্বাস করো, বব, ওদের কোন খুঁটিই নেই।'

তার ঘোড়ার উপরই গোঁ ধরে বসে রইল বব, নামল না। সে বিশ্বাসই করতে পারছে না যে নীনা পেজ আর অ্যালেকজান্ডার শার্পের মত মানুষ এমন কোন দাবি করবে যার কোন আইনগত সমর্থন নেই। সে নিশ্চিত যে জাভেদই অবুঝের মত কেবল নিজের স্বার্থ দেখছে। কোনদিন জমিজমার ব্যাপারে কোর্টে যেতে হয়নি তাকে। মাতাল আর বন্দুকবাজদের শাসনে রাখার মাধ্যমেই তার আইনের সাথে সামান্য যা একটু পরিচয়।

জাভেদ ওর দিকে ফিরে বলল, 'তুমি ওদের গিয়ে বলে দাও ওরা যেন ওদের দাবি কোর্টে পেশ করে, আমি এখান থেকে নড়ছি না।'

'খুব যে সবজান্তার মত জোর গলায় কথা বলছ?' রাগের স্বরে বলে উঠল বব। 'তুমি কে, তুমি কি উকিল নাকি?'

জাভেদ ঘোড়াটার কাছে ফিরে এল। 'শোনো, বব, ১৮২৫ থেকে ১৮২৮-এর মধ্যে তিনটে অস্থায়ী গভর্নর ছিল নিউ মেক্সিকোর, আর্মিজো তাদের মধ্যে একজন। ১৮৩৭ সালে টাওসে একটা বিদ্রোহ হয়, বিদ্রোহীরা গভর্নর পেরেজকে হত্যা করে। আর্মিজো একটা দল গঠন করে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে জয়ী হয়ে নিজেই নিজেকে গভর্নর বলে দাবি করে।

'অনেক দিন আগের কথা ওসব, অনেকে অনেক রকম কথা বলে, সত্যি যে কী ঘটেছিল তা বলা মুশকিল–কিন্তু শোনা যায় যে আর্মিজো বিদ্রোহী গভর্নরকে হত্যা তো করেই, নিজের দলের অনেক লোককেও নাকি সে ওই সময়ে হত্যা করে। ঘুষ দিয়ে মেক্সিকান কর্তৃপক্ষকে সে তার পদ বহাল রাখতে রাজি করায়।

'১৮৪৪ সালে লেজানা গভর্নর হয়ে আসে তার জায়গায়, কিন্তু পরের বৎসরই

সে আবার গভর্নর হয়ে আসে তার জায়গায়, কিন্তু পরের বৎসরই সে আবার গভর্নরের পদ ফিরে পায়। সান্তে ফির ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাদের প্রত্যেক ওয়াগন পিছু মোটা কর আদায় করে অনেক টাকা বানায় সে নিজের জন্যে।

'এ ছাড়া কিছু জমি-জমাও সে বন্ধু-বান্ধবের কাছে টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে–কিন্তু আসলে ওই জমি বিক্রি করার কোন অধিকার তাকে দেয়া হয়নি। আমার মনে হয় ওই ধরনেরই কোন দলিল নিয়ে এসে মিস নীনা পেজ এখানে অযথা ঝামেলা করছে।'

এতসব কথার মধ্যে ববের মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। মাতাল, উন্মত্ত জনতা, এসব নিয়েই ওর কাজ। একবার একজন বন্দুকবাজের সাথে গোলাগুলিতেও নামতে হয়েছিল তাকে। কিন্তু এসব আইনের প্যাঁচ তার কাছে দুর্বোধ্য। আইনের কাগজ সে একটাই চেনে, সেটা হচ্ছে ওয়ারেন্ট।

'হুঁ, এতসবও জানো তুমি?' বক্রোক্তি করল সে। 'তা তোমার এখানকার দাবির ভিত্তি কী–জবর দখল?'

ধৈর্য ধরে শান্ত ভাবেই মাথা নাড়ল জাভেদ, 'না, বব, আমার কাছে আইনসম্মত সব কাগজ-পত্রই আছে, পানির অধিকারও দেয়া হয়েছে আমাকে–আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এগুলো ভোগ করছি আমি এবং সব আমার দখলেই রয়েছে। যে কোন কোর্টেই আমার দলিল স্বীকৃত হবে। এই লোকগুলো চক্রান্ত করে আমার নিজের জমি থেকে আমাকে সরাতে চাইছে।'

'পরে আমাকে দোষ দিয়ো না,' রাগত স্বরে বলল বব। 'সামলাতে না পেরে শেষে আবার আমার কাছে ছুটে এসো না।'

'না, আমি তোমাকে দোষ দেব না। তবে তোমার উচিত হবে ওদের এই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলা। তুমি এই এলাকার ডেপুটি শেরিফ, ঝামেলা তোমাকেই পোহাতে হবে, কারণ আমি জানি, আইন ভঙ্গ করতেই এসেছে ওরা।'

জাভেদের কথা শুনে একটু থমথমে হয়ে গেল শেরিফের মুখ।

'আমার কাজ আর আমাকে শেখাতে হবে না তোমার! আমার কাজ আমি ভাল করেই জানি, আর কী করতে হবে আমার তাও জানা আছে।'

'তুমি দেখছি আমার ওপর আইন ফলাবার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছ,' কাষ্ঠ হাসি হাসল জাভেদ। 'অথচ আমিই হচ্ছি সেই গো-বেচারা, যে আইন মেনে চলার চেষ্টা করছে!'

'তোমার ব্যবহারে তো তা মনে হয় না!' রোষের সাথে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে চলল বব। একবারও পিছন ফিরে চাইল না সে। অন্ধকার হয়ে আসছে, ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে তার। র‍্যাঞ্চের দুই মাইল দূরে নীচের দিকে পাহাড়ের একটা অংশ উপত্যকার মাঝখান থেকে সোজা উপর দিকে উঠে গেছে। ওটার উপর থেকে চারদিকে মাইলের পর মাইল এলাকা পরিষ্কার দেখা যায়। ওখানেই জাভেদ তার ঘাঁটি করেছে সবদিকে নজর রাখার জন্য। দিনের বেলা ওখান থেকে অনেকদূর দেখা যায় আর রাতের বেলা কানে শোনা যায় বহুদূর থেকে বাতাসে ভেসে আসা শব্দ।

ঘোড়াটাকে কতগুলো অ্যাসপেন গাছের আড়ালে বেঁধে রেখে জাভেদ উপরে

উঠে বাতাস আড়াল করে ভাল একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসল।

কয়েকটা রাস্তা বা ট্রেইল এসে মিশেছে এখানে। একটা গেছে ন্যাসিমেনটসের দিকে। ওই রাস্তা ধরেই অন্যদিকে এগুলে পড়বে রিও পিউয়েরকো। কিন্তু এই পথটা বেশি পরিচিত নয়। কিছু ইন্ডিয়ান অভিজ্ঞ লোক হয়তো চেনে, তাও অনেক জায়গায় এটাকে ট্রেইল বলে চেনার উপায় নেই এখন। আর একটা এসেছে পুব দিক থেকে, স্প্রিঙস্ থেকে সিকেল্লা পর্যন্ত, তারপর এটা তার র‍্যাঞ্চের ধারেই ওই মেসার কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। কিন্তু এসব ট্রেইল নতুন কারও চেনার বা জানার সম্ভাবনা খুব কম।

মাঝরাতে নজর রাখার ভার জিকোর উপর ছেড়ে দিয়ে কেবিনে ফিরে বিশ্রাম নিয়ে আবার ভোরে কিছু মুখে গুঁজেই ঘোড়ায় চাপল সে। ওখানে পৌঁছলে জিকো তাকে বলল, 'আমার হিসাব অনুযায়ী আজই স্টেজে করে তার আসার কথা। কিন্তু আমি বলি কী, তুমি এখানে পাহারায় বসো, আমিই যাই ওকে আনতে। ওরা আমাকে চেনে না, কোন অসুবিধা হবে না আমার।'

'ওদের চেনো না তুমি। তোমাকে চিনে নিতে খুব দেরি হবে না ওদের। ওদিকে ঝুঁকি যা থাকে আমি নিচ্ছি, তুমি শুধু শক্ত হয়ে বসে খেয়াল রেখো যেন আমার অবর্তমানে কোন ঝামেলা না হয় এদিকে।'

'জাভেদ, তুমি যদি চাও আমি লোমা কয়োটি থেকে কিছু ভাল লোক নিয়ে আসতে পারি–কিংবা আমি স্মোক সিগনাল পাঠালেও ওখান থেকে কিছু ভাল যোদ্ধা এসে হাজির হবে।'

'ওসবের কোন দরকার নেই–তবে পরিচিত কাউকে পেলে জিজ্ঞেস করে রাখতে পারো এখন আশেপাশে কে কে আছে, হয়তো পরে কোন সময়ে ওদের দরকার হতে পারে।' ঘোড়া আগে বাড়াতে আরম্ভ করল জাভেদ।

'লুইস ডিকেনসন আছে আমি জানি,' ঘোড়ার পিছন পিছন হাঁটতে হাঁটতে বলল জিকো। 'লোকটা তোমার সময়েই বনরক্ষী ছিল। এলপেসোতে একজন লোককে মারার পর ফেরারী হয়েছে, কিন্তু রাইফেলে ওর জুড়ি নেই।'

'চিনি, খুব ভাল লোক।' ঘোড়া ছুটিয়ে দূরে চলে গেল জাভেদ।

স্যান সিদ্রোতে তখন হেমন্তের সূর্য জ্বলছে। দুপুর নাগাদ জাভেদ সেখানে পৌঁছল। শহরে প্রথম সে যাকে দেখল সে হচ্ছে স্যান্ডি উইলিয়াম–নীনার লোক। তারই ফুটখানেক দূরে ঘোড়া বাঁধল জাভেদ। হয়তো একটু ভয় পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু মোটেও ভয় পেল না সে। গোলমালপ্রিয় লোক স্যান্ডি। কিন্তু সার্কাসের ক্লাউনের মতই দর্শক ছাড়া কোন ভূমিকায় সে নারাজ।

তার সেই ময়লা বাকস্কিনের জামা কাপড় পরেই বসে আছে স্টিভ একটা টেবিলের পিছনে। পা দুটো টেবিলের উপর তুলে দিয়েছে। একটা মদের বোতল রয়েছে তার হাতে। জাভেদ আগেও লক্ষ করেছে স্টিভের হাতে সব সময়েই একটা বোতল দেখা যায় বটে, কিন্তু বোতলের ভিতরের জিনিসের পরিমাণ কমে না, সব সময়ে প্রায় একই থাকে।

কামরার ছাদটা বেশ নিচু। কাঁচা ঘর–বারোটা বাড়ির প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে একটা ঘর। মাত্র কয়েকটা টেবিল পাতা রয়েছে, আসবাবপত্র বিশেষ নেই

ঘরটাতে। সাজানোরও কোন চেষ্টা করা হয়নি, বারের পিছনে কেবল একটা অসংখ্য দাগে ভরা আয়না ঝুলছে। ফ্রেড একাধারে বারের মালিক, আবার স্টেজ-কোচের এজেন্ট বা দালাল। বয়সকালে কয়েকটা হঠাৎ গড়ে ওঠা খনির শহরে বার চালিয়েছে সে, কিন্তু এখন ববের মতই এই শহরে এসে আস্তানা গেড়েছে।

'স্টেজ কী দুপুর একটায় আসবে?' জিজ্ঞেস করল জাভেদ।

'সেই রকমই কথা আছে,' বলে একটা বোতল এগিয়ে দিল সে জাভেদের দিকে। লোকটা বেশ পছন্দ করে জাভেদকে। তবে ইদানীং বেশ পয়সা আসছে ওর নতুন লোকগুলোর কাছ থেকে, তাই ও যে এখন কাকে বেশি পছন্দ করবে বলা মুশকিল।

'এস, আমার সাথে এই টেবিলে বসো,' বলে টেবিলের উপর থেকে পা নামিয়ে নিল স্টিভ। স্যান্ডি ঢুকেছে, বারের দিকে এগিয়ে গেল সে।

নিজের বোতলটা নিয়ে স্টিভের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল জাভেদ। 'ভাবটা শান্তির ইঙ্গিত বলে মনে হচ্ছে না,' বসতে বসতে মন্তব্য করল সে।

দাঁত বার করে হাসল স্টিভ। 'ইঙ্গিত আমিও বুঝতে পারি,' জবাব দিল স্টিভ। ঠিক তখনই দরজা ঠেলে আরও দুজন লোক ঘরে ঢুকল। 'ওই বিশালদেহ লোকটার নাম লরেন্স হারভি। মারপিটে ওস্তাদ। সেদিন একজন পথিকের সাথে গায়ে পড়ে ঝগড়া করে ওকে খুব পিটিয়েছে। আর অন্যজন হচ্ছে বাড।'

ওদের জন্য ট্রেতে করে খাবার নিয়ে এল ফ্রেড। ঘুরে এদিকে তাকাল লরেন্স। 'নেহাত কম খায় না লোকটা,' বলল সে।

'একটা গাধার ডাক শুনলাম না?' প্রশ্ন করল জাভেদ।

লরেন্স চোখ পাকিয়ে চাইল ওর দিকে। ফ্রেড আর স্টিভ দুজনেই হেসে উঠল। পাশের টেবিলের লোক দুজনও হাসছে।

'কী বললে?' জোর গলায় জানতে চাইল লরেন্স।

ওর কথার কোন তোয়াক্কা না রেখে নীরবে খেয়ে চলল জাভেদ। লোকটা কটমট করে কিছুক্ষণ জাভেদের দিকে চেয়ে রইল একটা ছুতো পাওয়ার অপেক্ষায়। কিন্তু এদিক থেকে কোন রকম সাড়া না পেয়ে মিনিটখানেক পরে সে বলে উঠল, 'ভাবছি, লোকটা যত খায় সেই তুলনায় শক্তি সামর্থ্য আর সাহস আছে কি ওর?'

'কেউ একটু বাজিয়ে দেখলে মন্দ হত না,' মন্তব্য করল স্যান্ডি।

জাভেদ আপন মনে খেয়ে চলল। দারুণ উপভোগ করছে সে…ফ্রেডের স্ত্রীর রান্না খুব ভাল। 'গত দুইদিন বেয়ার সাইন ছাড়া আর কিচ্ছু খাওয়া হয়নি আমার, জিকো সেদিন অনেক বানিয়েছিল, সব শেষ করেছি আমি।'

'তোমার লোকজনের দরকার পড়লে শুধু এই খবরটা ছড়িয়ে দিয়ো। দেখবে এদিক ওদিক থেকে অনেক লোক জুটে যাবে,' নিজের গ্লাসে মদ ঢেলে নিল স্টিভ। 'আমি ষাট সত্তর মাইল দূর থেকেও বেয়ার সাইনের লোভে লোকজনকে ঘোড়ায় চড়ে হাজির হতে দেখেছি।'

আর এক গ্লাস মদ শেষ করে বারের দিকে পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়াল লরেন্স। একটা ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করছে সে অথচ কেউ ওকে পাত্তা দিচ্ছে না দেখে

ভিতরে ভিতরে আরও উত্তেজিত বোধ করছে ও। তা ছাড়া মদও তার কাজ শুরু করেছে, রক্ত গরম হয়ে উঠেছে ওর।

টেবিলে বসে খেতে খেতে সবকিছুই লক্ষ করেছে জাভেদ। মারপিটের প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে, কোন খুঁটিনাটিই নজর এড়ায়নি ওর। স্যান্ডি ধীরে ধীরে দরজার কাছে সরে গেছে যেন দরজা দিয়ে বেরুবার সুযোগ কেউ না পায়। বাড্ চলে এসেছে পিছন দিকে। লরেন্স মাঝখানে দাঁড়িয়ে, লম্বা-চওড়া শক্তিশালী লোক, বোঝাই যায়। মাথাটা পেশীবহুল কাঁধের উপর বসানো, ঘাড় এত ছোট যে নেই বললেই চলে। মোটাসোটা হাত দুটো বেরিয়ে আছে গুটানো হাতার ভিতর থেকে। একমুখ ঘন দাড়ি ওর শক্ত চোয়াল দুটো ঢেকে রেখেছে।

নিচু গলায় স্টিভকে বলল জাভেদ, 'এর মধ্যে তুমি নিজেকে জড়াতে যেয়ো না। এটা আমার ব্যক্তিগত লড়াই।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জাভেদের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করল সে। 'কিন্তু তিনজনের বিরুদ্ধে একজন, অনুপাতটা ঠিক সমান হলো না,' বলল সে। 'তা ছাড়া ওই লরেন্স লোকটা দুহাত সমানে চালাতে চালাতে এগিয়ে আসে, ওকে রোখা খুব কঠিন।'

লরেন্স তৈরি হচ্ছে মারপিট করার জন্য। জাভেদ বুঝতে পারছে কী ঘটতে চলেছে। মাথা নিচু করে নিজের কাপের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছে জাভেদ। মাথার মধ্যে অঙ্ক কষে চলেছে কে কোথায় আছে আর কীভাবে কী করলে পরিস্থিতি তার স্বপক্ষে আসতে পারে–ঠিক এই সময়ে নীনা পেজ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে সোজা তার টেবিলের দিকেই এগিয়ে এল। ভদ্রতা করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জাভেদ।

'আরে! অবাক কাণ্ড!' বিদ্রূপ করে বলে উঠল লরেন্স, 'লোকটা হঠাৎ ভদ্র হবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে!'

'শুনলাম তুমি শহরে এসেছ তাই তুমি র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চলে যাবার আগেই তাড়াতাড়ি দেখা করতে এলাম।' নীনার চোখ দুটো প্রথম দেখায় যেমন লেগেছিল তার চেয়ে আরও বেশি ঘন সবুজ দেখাচ্ছে আজ। 'সত্যি আমি খুব দুঃখিত যে র‍্যাঞ্চটা ছেড়ে এভাবে চলে যেতে হচ্ছে তোমার। চলে যাবার আগে বলতে এসেছি যে এখনও তোমাকে আমার আগের প্রস্তাব অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি আছি আমি।'

'ভুল বুঝেছ তুমি, মিস পেজ। আবারও কেউ ভুল খবর দিয়েছে তোমাকে। আমি র‍্যাঞ্চ ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না।'

'প্লীজ, কথা শোনো!' হাত বাড়িয়ে হাতের আঙুল জাভেদের জ্যাকেটের হাতায় ছোঁয়াল নীনা। তার চোখ দুটো আরও সুন্দর আর বড় দেখাচ্ছে। 'জমিটার মালিকানা আমাদের, তোমার যে যেতেই হবে। তুমি নিজের ইচ্ছায় না গেলে আমার লোকজন জোর খাটিয়ে তুলতে চাইবে তোমাকে···কিন্তু সে আমি চাই না। ভাবলাম···তুমি যখন শহরে এসেছ তোমার সাথে কথাবার্তা বলে একটা আপোষ মীমাংসায় পৌঁছতে পারব আমরা।'

'বোসো তা হলে?'

একটু ইতস্তত করে একটা চেয়ার টেনে বসল নীনা। জাভেদও বসতে

যাচ্ছিল এমন সময়ে সে শুনল স্যান্ডি জোরে জোরেই সবাইকে শুনিয়ে বলছে, 'দেখো, একটু পরেই হয়তো চায়ের অর্ডার দিয়ে বসবে লোকটা।'

ফ্রেডের দিকে ফিরল জাভেদ। 'চা পাওয়া যাবে এখন?' প্রশ্ন করল সে

'চা? চা!...হ্যাঁ,...অবশ্যই, কিন্তু...'

'চা তৈরি করে আমাদের দিয়ে যাও। বেশি করে বানিয়ো যেন সবার হয়...গ্যালনখানেক চা বানাও।'

'এক গ্যালন? চা?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

চেয়ারে আয়েশ করে হেলান দিয়ে বসে কৌতুকের সাথে জাভেদের কাণ্ডকারখানা দেখছে স্টিভ। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নীনার দিকে ফিরে জাভেদ বলল, 'হ্যাঁ, কী যেন বলছিলে তুমি...?'

'বলছিলাম তোমার র‍্যাঞ্চটা ছেড়ে দেয়ার কথা। অবশ্যই তোমার কষ্ট করে র‍্যাঞ্চটার উন্নতি করার জন্যে যোগ্য ক্ষতিপূরণ আমি দেব। তোমাকে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হচ্ছে বলে আমি সত্যিই খুব দুঃখিত।'

'কোন চিন্তা কোরো না তুমি। তোমাকে এত দুঃখ দিয়ে র‍্যাঞ্চ ছেড়ে কক্ষনো যাব না আমি। মিছেই এতদূর কষ্ট করে এসে জানতে হলো তোমার কথাটা–কোন কোর্টে একটু খোঁজ নিলেই তুমি জানতে পারতে তোমাদের দাবি কতখানি ভিত্তিহীন।'

'তুমি তো জানো কোর্টগুলো কত দূরে দূরে, আর তা ছাড়া ওরা সময়ও নেয় প্রচুর। অত সময় আমাদের হাতে নেই, অ্যালেক...মানে অ্যালেকজান্ডার শার্প অস্থির মানুষ। আর আমার প্রায় তিন হাজার গরু-মহিষ আসছে, তুমি এখন যেতে না চাইলেও আমাদের বাধ্য হয়ে তোমাকে জোর করেই সরাতে হবে।'

'তুমি কি ওই জমি সম্পর্কে কিছু জানো, সুন্দরী?'

'আমি নিজে ওটা দেখিনি বটে, তবে অ্যালেক দেখেছে। কিন্তু একথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'কারণ নিজে দেখলে তুমি হয়তো বুঝতে পারতে যে আমি যদি তোমাদের এখন ওই র‍্যাঞ্চটা আপোষে ছেড়েও দিই তবু তোমরা কোনমতেই তিন হাজার পশু নিয়ে ওখানে একটা শীতও কাটাতে পারবে না। কেউ কোন উৎপাত না করলেও তোমাদের পক্ষে তা অসম্ভব হবে। এত জায়গাও নেই আর এত খাবারও নেই ওখানে। এবারের শীতটা যদি বেশি না পড়ে তবে হয়তো বড়জোর হাজারখানেক পশু বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হতে পারে।'

বড় বড় চোখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল নীনা জাভেদের দিকে। ওর খোলাখুলি আন্তরিকতায় বিস্মিত হয়েছে নীনা। কিন্তু ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সে ওর কথা। 'কিন্তু আমি যে শুনেছি পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল ঘাস আর পানি আছে ওখানে।'

'চমৎকার ঘাস আর পানি দুটোই ওখানে আছে ঠিকই. কিন্তু কোনটাই পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। আমার গরু-মহিষের জন্যে আমি তাই সব সময়েই অন্যান্য উপত্যকায় ভাল জায়গা খুঁজে বের করে সেখানে কিছু কিছু পশু রেখে আসার

ব্যবস্থা করি। কিন্তু এর অর্ধেকেরও বেশি জায়গা বন-জঙ্গলে ছাওয়া আর অত্যন্ত দুর্গম হয়তো তোমাদের বিমুখ করার সবচেয়ে ভাল উপায় হবে নিজে সরে গিয়ে তোমাদের এখানে র‍্যাঞ্চ চালানোর সুযোগ করে দেয়া। তোমরা গরু-মহিষ, ঘোড়া আর মানুষ সবই হারাবে একে একে।'

'তোমাকে দেখে তো তোমার কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। তুমি বেশ ভালই করছ দেখা যায়।'

মাথা নেড়ে সে নীনার লোকজনের প্রতি ইঙ্গিত করল। সে ভাল করেই জানে সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে ওর কথা। 'সবচেয়ে বড় কথা এতসব লোকজন নিয়ে তুমি কী করবে?' নীনার লোকজনের মনের মধ্যে একটা সন্দেহ ঢুকিয়ে দেওয়ার সুযোগটা হেলায় হারাল না সে। 'ওখানে মাত্র দুই কি বড়জোর তিন জন লোকের কাজ আছে ওই কয়েক একর জমিতে।'

'একর?' প্রতিবাদ করল নীনা। 'একর কী বলছ, ওখানে মাইলকে মাইল জমি আছে আমার। সঠিক হিসেবে চল্লিশ দাগ বা চল্লিশ বর্গমাইল।'

ফ্রেড চা নিয়ে উপস্থিত হলো। 'দুটো কেতলি ব্যবহার করতে হয়েছে আমাকে,' ব্যাখ্যা দিল সে। 'এত বড় অর্ডার আগে কোনদিন পাইনি।'

জাভেদ ছোট কেতলিটা থেকে নিজেদের টেবিলের জন্য তিন কাপ চা ঢেলে দিয়ে ঝট করে সে তার পিস্তলটা কোমর থেকে হাতে তুলে নিল। 'বাকি চা ওদের জন্যে ঢেলে ওদের পরিবেশন করো।' পিস্তল তুলে বারের কাছে দাঁড়ানো তিনজনকে দেখিয়ে ফ্রেডকে আদেশ করল জাভেদ। 'ওরা খায় কি না খায় সেটা আমি দেখছি।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল স্যান্ডি। তার হাতটা নিজের পিস্তল বের করার জন্য বাড়িয়েও জাভেদের পিস্তলের মুখটা তার দিকে ঘুরতে দেখে থেমে গেল সে। 'নাও! চুমুক দেয়া আরম্ভ করো! তুমিও, লরেন্স!'

'দায় পড়েছে আমার!' তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল লরেন্স।

জাভেদের পিস্তলটা একটু কাত হলো। 'টি-পার্টি চেয়েছিলে তোমরা, তাই-ই দেয়া হয়েছে। এবার লক্ষ্মী ছেলের মত চা খেতে আরম্ভ করো নইলে গুলি শুরু করব আমি।'

দাঁত বের করে হাসছে স্টিভ। আতঙ্কিত অবস্থায় নীনা বারবার তার লোকজন আর জাভেদের মুখের দিকে চাইছে। আশ্চর্য হয়ে গেছে সে, যা দেখছে তার কিছুই বিশ্বাস করতে পারছে না ও।

'আমি তিন গোণার আগে যদি তোমরা চা খেতে শুরু না করো,' শান্ত কণ্ঠে ঘোষণা করল সে। 'তবে একে একে তোমাদের প্রত্যেকের হাত গুঁড়িয়ে দেব আমি।'

উঠে দাঁড়িয়ে সাবলীল ভঙ্গিতে ওদের দিকে এগিয়ে গেল সে। দরজাটা আর নীনাকে গোচরের মধ্যে রেখেছে জাভেদ।

'এর জন্যে তোমাকে খুন করব আমি!' চেঁচিয়ে হুমকি দিল লরেন্স।

'হয়তো–কিন্তু তার আগে এখনই যদি নিজে মারা পড়ো তবে আর সে সুযোগ পাবে না। চা চেয়েছিলে, চা খাও।'

ঠাস করে শব্দ করে তার কাপ নামিয়ে রেখে স্যান্ডি চিৎকার করে উঠল, 'খাব না আমি চা! পেয়েছটা কী তুমি?' পিস্তল বের করার জন্য হাত বাড়াল সে।

বিদ্যুৎ বেগে ডাইনে আর বামে থেকে পরপর জাভেদের পিস্তলের দুটো বাড়ি পড়ল ওর মুখে। বিনা প্রতিবাদে ঝপ্ করে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল স্যান্ডি। 'ভাল চাও তো চায়ে চুমুক দাও, নইলে তোমাদেরও একই অবস্থা হবে,' ধীর কণ্ঠে বলল জাভেদ।

রাগে একেবারে কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে নীনার মুখ। 'শোনো জাভেদ, যা খুশি তাই করতে পারো না তুমি!'

'মেয়েদের ওপর হাত তুলতে ঘৃণা করি আমি,' জবাব দিল সে।

ধপ করে আবার বসে পড়ল নীনা। 'তুমি…তোমার অত সাহস নিশ্চয়ই হবে না!'

'পুরুষের সাথে বাজি লড়তে গেলে তাদের নিয়মেই লড়তে হবে তোমার।'

পিস্তলটা স্টিভের দিকে বাড়িয়ে দিল জাভেদ। 'তুমি ওদের দিকে একটু নজর রেখো, লরেন্স আমার সামর্থ্য আর সাহস সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল–পরীক্ষাটা হয়েই যাক। মনে হয় আমার সাথে একটু মারপিটের শখ হয়েছে ওর।'

কাপ নামিয়ে রেখে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল লরেন্স। 'মারামারি?' আকাশ থেকে পড়ল সে, 'মারামারি করবে আমার সাথে?'

ঘুসি চালাল জাভেদ।

টলতে টলতে পিছিয়ে গেল লরেন্স। জাভেদ এগিয়ে গিয়ে ওর হাত দুটোর উপর নজর রেখে বাম হাতে ভীষণ জোরে মারল ওর পেটে। লরেন্স মারপিট করতে পছন্দ করে, কিন্তু তারচেয়েও বেশি পছন্দ করে নিজের মারামারির বড়াই করতে। জাভেদ তার সাথে লড়তে চায় শুনেই অবাক হয়ে সে মাত্র বলতে যাচ্ছিল। মারের চোটে কী দুরবস্থা করবে সে জাভেদের–কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই দু'দুটো প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল সে। আরও পিছনে সরে গেল লরেন্স, ওকে সুস্থির হবার কোন সুযোগ দিল না জাভেদ। মুখের উপর পরপর আরও দুটো ঘুসি খেয়ে কেঁপে উঠল ওর দেহ। বেদিশা হয়ে মাথা নিচু করে ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ষাঁড়ের মত ছুটে এল সে।

ওর এলোপাতাড়ি ঘুসির একটা লাগল জাভেদের গায়ে, কিন্তু পরক্ষণেই সরে গিয়ে ডান হাতটা নামিয়ে আনল সে প্রচণ্ড বেগে লরেন্সের কিডনীর উপর। হাঁ করে শ্বাস নিয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করল সে জাভেদকে। চোয়ালের উপর একটা ঘোড়ার লাথির মত ঘুসি খেয়ে মাঝ পথেই থমকে থেমে দাঁড়াল ওর দেহ।

তার উদ্যত হাত দুটোর ফাঁক দিয়ে চাইল সে জাভেদের দিকে। বুঝে নিয়েছে, এই লড়াইয়ের গতি প্রকৃতি তার অন্যান্য মারামারির মত হচ্ছে না। ডান হাতের ঘুসিটা তার মাথা ঘোলা করে দিয়েছে অথচ জাভেদ লোকটা একটু হাঁপাচ্ছেও না, দিব্যি সরে সরে গিয়ে একটার পর একটা ঘুসি মেরেই চলেছে। এই প্রথমবারের মত হারতে যাচ্ছে সে বুঝতে পেরেই রাগে অন্ধ হয়ে আবার তেড়ে এল–সবার সামনে হেরে যাবার অপমান সহ্য করতে পারবে না সে কিছুতেই। সমানে দু'হাত চলছে তার। দুজনেই প্রচণ্ড বেগে ঘুসি ছুঁড়ছে। পিছাতে

পিছাতে দেয়ালের কাছে এসে গেছে জাভেদ। বারবার উৎফুল্ল চিৎকার করে উঠছে বাড়্। লরেন্স এখন নিশ্চিত যে জাভেদকে কাবু করে এনেছে সে। তার ডান হাতের একটা ঘুসি প্রচণ্ডভাবে আঘাত করল জাভেদের পাঁজরে। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে জাভেদকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার সময় ও সুযোগ দেওয়ার জন্য একটু ঢিল দিল লরেন্স।

ঠিক সেই মুহূর্তেই জাভেদের ডান হাতের ঘুসিটা পড়ল ওর মুখে। ঠোঁট দুভাগ হয়ে কেটে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল ওর শার্টে। জাভেদ এখনও তার সামনেই দুপায়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না সে। তার প্রচণ্ড ঘুসিটা হজম তো করেছেই, উল্টো আঘাত হেনেছে সে!

আবার আক্রমণ করতে তেড়ে গেল লরেন্স। আগের মনের জোর আর তার নেই। এই লড়াইয়ে জিত হবে না, বুঝে নিয়েছে সে। এর আগে তার ডান হাতের প্রচণ্ড ঘুসি খেয়েও কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেনি সে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে ওই ঘুসিতে কিছুই হয়নি তার। পশ্চিমে আসার আগে ছোটকালে মিসিগানের কাঠুরেদের সাথে বড় হয়েছে জাভেদ। ওখান থেকেই ঘুসাঘুসিতে মাস্টারস ডিগ্রী নিয়ে এসেছে সে। বক্সিং-এর কায়দা কানুন পশ্চিমের লোকেরা জানে না, ওদের বেশির ভাগ বিবাদেরই মীমাংসা হয় পিস্তল দিয়ে। এর আগের সব মারপিটে লরেন্সের জেতার কারণ হচ্ছে সে ছিল 'বেনো বনে শিয়াল রাজা'। ছোটকাল থেকে যুবক বয়স পর্যন্ত প্রচুর মারপিট করেছে জাভেদ। সবই যে জিতেছে এমন নয়, তবে বেশির ভাগ সময়েই তার জিত হয়েছে। জাভেদ যাদের সাথে মারামারিতে জিতেছে তাদের মত কলা-কৌশল জানা নেই লরেন্সের।

তেড়ে আসতে দেখে হঠাৎ পিছনে সরে গেল জাভেদ। টাল সামলাতে না পেরে সামনে ঝুঁকতেই ওর কলার ধরে টেনে হিপ-থ্রো করে ওকে পটকে মাটিতে ফেলল জাভেদ। চিৎপাত হয়ে পড়ে ফ্যালফ্যাল করে বোকার মত চেয়ে রইল সে।

একটু ধাতস্থ হয়ে ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল লরেন্স। ওকে সরে জায়গা করে দিল জাভেদ। উঠে দাঁড়াবার পরে এগিয়ে গেল আবার, ডান হাতে মুখে ঘুসি মারার ভঙ্গি করে বাম হাতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা ঘুসি বসাল বিশাল লোকটার পেটে। পেট ভরা চা নিয়ে খাবি খেতে খেতে পিছিয়ে গেল লরেন্স–মাথা ঘুরছে তার, বমি বমি লাগছে–হাত তুলে অসহায় ভাবে থামতে ইঙ্গিত করল সে জাভেদকে। মার খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে ভাল মত পরাজিত হয়েছে স্বীকার করে নিয়েছে সে।

স্টিভের কাছ থেকে পিস্তলটা নিয়ে শান্তভাবে খাপে ভরল জাভেদ। স্যান্ডি এতক্ষণে উঠে বসেছে মাটিতে, দুহাতে নিজের মাথা চেপে ধরে আছে সে।

'গোলমাল আর মারপিট করতে চাই না আমি, তবে কেউ করতে চাইলে পিছিয়ে যাবারও অভ্যাস নেই আমার,' বলল জাভেদ।

নীনার দিকে ফিরল সে। ওর মুখটা সাদা হয়ে গেছে একেবারে–কিন্তু চোখের ভাব রাগে কঠিন দেখাচ্ছে।

'আমার মনে হয় না তুমি ঠিক বুঝতে পারছ ভাচে ক্রীকের আসল চেহারা কী। তুমি একজনকে সাথে নিয়ে এসে নিজের চোখেই দেখে যেতে পারো যদি

চাও–স্যান্ডি র‍্যাঞ্চের কাজ বোঝে, ওকে সাথে আনলে সে-ই তোমাকে সব বুঝিয়ে দিতে পারবে ভাল করে। বেশির ভাগ এলাকাই সাত হাজার পাঁচশো ফুটেরও বেশি উঁচুতে। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পাহাড়ী এলাকা ওটা–কিন্তু সেই সাথে সবচেয়ে কঠিন আর ঠাণ্ডা। তুষারও পড়ে খুব বেশি।'

ফ্রেড জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ঘোষণা করল, 'স্টেজ কোচ আসছে।'

টুপিটা মাথায় পরে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল জাভেদ। তার মুঠির গাঁটগুলো কয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে, জ্বালা করছে, কিন্তু সেইসাথে একটা অদ্ভুত তৃপ্তি বোধ করছে সে। অনেককাল পরে আবার মারপিট করল আজ। এবং জিতল।

পিছনে দরজার শব্দে ঘুরে তাকিয়ে দেখল নীনা পেজ তারই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। ঠাণ্ডা কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে সে–কিছুটা যেন শ্রদ্ধাও মিশ্রিত আছে তার দৃষ্টিতে। 'তুমি কি সত্যিই আমার গায়ে হাত তুলতে?' প্রশ্ন করল সে।

আজ পর্যন্ত কোন মেয়ের গায়ে হাত তোলেনি জাভেদ। কিন্তু সে এমন দৃষ্টিতে চাইল, যেন খুব অবাক হয়েছে প্রশ্নটা শুনে। 'নিশ্চয়ই, যা বলি তাই করি আমি।'

'তুমি মোটেও ভদ্দর লোক নও জাভেদ!'

ওর দিকে চেয়ে হাসল সে। 'ভাল ভাবে তোমার সাথে কোন চুক্তিতে আসতে পারবে না কোন ভদ্রলোক। কান্নাকাটি করে, তোয়াজ করে কিংবা আদর করে, মিথ্যে কথা বলে ঠকাবে তুমি তাকে। আমার সাথে কিন্তু ওসব চলবে না, লাগতে আসলে চোট পাবে নিজেই।'

চোখে চোখে চেয়ে রইল নীনা। 'আমরা দুজন বিপক্ষ দলের বটে, কিন্তু তুমি একজন সত্যিকার পুরুষ–তোমাকে ভালই লাগে আমার। আমাকে তুমি নীনা বলে ডাকতে পারো।'

'অত্যন্ত সুন্দরী আর আকর্ষণীয় মেয়ে তুমি। কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করে তোমার সাথে সামান্য রাস্তা পার হতেও ভয় করবে আমার। আমার পরামর্শ শোনো, ফিরে যাও। আমার সাথে টক্কর দিতে এলে সর্বস্ব খোয়াবে তুমি।'

'তোমাকে সাহায্য করার মোটে একটা লোক আছে তোমার, আর আমার আছে তিরিশজন। শেষ পর্যন্ত আমি যে জিতব তাতে কোন সন্দেহ নেই, জাভেদ।'

গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকাল জাভেদ। 'কথাটা সত্যি, কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় মিত্র আবহাওয়া আমার সহায় থাকবে। পুরো এলাকাটা যখন তিন থেকে ছয়ফুট তুষারে ঢাকা পড়ে যাবে তখন তোমার গরু-মহিষ নিয়ে কোন্‌দিকে যাবে তুমি?'

স্টেজ-কোচটা একরাশ ধুলো উড়িয়ে বারের দরজার সামনে এসে থামল। গাড়ির ছাদ থেকে আড়ষ্টভাবে নেমে দাঁড়াল ড্রাইভার। ঠাণ্ডা বাতাসে চেহারা একেবারে লাল হয়ে গেছে ওর। যাত্রীদের নামার জন্য স্টেজের দরজা খুলে দিল ফ্রেড। গাড়ির ছাদের উপর দিয়ে দূরের পাহাড়টার দিকে চেয়ে ছিল জাভেদ, মেয়েটা নামতেই ওর দিকে চোখ পড়ল–বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠল তার। যা-ই আশা করে থাকুক, এমনটি আশা করেনি সে।

চওড়া ধারওয়ালা সুন্দর বনেটের নীচে আরও সুন্দর একটা মুখ। নীল নিষ্পাপ চোখজোড়াতে শিশুর সরলতা, কিন্তু পোশাক ওর যৌবনকে ঢেকে রাখতে পারেনি। মন্ত্রমুগ্ধের মত দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে জাভেদ। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল মেয়েটা। সবাই হাঁ করে চেয়ে আছে মেয়েটার দিকে।

ফ্রেডের দিকে ফিরে সে বলল, 'আমি "জে" র‍্যাঞ্চের জিকো বা জাভেদ সাহেবকে খুঁজছি।'

ফিরে মেয়েটার দিকে চেয়ে কী যেন বলতে গিয়ে কথা হারিয়ে গেল তার। এই অঞ্চলে এত সুন্দরী মেয়ে কোনদিন দেখেনি সে। বোবার মত কেবল হাত তুলে জাভেদকে দেখিয়ে দিল ফ্রেড।

জাভেদের দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে তাকে খুঁটিয়ে দেখল মেয়েটা, তারপর বলল, 'বাবা যখন নও তখন তুমি নিশ্চয়ই জাভেদ সাহেব।'

কথাটা বলেই তার চোখ পাশেই দাঁড়ানো নীনা পেজের উপর পড়ল। 'ইনি কি তোমার স্ত্রী?' প্রশ্ন করল সে।

'না, না,' হেসে উঠল জাভেদ। 'এই মেয়েটা আমার শত্রু, মিস নীনা পেজ।'

কিছুক্ষণ নীনার দিকে চেয়ে থেকে মুখে চিন্তাযুক্ত একটা ভাব নিয়ে সে বলল, 'আমার মনে হয় মেয়েটা আমারও শত্রু, ও খুব পছন্দ করে তোমাকে!'

তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘুরিয়ে সে বলল, 'জেনি, তুমি ঘোড়ায় চড়তে পারো তো?...জেনিই তো তোমার নাম–তাই না?'

'পিঠে লোম আছে এমন সব প্রাণীর ওপরই চড়ে অভ্যাস আছে আমার–তবে সেজন্যে জামা পালটে নিতে হবে আমার।' জবাব দিয়েই জেনি আর একবার নীনার দিকে চোরা চাহনিতে চেয়ে নিয়ে নিচু স্বরে প্রশ্ন করল, 'তুমি পছন্দ করো ওকে?'

একটু লাল হলো নীনা। লম্বা গাউনটা সামান্য তুলে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে তার এক্কাগাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাড় গাড়িতে ওঠায় সাহায্য করল তাকে। একবারও পিছন ফিরে না চেয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল ওরা।

গাড়িতে বসে রাগে ফুঁসছে নীনা। সেদিনকার পুঁচকে ছুঁড়ী–কতই বা বয়স হবে ওর, তার উপর সব দিক থেকে টেক্কা দিয়ে গেল আজ? স্টেজ স্টেশনের সব কয়টা লোক বেহায়ার মত হাঁ করে ওই মেয়েটার দিকে চেয়ে ছিল। তার দিকে নজরই পড়ল না কারও?

ফ্রেডের বাসা থেকে কাপড় বদলে ফিরে এল জেনি। আঁটসাঁট রাইডিং সুট পরেছে সে। তার সুঠাম দেহের যেটুকু লুকানো ছিল ড্রেসের অন্তরালে তাও এখন ফুটে উঠেছে রাইডিং সুটে। নতুন করে অবাক হলো আবার জাভেদ–মেয়েটাকে সব কিছুতেই মানায়, ভাবল সে।

জেনিকে ঘোড়ায় চড়তে সাহায্য করল জাভেদ। কিন্তু বুঝল আসলে সাহায্যের কোন দরকারই ছিল না তার। মেয়েটি যেমনই হোক ঘোড়ার পিঠে খুব সাবলীল ভঙ্গিতে বসেছে সে।

'তোমার কিন্তু র‍্যাঞ্চে থাকা হবে না,' আগে থেকেই ওকে সাবধান করে দিল

জাভেদ। 'তোমার জন্যে নিরাপদ হবে না জায়গাটা।'

'ভয় পাচ্ছি না আমি, তোমার ওপর বিশ্বাস আছে আমার,' মিটিমিটি হাসির সাথে জবাব দিল জেনি।

তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা দিতে ব্যস্ত হলো জাভেদ, 'না, আমি সেকথা বলছি না। র‍্যাঞ্চের অধিকার নিয়ে ওই মিস নীনা পেজের সাথে আমাদের একটা লড়াই হবে। হয়তো গোলাগুলি হতে পারে।'

'লড়াই কি শুরু হয়ে গেছে? আঙুলের গাঁটগুলো দেখে তো তাই মনে হয়।' জাভেদের দিকে গম্ভীর ভাবে চাইল জেনি, 'আমি কিন্তু মেয়ে হলেও শক্ত আছি, সব কাজ করতে পারি, এমন কী বন্দুকও চালাতে জানি। সত্যিই অনেক জোর আছে আমার।' ডান হাত ভাঁজ করে পেশী শক্ত করার ভঙ্গি করল সে, বলল, 'বিশ্বাস না হয় ধরেই দেখো?'

তিন

শহর থেকে জেনিকে নিয়ে ফেরত আসার তৃতীয় দিনে দেখা দিল বিপদ। প্রথমে ক্যানিয়নে দেখা গেল অসংখ্য গরু-মহিষ। বোঝা যাচ্ছে আগেই আনা হয়েছে ওগুলো, রাতের বেলা আড়ালে ক্যাম্প করে ছিল ওরা।

জাভেদ পাহাড়ের ভিতর লুকানো একটা আস্তানায় খাবার জড়ো করার সময়ে লক্ষ করল ঘটনা। অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে আসছে জন্তুগুলো। জিকোর চিৎকার শুনতে পেল সে।

চিৎকারের সাথে সাথে একটা গুলির শব্দ হলো। হাতের কাজ ফেলে ছুটে এল জাভেদ। হুড়মুড় করে উঠানে ঢুকে আসছে জন্তুগুলো। প্রথমটাকে গুলি করে মারল সে, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারল এভাবে ঠেকানো যাবে না ওদের–কয়টাকে গুলি করে মারবে? স্রোতের মত এগিয়ে আসছে অগুনতি গরু-মহিষের পাল। জিকোর পিছন পিছন সে-ও চট করে কেবিনে ঢুকে পড়ে দরজার খিল আটকে দিল। জানালার কাছে পৌঁছে দেখল গরুতে বোঝাই হয়ে গেছে তার উঠান।

জানালার উপর উইনচেস্টারের নলটা রেখে দরজার ওপাশে অন্য জানালাটার ধারে দাঁড়ানো জাভেদের দিকে ফিরে চাইল জিকো। 'বুদ্ধিটা ভাল,' বলল সে। 'আমাদের আর বের হবার কোন পথ রাখেনি ওরা।'

বিরাট দেহ নিয়ে একটা গরু দরজা চেপে দাঁড়িয়ে আছে। উঠানে আর তিল ধারণের জায়গা নেই, জন্তুগুলো ঠাসাঠাসি করে কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে। আঙিনার গরুগুলোকে কর্মচারীরা দড়ির সাহায্যে একেবারে জাম করে আটকে রেখেছে গোল করে কেবিন ঘিরে। দূরে ডাইনে বাঁয়ে জন্তুগুলো ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে ছাড়া অবস্থায়। লোকজন কাউকেই কেবিন থেকে দেখা যাচ্ছে না।

অল্পক্ষণ পরেই ম্যাটের গলা শোনা গেল, 'এই যে শুনছ?' চিৎকার করে বলল সে, 'ওখান থেকে যদি বেরুতে চাও তবে জানালা দিয়ে তোমাদের সব অস্ত্র

ফেলে দাও!'

জাভেদের দিকে চাইল জিকো। ইশারায় ওকে চুপচাপ থাকার নির্দেশ দিল জাভেদ। কয়েক মিনিট আবার নীরবে কাটল। প্রথম বিস্ময়টা কাটিয়ে ওঠার পরেই বিনাবাক্যব্যয়ে শান্তভাবেই আবার ঘরের কাজ করতে লেগে গেছে জেনি। যেন কিছুই হয়নি এমনভাবেই সে টেবিলের উপর রোজকার মত খাবার বেড়ে দিল। জাভেদ লক্ষ করল মেয়েটার পায়ে বুট জুতো আর পরনে রয়েছে তার হাইকিঙে যাবার উপযুক্ত পোশাক–সব পরিস্থিতির জন্যই তৈরি রয়েছে জেনি।

সুড়ঙ্গটার সম্বন্ধে কিছুই জানে না ম্যাট, ওটাই রক্ষা করবে ওদের এ যাত্রা। জিকো ছাড়া আর কেউ জানে না সে কথা। ওটা না থাকলে একেবারে অসহায় অবস্থায় পড়তে হত ওদের। উঠান থেকে গরুগুলোকে সরাতে না পারলে কারও পক্ষে কেবিন থেকে বের হওয়া অসম্ভব। গরুগুলোকে মারতে পারে ওরা কিন্তু তা হলে পরে জাভেদরা সবাই খুন হয়ে গেলেও কেউ মিস পেজের দোষ ধরবে না।

'তোমরা খেতে চাইলে খাবার তৈরি,' বলল জেনি।

'জিকো, তুমি টেবিলে বসে খেয়ে নাও, আমি জানালার ধারে বসেই খাচ্ছি।'

'শুনেছ!' আবার ম্যাটের গলা শোনা গেল। 'জাভেদ, আমি জানি তুমি কেবিনের ভেতরে আছ। খোদার কাছে প্রার্থনা করেও কোন লাভ হবে না, বন্দুক ছেড়ে আত্মসমর্পণ করো, তবেই একমাত্র ছাড়া পাবে তোমরা!'

কেবিনের দখলটা হারাতে হবে জাভেদকে। শীত প্রায় এসে গেছে, এই সময়ে নতুন করে বানিয়ে ওরা তৈরি ঘরটাই ব্যবহার করতে চাইবে, তাই এটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করার ভয় করছে না জাভেদ। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে টিকে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে বটে কিন্তু কিছুদিনের জন্য ওরা সহ্য করতে পারবে এই কষ্ট। জানালার কাছ থেকে দূরে সরে এসে পরিস্থিতিটা ভাল করে বিবেচনা করে দেখছে ও।

এই ধরনের বিপদ আসতে পারে মনে করেই জাভেদ তৈরি করেছিল এই কেবিন উতেদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। যদিও যে কোন আক্রমণ প্রতিহত করার মত মজবুত করেই কেবিনটা তৈরি করেছে সে, তবু নেহাত বেকায়দায় পড়লে যেন পালানো যায় সেই পথও রেখেছে ও বুদ্ধি করে। সুড়ঙ্গটা মেসার ধারে একটা ঘন ঝোপের আড়ালে বেরিয়েছে। কাছেই আর একটা গোপন আস্তাবলও আছে তার।

উঠানের গরুগুলোর পিছন দিক থেকে লোকজনের কথার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে জাভেদ। জবাব না পেয়ে ওরা বুঝে নিয়েছে কথাবার্তার মাধ্যমে আপোষ করা যাবে না। হয়তো ওদের পরবর্তী কর্মপন্থা নিয়ে আলাপ করছে ওরা।

জাভেদের কফি নিয়ে এল জেনি জানালার ধারে। ওর দিকে চেয়ে হাসল জাভেদ। 'খুব খারাপ লাগছে আমার, তুমি এখানে এসেই এই ঝামেলার মধ্যে পড়লে।'

'আমাদের কি এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'তবে তো আমাদের গরম জামা-কাপড়, কম্বল এসব লাগবে; ঠিক আছে

আমি সবকিছু গুছিয়ে নিচ্ছি।'

ধীরপায়ে নিজের কাজে চলে গেল জেনি। ওর দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে ভাবছে জাভেদ কী শান্ত ভাবেই না সবকিছু গ্রহণ করেছে মেয়েটা। আবার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চাইল সে···রাত না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে ওদের, দিনের আলোয় সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালানো কঠিন হবে। চারদিক নিস্তব্ধ, গরুগুলো নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে উঠানে ঠাসাঠাসি করে। কোন কাজ না পেয়ে দু'একটা গরু এর মধ্যেই জাবর কাটতে শুরু করেছে।

আগুনটার পাশে উবু হয়ে বসে ঠাণ্ডায় জমে আসা হাত দুটো গরম করে নিচ্ছে ম্যাট। 'ওরা ওই কেবিনের মধ্যেই আটকা আছে এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।'

অ্যালেক আগুনের পাশে বসে একটা সিগারেট বানাতে ব্যস্ত। কাজের থেকে চোখ না সরিয়েই সে বলল, 'ওদের ওখান থেকে বের করার একটা ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে। কেবিনে যদি খাবার মজুদ থাকে তবে সারা শীতই ইচ্ছা করলে ওরা কেবিনে কাটিয়ে দিতে পারবে।'

চিন্তিত মুখে এদিক ওদিক চেয়ে ম্যাট বলল, 'ঘাসের ব্যাপারে মিথ্যা বলেনি লোকটা। এখানে যা অবস্থা দেখছি তাতে আমাদের পশুগুলোকে এক সপ্তাহের বেশি রাখা যাবে না।'

'আরও আছে,' জবাব দিল অ্যালেক।

ওভারকোটের নীচে ঠাণ্ডায় কুঁজো হয়ে রয়েছে ম্যাট। যতই দেখছে ততই অসুবিধাজনক মনে হচ্ছে তার কাছে সবকিছুই–পরিস্থিতিটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না তার। এর উপর যদি তুষারপাত আরম্ভ হয়···

'আমার মনে হয় এখনই কিছু লোক পাঠানো দরকার ঘাসের খোঁজে। ঘাস যদি পাওয়া যায় আমাদের সেখানেই সরে যেতে হবে।'

'আমার চেয়ে বেশি বোঝো মনে হচ্ছে?' খেপে উঠল অ্যালেক।

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল ম্যাটের। 'তুমি বলেছিলে এখানেই যথেষ্ট ঘাস আছে। তোমার কথায় বিশ্বাস করেছিল মিস পেজ। তোমার কথা সত্যি হলেই রক্ষা!'

'ঘাস আরও আছে এখানে।'

ধীরে ধীরে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে দেখল অ্যালেকজান্ডার শার্প। যখন খালি অবস্থায় দেখেছিল জায়গাটাকে অনেক বড় মনে হয়েছিল তার, কিন্তু এখন গরু-মহিষ ভরে যাবার পর অত্যন্ত ছোট মনে হচ্ছে সেটাকেই। মনে মনে নিজেও বেশ চিন্তিত হয়ে উঠছে সে। পাহাড়ের আশেপাশে ঘাস থাকতেই হবে, কিন্তু কোথায়? সে আশা করেছিল জাভেদের ব্যবহার করার ফলে সেগুলোতে পৌঁছবার চিহ্নিত সুগম পথ থাকবে, কিন্তু কই? তেমন কোন পথই তার নজরে পড়েনি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এটুকুই জাভেদের র‍্যাঞ্চের সব–অথচ স্যান সিদ্রো আর সান্তে ফির লোকজন তাকে বলেছে জাভেদের র‍্যাঞ্চে কয়েক হাজার জন্তু পালার মত জায়গা আছে।

'ঠিক আছে,' শেষ পর্যন্ত মত দিল অ্যালেক। 'দুজন লোককে পাঠিয়ে দাও ঘাসের খোঁজে।' কেবিনটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে সে আবার বলল, 'চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে বটে, কিন্তু মনে হচ্ছে আগুনটা নিভে আসছে।'

'চমৎকার ভাবে বানানো হয়েছে বাড়িটা, আগুনের প্রয়োজন ওদের কমই হয়।'

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। আকাশের দিকে চাইল ম্যাথিউ। শক্ত সবল একরোখা মানুষ সে, নীনা পেজের অধীনে অনেকদিন থেকে কাজ করছে ও। নীনার মুখের আদেশই ওর কাছে যথেষ্ট। এর আগে ওর বাবার অধীনে কাজ করেছে সে। নীনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারে না ম্যাট, ওর বাবার চেয়ে অনেক বেশি ঘিলু আছে মেয়েটার মাথায়। ওর বাবা থাকলে টেক্সাসেই থেকে মারপিট করে টিকে থাকার চেষ্টা করত, কিন্তু নীনা ঠিকই জানে কোনসময়ে পাত্তাড়ি গুটিয়ে পালাতে হবে। নীনার কিছু পশু তাড়িয়ে নিয়ে গেছিল ওরা, তাই চলে আসার সময়ে আশেপাশে যত জীব-জন্তু পেয়েছে সবই খেদিয়ে নিয়ে এসেছে এরা।

ম্যাটের নিজস্ব ধারণা যে জাভেদের দেওয়া বুদ্ধিটাই ঠিক ছিল। ওদের পশুর দলের মধ্যে এত বিভিন্ন মার্কার পশু রয়েছে যে ওগুলো বিক্রি করে না দিলে যে কোন সময়ে ধরা পড়ে যেতে পারে ওরা।

একটা কাঠ হাতে তুলে নিয়ে আগুনটাকে একটু খুঁচিয়ে দিল ম্যাট। ওদের হাতে সময় নেই মোটেও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খালি করাতে হবে র‍্যাঞ্চ—দরকার পড়লে খুন করেই। তবে সেটাকে শেষ উপায় হিসাবে রেখেছে ম্যাট। যদি সবরকম চেষ্টা বিফল হয় তবেই—কারণ জাভেদের মত মানুষকে হত্যা করায় ঝামেলা আছে। ও রকম শক্ত মানুষের বন্ধু-বান্ধবও শক্তই হবে, তারা আবার ম্যাটের পিছু নেবে বন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।

জাভেদ আর লরেন্সের লড়াইটা সে নিজে দেখেনি বটে, কিন্তু পরে লরেন্সের চেহারা দেখে তার অনুমান করে নিতে অসুবিধে হয়নি। লরেন্সের যত চালবাজি আর বড়াই ছিল ওই এক মারের চোটে সব একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত ম্যাট জাভেদকে যতখানি দেখেছে তাতে লোকটাকে ভিটে ছাড়া করা যে সোজা কাজ হবে না তা ভাল করেই জানে সে।

জাভেদের চালচলনে তার উপর কিছুটা শ্রদ্ধাই এসে গেছে ম্যাটের। এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে লড়তে হবে জেনেও বিন্দুমাত্র ভয় পায়নি লোকটা।

অ্যালেক আর নীনার যথাসর্বস্ব নিয়োজিত রয়েছে এই গরু-মহিষগুলোর সাথে ফিরে যাবার আর কোন উপায়ই নেই ওদের। ওরা পিছনে যা ফেলে এসেছে তা হচ্ছে শত্রুতা আর দুর্নাম। ওদের পশুগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এই র‍্যাঞ্চের উপর ওদের অধিকার এখনই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তবু জাভেদের মত ম্যাটেরও ধারণা র‍্যাঞ্চ দখল করার ঝুঁকি না নিয়ে ওদের পশুগুলো বিক্রি করে দেওয়াই ভাল ছিল।

পেজদের সাথে প্রায় বিশ বছর আছে ম্যাট। বুড়ো একেবারে ডাকাত ছিল। অন্যের পশু চুরি করে নিজেদের মার্কা লাগিয়ে আর অন্যের জমি অন্যায়ভাবে দখল করে প্রচুর টাকা বানিয়েছিল লোকটা।

নীনা পেজ তার বাপের চেয়ে অনেক ধূর্ত আর বিচক্ষণ। নিজের রূপ আর যৌবনকে সে পিস্তলের চেয়েও মারাত্মকভাবে ব্যবহার করতে জানে। কিন্তু অ্যালেককে ঠিক বুঝতে পারে না সে সব সময়ে। অ্যালেকের চাচীকে বিয়ে

করেছিল বুড়ো পেজ, সেই থেকেই অ্যালেক এদের সাথেই আছে। মাঝে একবার কয়েক বৎসরের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিল। ওই সময়ে সে যে কোথায় ছিল, কী করেছে তা কেউ জানে না। কিন্তু ফিরে আসার পর দেখা গেল অনেক চালু হয়েছে সে, পোকার খেলাও ভালই শিখেছে। পিস্তল চালানোতেও হাত পাকিয়েছে বেশ। একদিন শার্ট বদলাবার সময়ে ওর দেহে বেশ কিছু বুলেটের দাগ দেখেছে ম্যাট, কিন্তু ওগুলো কী করে হলো তা আর জিজ্ঞেস করে ওঠা হয়নি কোনদিন।

অন্য র‍্যাঞ্চের সাথে মারামারিতে বুড়ো মারা যায়। অ্যালেক ব্যাপারটাকে আয়ত্তে এনে ফেলে। আসল ঘটনা যে কী ঘটেছিল জানতে পারেনি ম্যাট। যে লোকটা বুড়োকে মেরেছে তাকে খুব কাছে থেকে গুলি করে মারা হয় তারই ঘরের দরজায়। তার ছেলে ছুটে পালাচ্ছিল, তাকেও গুলি করে মারে অ্যালেক।

এর পরে কিছুদিন পরপরই মারামারি লাগত। দেখা গেল র‍্যাঞ্চের কাজের লোকের চেয়েও বেশি বন্দুকবাজের দল অ্যালেকের বেতনভুক্ত হয়েছে। র‍্যাঞ্চের কাজ একেবারে গোল্লায় গেল, ওদিকে অ্যালেকের ভাড়া করা লোকের সাথে স্থানীয় লোকেদের ঝগড়া বিবাদ বেড়েই চলল। শেষে সবাই একজোট হয়ে পালটা জবাব দিতে আরম্ভ করায় ওদের বাধ্য হয়েই প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে।

হাত গরম করে নিয়ে সিগারেট বানাতে আরম্ভ করল ম্যাট। টেক্সাসে সব সময়েই মারামারির ঝামেলা অ্যালেকের উপরই থাকত, নিজেকে ব্যস্ত রাখত সে র‍্যাঞ্চের কাজে। সব সময়েই র‍্যাঞ্চের কাজ জানা লোকের অভাব ছিল ওদের–এখন তো ওদের সংখ্যা তিনে দাঁড়িয়েছে। বাকি সবাই লরেন্স, স্যান্ডি, বার্টদের মত জঘন্য চরিত্রের খুনী বন্দুকবাজ। এদের মধ্যে লরেন্স আর স্যান্ডিকে একেবারেই দেখতে পারে না ম্যাট। শুধু ওদের দুজনের জন্যই চার-পাঁচজন ভাল র‍্যাঞ্চের কাজ জানা লোককে বিদায় করতে হয়েছে তাকে।

ভোর হবার সাথে সাথে এসে হাজির হলো নীনা পেজ। এক্কাগাড়িটা এতদূর পর্যন্ত আসে না বলেই ওটাকে নীচে ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে এসেছে সে। গরুগুলো এখনও ওই একই অবস্থায় কেবিনের দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। কেবিনের চিমনি দিয়ে সামান্য ধোঁয়া উঠছে। এতক্ষণ ঘাস বা পানি না পেয়ে জন্তুগুলো বেশ একটু অস্থির হয়ে উঠেছে।

সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপ ধরে গেছে নীনার। সতৃষ্ণ নয়নে চাইল সে কেবিন থেকে ওঠা ধোঁয়ার রেখাটার দিকে। ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে চারপাশটা একবার ভাল করে দেখল নীনা। নিজের চোখে দেখার পর হতবুদ্ধি হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যালেক, তুমি না আমাকে বলেছিলে এখানে কয়েক হাজার গরু চরার মত ঘাস আছে? কোথায়?'

'জাভেদের কয়েকশো পশু আছে এদিকেই কোথাও,' জবাব দিল অ্যালেক। 'অনেক উপত্যকা আছে আশেপাশে, সেগুলো খুঁজে বের করে নেব আমরা।'

'খুঁজে দেখেছ?'

'খোঁজা হচ্ছে,' জবাব দিল ম্যাট। 'তবে এখনও কিছুই পাওয়া যায়নি। কোন পথের চিহ্নও চোখে পড়েনি আমাদের।'

কেবিনের দিকে চাইল আবার নীনা। 'ওদের ওখান থেকে বের করা যায় না?'

'যায়,' ইতস্তত করে বলল ম্যাট। 'তবে সেটা করতে হলে ওদের সবাইকে খুন করতে হয়। তাতে ঝামেলা অনেক বেড়ে যাবার আশঙ্কা আছে।'

'ওই গরুগুলোকে পানি খাওয়ানো দরকার। ওগুলোকে সরিয়ে নিয়ে যাও, আমি কেবিনে গিয়ে দেখি কী অবস্থা।'

কেবিনের ভিতর থেকে গরু সরিয়ে নেওয়া দেখল জাভেদ। সব সরে গেলে নীনা ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে এল। দরজা সামান্য ফাঁক করে ডাকল সে, 'এস, ভিতরে এস, স্বাগতম জানাই অতিথিকে।'

নীনা ঘরে ঢুকতেই অ্যালেক আর ম্যাটও পিছু নিয়েছিল। ওদের পায়ের কাছে একটা বুলেট বিঁধিয়ে চিৎকার করে জাভেদ বলল, 'তোমরা ওখানেই থাকো; কাউকে আহত করতে চাই না আমি।'

জিকোর দিকে চাইতেই সে রাইফেল হাতে জানালার কাছে এগিয়ে গেল।

ভিতরে ঢুকেই ঘরের চারপাশটা একবার চেয়ে দেখল নীনা। এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা কামরা দেখবে আশা করতে পারেনি সে। জেনির সাথে চোখাচোখি হলো তার। একটা সাধারণ সুতির কাপড়ে সুন্দর দেখাচ্ছে মেয়েটাকে।

'বোসো,' বলল জেনি। 'গরম কফি দিচ্ছি আমি এখনই।'

কেতাদুরস্ত কায়দায় পিছন থেকে চেয়ার ঠেলে দিয়ে নীনাকে বসাল জাভেদ। প্রায় সাথে সাথেই এক কাপ গরম কফি হাজির করল জেনি। কফি গরমই ছিল, সাথে এক প্লেট ডো-নাটও এনেছে সে।

'বেশ ভালই আছ দেখছি তোমরা, কিন্তু দুঃখের বিষয় এসব ছেড়ে যেতে হবে তোমাদের।'

'হ্যাঁ, ভালই আছি। এই আবহাওয়ায় এই এলাকায় কী করে টিকে থাকা যায় শিখে নিয়েছি আমরা।' ইচ্ছে করেই কথার মোড় ঘোরাল জাভেদ।

'ঘাস বিশেষ দেখছি না আশেপাশে, কিন্তু আমার বিশ্বাস র‍্যাঞ্চ করা সম্ভব এখানে।'

'কে যে তোমাকে এই বুদ্ধি দিয়েছে জানি না, তবে আমার মনে হয় এর পিছনে আরও গূঢ় কোন কারণ আছে তোমার।'

'এই জমি আমার, সেটাই কি আমার এখানে আসার যথেষ্ট কারণ হতে পারে না?'

'ভুল করছ তুমি। তোমার দলিল গভর্নর আর্মিজোর দেয়া, ওটা কোর্টে গ্রাহ্য নয় জেনেই এখানে আশি বর্গমাইল জমি কিনেছি আমি—কাগজপত্রও আছে আমার সবই।'

জাভেদের দিকে চেয়ে একটু হাসল নীনা। 'আপোষে মীমাংসা করার জন্যেই এসেছিলাম কিন্তু তা হবে না বুঝতেই পারছি। তবে এটা জেনো যে কোন কোর্টে যাব না আমরা, এর নিষ্পত্তি এখানেই করা হবে।'

নীনার কফি শেষ হয়েছে দেখে উঠে দাঁড়াল জাভেদ। 'তা হলে আমাদের আর আলাপ আলোচনা করে কোন লাভ নেই। তোমাকে আমি এক ঘণ্টা সময় দিচ্ছি আমার জমি থেকে তোমার গরু-মহিষ সরিয়ে নেয়ার।'

নড়ল না নীনা। কাপটা হাতে তুলে নিয়ে মিষ্টি করে হাসল সে। 'দুর্ভাগ্য আমার যে আমরা দুজনে পরস্পরের শত্রু,' বলল সে। 'বন্ধু হতেই চেয়েছিলাম আমি।'

'এখনও তা হতে পারে,' বলে উঠল জেনি। 'তোমার গরু-মহিষ নিয়ে অন্য কোথাও নিজেদের জায়গা করে নাও, তারপর বন্ধু হিসেবে আমাদের সাথে দেখা করতে এসো।'

'"আমাদের"? আচ্ছা!' উঠে দাঁড়াল নীনা। 'আমি জানতাম না তুমি এরই মধ্যে জাভেদের অংশীদার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছ।'

জেনির মুখ প্রথমে ফ্যাকাসে তারপরেই আবার আরক্ত হলো। জবাব দিল, 'তুমি ভুল বুঝছ, আমার বাবা তার বিশ্বস্ত লোক, তাই আমি মনে করি আমারও তার প্রতি বিশ্বস্ত হওয়াই স্বাভাবিক।'

'হ্যাঁ, তুমি যে তার বিশ্বস্ত আর অনুগত হতে চাইবে এটা আমিও বিশ্বাস করি।'

বাইরে বেরিয়ে এল নীনা। মুখে বাতাসের ঠাণ্ডা ঝাপটা লাগতেই মুহূর্তকাল দাঁড়াল সে। বাইরে তার ঠাণ্ডা লাগলেও ভিতরে ভিতরে জ্বলছে সে। তবে তাই হোক, অ্যালেক জানে কী করে কী করতে হবে। ঘোড়ায় উঠে বসল সে, কিন্তু জাভেদের চিন্তামগ্ন গম্ভীর মুখটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না সে।

শিগ্‌গিরই মারা যাবে···খুন হয়ে যাবে লোকটা।

কিন্তু কী আর করা যাবে? যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। নিজের মনকে বারবার বোঝাতে চাইল সে, আর কোন উপায়ই যে নেই।

ঠাণ্ডায় কুঁজো হয়ে বিরক্ত চোখে আকাশের দিকে চাইল অ্যালেক। 'তুমি ঠিক জানো ওখান থেকে বেরুবার আর কোন দরজা নেই?'

'হ্যাঁ, খেয়াল করে দেখেছি আমি, দরজা মাত্র একটাই।'

'তোমার কী মত, ম্যাট?' প্রশ্ন করল অ্যালেক।

জিনের উপর একটু নড়েচড়ে বসল ম্যাট। 'আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে না কাজটা, তবে আমাদেরও কিছু লোক মারা পড়বে।'

'উপায় নেই, ঝুঁকিটা আমাদের নিতেই হবে,' সিদ্ধান্ত দিয়ে দিল অ্যালেক।

'স্যান্ডি আর লরেন্স দুজনেই বন্দুক চালানোতে ওস্তাদ। ওরা দুজন যদি একটু এগিয়ে গিয়ে জানালা দুটো কাভার করে, তবে আমাদের বাকি লোকজনের পক্ষে ওদের ভিতরে থাকা অসম্ভব করে তোলা কঠিন হবে না।' এই সুযোগে যাদের সে পছন্দ করে না তাদের কায়দা করে শেষ করার সুযোগ ম্যাট হেলায় হারাতে চায় না।

'ঠিক আছে,' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল অ্যালেক। 'তবে তাই করো।'

জলদি সবাইকে তাদের নির্দেশ জানিয়ে দিল ম্যাট। সবাই নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে আস্তানা গাড়ল। স্যান্ডি থাকল ডানদিকে একটা গাছের আড়ালে আর লরেন্স বামে। তিনজন থাকল গুদামে, দুজন আস্তাবলে।

একটা রাইফেল গর্জে উঠল। স্যান্ডি গুলি করেছে, ওর রাইফেলের নলের মুখে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। কয়েক মিনিট আর কোন শব্দ পাওয়া গেল না। দূরে

আগুনের ধারে বসে নীনা বোঝার চেষ্টা করছে কে গুলিটা করল। মানুষ মারা যাবে এখন...কিন্তু মানুষ তো আগেও মরেছে। তাদের গত টেক্সাসের গোলাগুলিতেই তো বারোজন মরেছিল, আহত হয়েছিল আরও বেশি।

স্যান্ডির গুলিটা জানালার চৌকাঠে লেগে কিছুটা চলটা উঠিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আড়চোখে সেদিকে চেয়ে অপেক্ষা করে রইল জাভেদ। কাউকে দেখা না গেলে শুধু শুধু আন্দাজে গুলি ছুঁড়ে কোন লাভ নেই। তাড়া নেই ওর।

জাভেদের নির্দেশ অনুযায়ী কিছু খাবার প্যাকেট করতে ব্যস্ত জেনি। কম্বল আর গ্রাউন্ড শীট সে আগেই প্যাক করে রেখেছে।

একটা বুলেট সশব্দে কাঁচ ভেঙে ছাদে গিয়ে লাগল। একটু সরে বসল জিকো, তারপরেই গুলি করল সে। একটা অকথ্য গালি দিয়ে লাফিয়ে পিছনে সরে গেল লরেন্স। বুলেটটা ওর কাঁধে আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। পিঠ বেয়ে রক্ত পড়া বেশ টের পাচ্ছে লরেন্স। একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল ওর দেহে—লক্ষ্য স্থির করে গুলি করতে জানে লোকগুলো!

সারাটা বিকেল একটা দুটো করে গুলি চলল, কিন্তু কোন পক্ষেরই কেউ হতাহত হলো না তাতে। কতগুলো পাথরের আড়ালে বসে অ্যালেক লক্ষ রেখেছে কেবিনটার উপর। এ পর্যন্ত মাত্র চারটে গুলি এসেছে ওখান থেকে। হয় ওদের গুলি কম আছে, নতুবা ওরা খুব সাবধানী, হিসাব করে খরচ করছে গুলি। লরেন্সের কাঁধে চোট লেগেছে আর স্যান্ডির বুটের একটা গোড়ালি উড়ে গেছে বুলেটের আঘাতে। আর দুবার অল্পের জন্য বেঁচে গেছে ম্যাট।

প্যাকেটগুলো টানেলের কাছে তৈরি রাখা হয়েছে। জিকো সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে গিয়ে লুকানো ঘোড়াগুলোকে খাইয়ে ওখানেই অপেক্ষা করছে। যখনই হোক কেউ না কেউ পিছন দিকটায় আসবে, আর এলেই ঘোড়াগুলো তার চোখে পড়বে।

অন্ধকার হয়ে যেতেই জাভেদ চট করে বেরিয়ে কেবিনের দেয়ালের সাথে সেঁটে দাঁড়াল। ওরা ক্রল করে জানালার নীচে এসে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে গুলি করার চেষ্টা করতে পারে অন্ধকারে। তৈরি হয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগল জাভেদ।

কিছুক্ষণ পর একটা অস্পষ্ট নড়াচড়া লক্ষ করল সে গুদামের দেয়ালের পাশে। তারপর দেখতে পেল লোকটাকে, নিচু হয়ে মোজা পায়ে ছুটে আসছে। উঠে দাঁড়াল জাভেদ। ছাদের বাড়ানো অংশের নীচে তার দেহ অন্ধকারের সাথে একেবারে মিশে আছে। নিঃশব্দে ছুটে আসছে লোকটা। অন্ধকারে দেখতে পায়নি সে জাভেদকে, যখন দেখল অনেক দেরি হয়ে গেছে তখন। কানের পিছনে পিস্তলের বাড়ি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল লোকটা। কোমর থেকে গরুর পা বাঁধার দড়ি খুলে ওকে বেঁধে ফেলে মুখে একটা পুরোনো চটের টুকরো গুঁজে দিল সে।

লোকটা গলা দিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ করে নড়ে উঠল। 'চুপ,' ওর কানের কাছে নিচু স্বরে ফিসফিস করে বলল জাভেদ। 'নইলে আবার মাথায় বাড়ি খাবে।'

ধীরে ধীরে আরও এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল, কিছুই ঘটল না। তারপরে গুদাম ঘর থেকে দ্বিতীয় একজন রওনা হলো। দ্রুত ছুটে আসছে লোকটা। পায়ের আওয়াজ পেয়ে হাত-পা বাঁধা লোকটা একটা অস্ফুট শব্দ করে নড়ে উঠল। ছুটে

আসা লোকটা থেমে দাঁড়িয়েই পিস্তল বের করল। হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসে পড়ল জাভেদ। লোকটা গুলি করার সাথে সাথেই সে-ও জবাব দিল, তারপর মাটিতে শুয়ে গড়িয়ে সরে গেল। ওর মাথার উপর দিয়ে আরেকটা বুলেট কেবিনের দেয়ালে গেঁথে গেল।

আরও এক ঘণ্টা পর দরজার কাছে এসে ভিতরে ঢোকার জন্য বিশেষ সঙ্কেত দিল সে। মুহূর্তে ওর পাশে এসে হাজির হলো জেনি। 'ব্যথা পেয়েছ তুমি?' ওর স্বরে আন্তরিক উৎকণ্ঠা।

'না, খিদে পেয়েছে আমার।'

'একটাকে ঘায়েল করেছ তুমি, জানালা দিয়ে ওকে ঘুরে পড়ে যেতে দেখেছি আমি,' বলে উঠল জিকো। টানেল দিয়ে আবার ফিরে এসেছে সে।

'একজন বন্দীও আছে।'

অন্ধকারে টেবিলে বসে ডিনার খেয়ে নিল জাভেদ। কফি আর একটা ডো-নাট হাতে করে জানালার ধারে গেল সে। বাইরেটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে নিল।

'সময় হয়েছে,' বলল জাভেদ। 'তোমরা তৈরি হও।'

লুকানো ঘোড়াগুলোর কাছে যখন পৌঁছল ওরা তখন আকাশে অনেক তারা উঠেছে। দু'এক মিনিটের মধ্যেই ওরা তিনজন তিনটে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। আরও কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটার পর ওরা বুঝল প্রতিপক্ষ ওদের সরে আসা টের পায়নি এখনও।

মেসার পাশ দিয়ে হেঁটে এগিয়ে গেল ওরা। পথ দেখিয়ে আগে আগে জিকো আর সবার পিছনে গার্ড দিচ্ছে জাভেদ। কেবিন থেকে বেরিয়ে প্রায় সিকি মাইল দূরে চলে আসার পর ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চলল ওরা পশ্চিমে। পিছন থেকে কেউ অনুসরণ করছে না ওদের।

কেবিনে থাকতে পারত ওরা সহজে। সহজে বাইরে থেকে কেউ কিছু করতে পারত না ওদের। কিন্তু ওখানে থাকলে কোন এক সময়ে ওই লুকানো ঘোড়াগুলো ওরা আবিষ্কার করেই ফেলত। ওরা পালিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু এখন নিজেদের ইচ্ছামত গতিবিধি আছে ওদের। এর প্রধান সুবিধা হলো, এখন যখন খুশি আক্রমণ করতে পারবে ওরা।

এক ঘণ্টা চলার পরে ঘন জঙ্গল শেষ হয়ে ফাঁকা জায়গা পড়ল সামনে। এখনও মেসার পাশ দিয়েই যাচ্ছে ওরা। ওদের ডান পাশেই সোজা পাঁচশো ফুট খাড়া উঠে গেছে মেসার দেয়াল। পিছন থেকে জেনির পাশে এগিয়ে এল জাভেদ।

'কী অবস্থা তোমার, জেনি? কষ্ট হচ্ছে খুব?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কিচ্ছু অসুবিধে হচ্ছে না আমার, জাভেদ। দরকার হলে সারাদিন সারারাত ঘোড়ার পিঠে চলতে পারব আমি।'

'আসলেই শক্ত মেয়ে দেখছি তুমি!'

জিকো নীরব রইল। চাঁদ উঠেছে এখন, তারাগুলো চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় ম্লান হয়ে এসেছে। দূরে দিগন্তরেখায় মেঘ দেখা যাচ্ছে।

'উত্তর দিকে চলেছি আমরা,' ব্যাখ্যা করল জাভেদ। 'ওই যে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে, ওগুলোই ন্যাসিমিয়েনটো পর্বতমালা। ওই চূড়াটার দক্ষিণেই দুই

পাহাড়ের ফাঁকে কোথাও রাতের মত ঠাঁই নেব আমরা।'

সরাসরি হিসাবে মাত্র তিন চার মাইল এসেছে ওরা, কিন্তু পথ চলতে প্রায় ডবল ঘুরতে হয়েছে। পাহাড়ের চূড়াটাকে নিশানা করে এগিয়ে যাচ্ছে তিনজনে। প্রায়ই থেমে দাঁড়িয়ে জাভেদ নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে কেউ ওদের অনুসরণ করছে কিনা। ভোরের দিকে ইউরেকা মেসার পিছনে ক্যাম্প করল ওরা।

'তোমার কি মনে হয়, ওরা আমদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে, নাকি র‍্যাঞ্চ পেয়ে গেছে মনে করে ফুর্তি করবে?' গুহার ভিতরে আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে প্রশ্ন করল জিকো।

'নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবার সুযোগ ওরা পাবে না। আমরা ফিরে গিয়ে এমন উৎপাত শুরু করব যে পালাবার পথ পাবে না কেউ।' কথাটা বলে উঠে দাঁড়াল জাভেদ। 'প্রথম পাহারার পালাটা আমিই নিচ্ছি, জিকো। তোমরা বিশ্রাম নাও। আমি একটু ঘুরে দেখে আসি এলাকাটা।' রাইফেল তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

প্রায় বিশ মাইল চক্কর দিয়ে আবার র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। এখান থেকে র‍্যাঞ্চটা মাত্র আট মাইল দক্ষিণে। জাভেদের পশুগুলো আছে পেনাস নেগ্রাসে—এখান থেকে বেশি দূরে নয়। দক্ষিণ আর পুবের এলাকা ওর ভাল করেই চেনা আছে। উত্তরের দিকে জাভেদ শুনেছে কিছু দাগী ডাকাত আর অসভ্য উতে ইন্ডিয়ানদের বাস।

দূরবীন চোখে লাগিয়ে ভাল করে চারদিকটা দেখে নিল জাভেদ। একদল হরিণ আর একটা ভালুক নজরে পড়ল ওর—কিন্তু কোন জনমানবের চিহ্ন দেখল না সে।

ফিরে এসে কিছু খেয়ে নিয়ে তার পরবর্তী প্ল্যানের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল জাভেদ। যখন ঘুম ভাঙল দেখল প্রায় বিকেল হয়ে এসেছে—কফির সুন্দর সুগন্ধ বাতাসে ভাসছে। গনগনে আগুনটার পাশে তারই দিকে চেয়ে বসে আছে জেনি।

উঠে বসে একটু মাথা চুলকে সে জিজ্ঞেস করল, 'কই, ঘুমালে না তুমি?'

'আমি পরে ঘুমাব। সবকিছু ঠিকই আছে, আমি ঘুরে দেখে এসেছি, আশেপাশে কোথাও কেউ নেই।'

'আচ্ছা মেয়ে বটে তুমি! বিপদের সাথে পরিচয়ও তোমার আছে মনে হচ্ছে। এতসব কোথায় শিখলে তুমি—কনভেন্টে নিশ্চয়ই না?'

'আমি আমার বাবার কাছে এসব ট্রেনিং পেয়েছি ছোটকালেই,' হাতের ইশারায় জিকোকে দেখাল জেনি। 'সে-ও তোমার মতই সাবধানী।'

'পশ্চিমের জীবনের ধারাই এই,' একটা সিগারেট বানিয়ে আগুন থেকে একটা ছোট্ট কাঠের টুকরো তুলে নিয়ে সিগারেট ধরাল জাভেদ। 'জিকোর কাছে শুনেছি ইন্ডিয়ানরা তোমার আত্মীয়স্বজন সবাইকে মেরে ফেলেছে।'

'ওসব কিছুই প্রায় মনে নেই আমার…কেবল মনে আছে অনেক পথ চলেছি আমরা। বাবা, মা আর যতদূর মনে পড়ে আমার এক কাকা ছিলেন আমাদের সাথে। বাবার সাথে পানির ধারে গেছিলাম আমি, এমন সময়ে গুলি আর চিৎকারের শব্দ কানে যায় আমাদের। খুব ভয় পেয়েছিলাম আমি। বাবা আমাকে

একটা ঝোপের পিছনে লুকিয়ে রেখে কী হয়েছে দেখতে গেলেন। অনেকক্ষণ পরেও তাঁকে ফিরতে না দেখে আমি খুঁজতে বেরিয়েই ইন্ডিয়ানদের চোখে পড়ে গেলাম।'

'ওরা নির্যাতন করেনি তো?'

'না, আমার সোনালী চুল দেখে খুব অবাক হয়েছিল ওরা। একজন ইন্ডিয়ান আমাকে নিজের মেয়ের মতই আদর যত্নে রেখেছিল।'

গুহা থেকে বেরিয়ে সারারাত ধুনি জ্বালাবার জন্য বেশ কিছু শুকনো কাঠ জোগাড় করে নিয়ে এল জাভেদ। বিকেলের রোদটা এখন গোলাপী আভা ছড়াচ্ছে ন্যাসিমিয়েনটোর চূড়া থেকে। আকাশটা পরিষ্কার–রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়বে।

ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে ঘোড়া সেজে গুহায় ফিরে এককাপ কফি খেয়ে নিল জাভেদ। 'আর দেরি করা যায় না,' উঠল সে। 'দিনের আলো ফুরিয়ে যাবার আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে আমাকে।'

'সাবধানে থেকো কিন্তু।'

'সাবধান তো থাকতেই হবে।'

উইনচেস্টারটা তুলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে খাপের ভিতর ঢুকাল জাভেদ। ওর পিছু পিছু জেনিও বেরিয়ে এল। 'জাভেদ–প্লীজ, নিজের দিকে খেয়াল রেখো?'

জেনির সোনালী চুলের উপর এক ফালি বিকেলের রোদ পড়ে এক অদ্ভুত সুন্দর মায়াজালের সৃষ্টি করেছে।

'তুমি চিন্তা কোরো না, খুবই সাবধান থাকব আমি।' লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ক্যানিয়নে নেমে গেল জাভেদ।

ঘণ্টাখানেক পর তার র‍্যাঞ্চ থেকে এক মাইল দূরে এবড়োখেবড়ো একটা পাহাড়ের মাথায় বসে দূরবীন দিয়ে র‍্যাঞ্চটাকে ভাল করে খুঁটিয়ে লক্ষ করল জাভেদ। এদিক ওদিক ইতস্তত দাঁড়িয়ে রয়েছে গরু-মহিষগুলো, একটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে দেখা যাচ্ছে। রাইফেল হাতে একজনকে বেরিয়ে আসতে দেখল সে কেবিন থেকে। আশেপাশে আর কোন লোকজন দেখা গেল না।

কিছু গরু-মহিষ সরে গেলে একটা আগুন নজরে পড়ল ওর। আগুনের পাশে কিছু লোকজনকেও হাঁটা-চলা করতে দেখা যাচ্ছে। গরুগুলো ইতস্তত হাঁটতে হাঁটতে জাভেদ যেখানে বসে আছে প্রায় সেই পাহাড়টার কাছাকাছি চলে এসেছে। একটা দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল ওর মাথায়।

অন্ধকার হয়ে আসতেই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে গরু-মহিষের ভিতর নেমে এল জাভেদ। উপত্যকায় ঘোড়া ছুটিয়ে এপাশ ওপাশ করতে করতে এগিয়ে পশুগুলোকে তাড়িয়ে ফিরিয়ে নিয়ে চলল সে র‍্যাঞ্চের দিকে। উত্তুরে হাওয়াটাও সাহায্য করল জাভেদকে–গরু-মহিষ দক্ষিণে হাঁটা ধরল ধীর পায়ে। আগুনটার সিকি মাইলের মধ্যে আসার আগেই প্রায় দুইশো জন্তু জড়ো করে ফেলল জাভেদ। হঠাৎ পিস্তল বের করে বিকট চিৎকার দিয়ে গুলির ফাঁকা আওয়াজ করে ঘোড়া ছুটিয়ে পশুর দলের ভিতর ঢুকে গেল সে। দলটা ছুটতে আরম্ভ করল আগুনের দিকে। দেখাদেখি সামনের জন্তুগুলোও লাফিয়ে ওই দিকেই ছুটতে শুরু করল।

আগুনের পাশ থেকে একটা ভয়ার্ত চিৎকারের সাথে সাথে একটা গুলির শব্দ

পাওয়া গেল। কিন্তু থামল না গরু-মহিষের দল, ওদের পায়ের তলায় মাড়িয়ে আগুন পেরিয়ে নেমে গেল নীচের ক্যানিয়নে।

কেবিন থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। শব্দ করে দরজা বন্ধ করল কেউ। তারপর ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠল। নিজের ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল জাভেদ।

মার্শের ধার দিয়ে সিবোল্লা ট্রেইল ধরল সে। পাহাড়টা পার হয়ে দূরে গ্রামের বাড়িগুলো দেখা গেল। তৃতীয় বাড়িটার সামনে এসে ঘোড়া থামাল সে। কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে, দরজা খুলে একটা লোক বেরিয়ে এল।

'পেড্রো, কেমন আছ?'

'আরে! সিনর জাভ! কী সৌভাগ্য আমার! আসুন, ভিতরে আসুন।' সাদর অভ্যর্থনা জানাল পেড্রো।

'সময় নেই এখন,' বলল জাভেদ। 'এই ঘোড়াটা তোমার কাছে রেখে তোমার সেই কালো ঘোড়াটা নিতে চাই আমি।'

'আসুন আমার সাথে,' পথ দেখিয়ে নিজের আস্তাবলে নিয়ে গেল তাকে পেড্রো।

'আমার ঘোড়াটা একটু আড়াল করে রেখো। গোলমাল চলছে–লোকগুলো বিশেষ সুবিধার নয়,' সাবধান করে দিল জাভেদ।

'আপনার কি সাহায্যের দরকার, সিনর জাভ?'

'না, সাহায্য দরকার পড়বে না।'

'লাগলে জানাবেন, লোমা কয়োটিতে অনেক ভাল ভাল যোদ্ধা আছে–আমি খবর দিলেই ওরা চলে আসবে।'

'না, এখনও সে সময় আসেনি।'

ঘোড়ায় চেপে স্যান সিদ্রোর কাছাকাছি পৌঁছল জাভেদ ভোরের দিকে। সেখানে একঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে আবার শহরে গিয়ে হাজির হলো সে।

স্টেজ স্টেশনের সামনেটা ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করছিল ফ্রেড। জাভেদকে আসতে দেখে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'শুনলাম ওরা নাকি র‍্যাঞ্চ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে তোমাকে?'

'তাই নাকি?' ঘোড়াটাকে বেঁধে ঘুরে দাঁড়াল জাভেদ। স্নান করে শেভ সেরে পেট ভরে খেয়ে নেওয়া দরকার তার। 'আমি নিজেই স্বেচ্ছায় আমার কেবিন ছেড়ে চলে এসেছি, আসলে আটকা পড়তে চাইনি ওখানে।'

বারের পাশ দিয়ে মোড় ঘুরেই জাভেদকে দেখে থমকে দাঁড়াল বব। ওকে ভাল করে একনজর দেখে নিয়ে প্রশ্ন করল, 'দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছ নাকি তুমি?'

'কে বলল?'

'তোমাকে আমি সেই উপদেশই দেব। তোমার র‍্যাঞ্চ তো আর তোমার নেই এখন, এখানে থেকে আর কী করবে তুমি?'

'তুমি তা হলে মনস্থির করে ফেলেছ?'

'তার মানে?'

'তুমি ওদের পক্ষ নিয়েছ, তাই না?'

ডেপুটি শেরিফের মুখের ভাব গম্ভীর আর কঠিন হয়ে উঠল। 'তোমাকে আমি আগেই বলেছি, গোলমাল করলে হাজতে ভরব আমি।'

জাভেদের মুখও গম্ভীর হলো। 'বোকামি করতে যেয়ো না, বব। জানি তোমার বৌ ছেলে-মেয়ে আছে আর ওদের খাতিরেই তুমি গোলমাল এড়িয়ে যেতে চাও। কিন্তু আমাকে হাজতে ভরার চেষ্টা যখনই করবে, তখনই মারা পড়বে তুমি।'

চোয়াল শক্ত হলো ববের। এক পা থেকে অন্য পায়ে দেহের ভর পরিবর্তন করল সে। জাভেদের চোখে চোখে চেয়ে বুকের ভিতরটা কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে এল তার।

জাভেদ ধাপ্পা দিচ্ছে না।

'আমাকে বাধ্য কোরো না, জাভেদ,' বলল শেরিফ, কিন্তু তার গলায় সেই জোর আর নেই। সে জানে ওকে গ্রেপ্তার করতে গেলে আসলেই মারা পড়বে সে।

'যেদিনই তুমি আমাকে উপযুক্ত কারণ ছাড়া হাজতে ঢোকাতে চেষ্টা করবে সেদিনই মারা পড়বে তুমি। কোনও সন্দেহ নেই তাতে। তা ছাড়া এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমি আইনসঙ্গত ভাবেই চলছি, তুমিই ওদের চাকচিক্য দেখে মোহে পড়ে গেছ। তাই তোমাকে ডিঙিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি।'

'অর্থাৎ?'

'গভর্নর আর শেরিফের কাছে আমি লিখিতভাবে জানিয়েছি এখানকার সব ঘটনা। আমার দলিল সান্তা ফে'তে রেজিস্টারি করা আছে। তুমি যদি এই ব্যাপারে নাক গলাতে যাও তবে আইন বিরোধী হবে সেটা।'

কথা একেবার বন্ধ হয়ে গেল ববের। জাভেদ যদি সত্যিই গভর্নর আর শেরিফের কাছে লিখে থাকে আর সত্যিই যদি ওর দলিলটাই ঠিক হয় তবে দুই পয়সা দামও থাকবে না আর চাকরির। তা ছাড়া এর মধ্যে নাক না গলানোর আরও একটা অকাট্য কারণ তার মনে উদয় হয়েছে–যে লোক শাইনি ডিকের মত দুর্দান্ত মানুষকে সামনাসামনি গুলি করে মারতে পারে তার সাথে গোলাগুলিতে নামার মত উটকো শখ তার নেই।

চিঠির কথায় নিজের মুখ রক্ষা করার মত একটা জবাব আপনাআপনি বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। 'ঠিক আছে। আমি না হয় শেরিফের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব–কিন্তু তাতে যদি তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, মনে রেখো তোমাকে ছাড়ব না আমি।'

কোন জবাব দিল না জাভেদ। ফ্রেডের সাথে বারের ভিতর ঢুকল সে। গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে ওর দিকে এগিয়ে দিল ফ্রেড।

'নাস্তা বানাতে বলব তোমার জন্যে?'

'নিশ্চয়ই।'

'ওদের একজনকে মেরে ফেলেছ তুমি।'

'আমারও তাই ধারণা।'

'আজ সকালে ওদের কিছু লোকের এখানে আসার কথা।'

'ওদের কথা নাস্তার পরে চিন্তা করা যাবে।'

ববের কাছে চিঠির কথা বলে ভয় দেখিয়েছিল জাভেদ। তবে এবার সে সত্যিই সেই চিঠি দুটো লিখল। তৃতীয় একটা চিঠি লিখল সে ট্যাসকোসার রেঞ্জার ক্যাপ্টেনের কাছে। নীনা পেজদের দল আর ওদের দলিল সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে অনুরোধ করল তাকে জাভেদ।

নাস্তা শেষ করে দ্বিতীয় কাপ কফিতে চুমুক দেওয়ার সময়ে বব এসে ঢুকল বারে। 'তোমার কি এখানেও মারপিট করার ইচ্ছা আছে নাকি?'

'কেন, ওরা কি আসছে?'

'হ্যাঁ, চার-পাঁচ জনকে আসতে দেখলাম।'

'ধন্যবাদ, বব,' যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল জাভেদ। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ঘোড়ার খুরের শব্দ পাওয়া গেল বাইরে। জানালা দিয়ে জাভেদ দেখল পাঁচজন এসেছে ওরা।

'আর কী?' রাগের স্বরে বলল বব, 'দেরি হয়ে গেছে অনেক।'

'যাক, আর এক কাপ কফির দরকার ছিল আমার এমনিতেও।' আবার নিজের চেয়ারে বসে পড়ল জাভেদ।

'শিগ্গির ওঠো, পিছনের দরজা দিয়ে হয়তো এখনও বেরিয়ে যেতে পারবে তুমি।'

'না, বেশ আছি আমি এখানে।'

কী যেন বলার জন্য মুখ খুলেছিল বব, কিন্তু তা না বলে ঘুরে বারের দিকে এগিয়ে গেল সে। বলল, 'ডাবল্ হুইস্কি, ফ্রেড। জলদি!'

কফির পট তুলে নিয়ে নিজের কাপটা আবার ভরে নিল জাভেদ, তারপর আরাম করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে দরজার দিকে সতর্ক নজর রাখল।

বুটের শব্দ পাওয়া গেল বারান্দায়। কেউ একজন জোরে হেসে উঠল।

দুলে উঠে দরজার দুটো পাটই সম্পূর্ণ খুলে গেল।

চার

প্রথম তিনজন যারা ঢুকল তাদের চেনে না জাভেদ। কিন্তু শেষের দুজন হচ্ছে লরেন্স আর বাড্।

ওদের কথা আর উচ্চকণ্ঠের হাসিতে ভরে উঠল বারটা। এখনও জাভেদের উপস্থিতি ওরা টের পায়নি বোঝাই যাচ্ছে। একজন সঙ্গীর মৃত্যু ওদের মনে কোন ছাপ ফেলেছে বলে মনে হয় না।

জাভেদের জন্য স্যান সিদ্রোতে আসা একান্ত জরুরী হয়ে উঠেছিল। চিঠিগুলো পাঠানো, ববের সাথে একটা বোঝাপড়া, এসবের দরকার ছিল তার। চিঠি থেকে তেমন কোন সাহায্য হবে বলে আশা করছে না সে, তবু আইনের আওতায় থাকতে চায় সে। এখানে এসে একটা লাভ তার এর মধ্যেই হয়েছে–বব আর এর মধ্যে বাগড়া দিতে আসবে না। সুতরাং সবটাই এখন নির্ভর করছে তার নিজের

উপর।

জাভেদ যেখানটায় বসেছে, জায়গাটা কিছুটা অন্ধকার হঠাৎ কারও এদিকে চোখ পড়লেও তাকে চট করে চিনতে পারবে না। নিজেদের মধ্যেই কথাবার্তায় ওরা মশগুল। লরেন্সই বেশি কথা বলছে, কিন্তু বাড্ আগের মতই স্থির আর নীরব রয়েছে। ওদের মধ্যে একজন জাভেদের দিকে একবার চেয়ে দেখে আবার নিজেদের কথায় মন দিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ফিরে চাইল ওর দিকে। অন্ধকারে বসে থাকা লোকটাকে দেখে কিছু একটা আশঙ্কা জেগেছে তার মনে। ঘুরে পাশের লোকটার কানে কানে কী যেন বলল সে। হঠাৎ করেই থেমে গেল ওদের উৎফুল্ল আলাপ। বব সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওদের মুখোমুখি হলো। বাডের চোখ পড়ল ডেপুটি শেরিফের উপর।

'কোন্ পক্ষ নিচ্ছ তুমি?' ববকে জিজ্ঞেস করল বাড্।

'আইনের পক্ষ। এখানে কোনরকম গোলমাল চাই না আমি, বাড্।'

হেসে উঠল লরেন্স।

জাভেদ স্থির হয়ে বসে আছে তার চেয়ারে। টেবিলের উপর রাখা তামাক আর কাগজ তুলে নিয়ে একটা সিগারেট বানাতে আরম্ভ করল সে। বব কী করে দেখার জন্য অপেক্ষা করছে ও। মনে মনে সে ঠিক করে রেখেছে গোলমাল আরম্ভ হলেই প্রথমে বাড্কে শেষ করবে, কারণ এদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে তার ধারণা। অবশ্য ওদের সব কজনকেই শক্ত সমর্থ আর চালু দেখাচ্ছে।

ববই আবার বলে উঠল, 'ড্রিঙ্ক শেষ করে এখান থেকে চলে যাও। যদি শহরে কোন গোলমাল করো, তোমাদের পিছু নেব আমি।'

'আমাদের একজনকে মেরেছে ওই লোক।'

'হতে পারে, কিন্তু আমি যা বলেছি তা যেন মনে থাকে।'

'কিছু আসে যায় না শেরিফ, তুমি একটু বাইরে থেকে বেড়িয়ে এসো, কিংবা একপাশে সরে দাঁড়াও।'

'কোন কথা শুনতে চাই না, গোলমাল করলেই তোমাদের হাজতে ভরব আমি।'

'আমাদের হাজতে ভরবে তুমি?' তাচ্ছিল্যের স্বরে প্রশ্ন করল লরেন্স।

'ঠিক তাই,' জবাব দিল বব। 'গোলমালের চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

ইতস্তত করল লরেন্স। পিস্তলে বেশ ভাল হাত আছে তার, কিন্তু ববও খামোকা শেরিফের পদ পায়নি তা ছাড়া তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শহরে যেন কোন ঝামেলা না বাধায়।

লরেন্সের দিকে একটু এগিয়ে গেল বব। 'তোমাকে তো বলেছি, লরেন্স, দরকার হয় ড্রিঙ্ক করো, কোন মানা নেই, কিন্তু শহরের ভিতর কিছু করতে পারবে না তোমরা।'

লরেন্সকে ইতস্তত করতে দেখে বাড্ বলে উঠল, 'যেতে দাও, লরেন্স, আমাদেরও সময় আসবে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বারের দিকে ফিরল লরেন্স। ফ্রেড তার গ্লাসটা আবার ভরে দিল। ফ্রেডকে লক্ষ করল জাভেদ, ওর ডান হাতটা প্রথম থেকেই বারের নীচে

সবার চোখের আড়ালে রয়েছে। বুঝে নিল, ছররা বন্দুকটার উপর রয়েছে ওর হাত। পট থেকে আবার নিজের কাপটা ভরে নিল জাভেদ।

বেশ বিপজ্জনক একটা পরিস্থিতি। সারা জেলার ডেপুটি শেরিফ হলেও বব শহরের বাইরে গোলমাল করতে মানা করেনি ওদের, বরং সেটারই ইঙ্গিত দিয়েছে। অর্থাৎ শহরের মধ্যে আইন রক্ষা করবে বব, কিন্তু বাইরে সবাইকে নিজেই নিজের নিরাপত্তা দেখতে হবে। ওরা এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে শহর থেকে বেরুনোর দুটো পথই আটক করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রধান ট্রেইল ছেড়ে অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া মিসিডোরো ট্রেইলটা খুঁজে বের করে নিয়ে ওটা ধরেই এগিয়ে পাজারিটো পীকের কাছে আবার প্রধান ট্রেইল ধরা। ওরা স্বভাবতই শহর থেকে মাইলখানেক দূরে যেখানে ট্রেইলটা দুই পাহাড়ের মাঝে সরু ফাঁকটার ভিতর দিয়ে গেছে সেইখানটাতে অপেক্ষা করবে ওর জন্য। তার আগেই ওকে অন্য পথ ধরতে হবে।

সিগারেট আর কফি শেষ হলো জাভেদের। শেরিফ আর ফ্রেড ছাড়া বাকি সবাই বেরিয়ে গেল বার থেকে।

'ধন্যবাদ, বব,' সবাই চলে যেতেই বলে উঠল জাভেদ।

'ধন্যবাদের দরকার নেই,' রাগত কণ্ঠে জবাব দিল বব। 'আমার কাজ আমি করেছি।'

'ঠিক আছে,' বলে উঠে দাঁড়াল জাভেদ। বারের কাছে এগিয়ে গিয়ে বিল মিটিয়ে দিল সে।

টাকা ড্রয়ারে রাখতে রাখতে ফ্রেড বলল, 'সাবধান থেকো জাভেদ, ওরা অপেক্ষা করবে তোমার জন্যে।'

জানালা দিয়ে বাইরে চাইল জাভেদ, ওদের ঘোড়াগুলো অদৃশ্য হয়েছে, কেবল দূরে একজন লোককে রাস্তায় ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে।

দাঁত বের করে হাসল জাভেদ 'যারা ধৈর্য ধরে এই শীতের মধ্যে আমার জন্য বৃথা অপেক্ষা করে বসে থাকবে, ঈশ্বর তাদের মঙ্গল করুন!' প্রার্থনা করল সে।

'ওদের অতটা হেলা কোরো না, জাভেদ—সাবধানে থেকো।'

'কিছু খাবার বেঁধে দাও তো আমাকে,' বব বেরিয়ে যেতেই নিচু গলায় বলল জাভেদ। 'আমাকে হয়তো দিন দুয়েক পাহাড়ে পাহাড়েই কাটাতে হবে।'

'মেয়েটা কেমন আছে, সে চোট পায়নি তো?' স্যান্ডউইচ প্যাক করতে করতে জিজ্ঞেস করল ফ্রেড।

'না, ভালই আছে সে। সত্যিই মেয়েটা অসাধারণ।'

ওভারকোট পরে নিল জাভেদ। প্যাকেট করা প্রায় শেষ করে এনেছে ফ্রেড। রাস্তার বাড়িগুলোর কথা ভাবছে জাভেদ—ডাইনে চারটে আর বামে তিনটে বাড়ি রয়েছে সামনের রাস্তাটার উপর। ওগুলোর পিছনে ছড়ানো রয়েছে আরও কতগুলো ঘর। নীনা যে বাড়িটা ভাড়া করেছে সেটা বামদিকের বাড়িগুলোর পিছন দিকে। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলল ওর মাথায়।

'চলি, আবার দেখা হবে, ফ্রেড।' বিদায় নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল

জাভেদ। সেলুন থেকে বেরিয়ে কালো ঘোড়াটার পাশ দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেল সে। চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে চট করে ফিরে ঘোড়ার পিঠে উঠে বারের পিছন দিকে চলে এল ও।

ঘটনাটা এত জলদি ঘটে গেল যে রাস্তায় জাভেদের উপর নজর রাখার জন্য যাকে রাখা হয়েছিল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সে। সামলে নিয়ে সে ছুটে আসতে আসতে জাভেদ পিছন দিয়ে ঘুরে আর একটা বাড়ির আড়ালে চলে গেল। নরম বালির উপর দিয়ে নিঃশব্দে শুকনো জলাটা পার হয়ে গাছগুলোর আড়ালে চলে এল সে। তারপর সোজা ঘোড়া ছুটাল নীনার বাসার দিকে।

বেশ কিছু গাছ গাছড়ার পিছনে আড়াল হয়ে আছে বাড়িটা। দোতালার সামনের দিকে একফালি বারান্দা। বাড়ির পিছনে আস্তাবল আর গুদামঘর। রাস্তা ধরেই সাহস করে বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল জাভেদ। এই মুহূর্তে তাকে চিনবে এমন কেউ ওই বাসায় থাকার সম্ভাবনা নেই, তা ছাড়া কালো ঘোড়াটাও এই এলাকায় অপরিচিত।

বাসার ভিতর থেকে সুরেলা কণ্ঠে বিখ্যাত একটা প্রেমের গান ভেসে আসছে। দরজায় দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেন্ড গান শুনে দরজায় টোকা দিল সে। গান থেমে গেল। ভিতরে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দরজা খুলে গেল। নীনা নিজেই খুলেছে। দরজায় জাভেদকে দেখে তার চোখে মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল।

'কেমন আছ, নীনা?' মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে জিজ্ঞেস করল জাভেদ। 'অতিথি দেখে বিরূপ হলে না তো?'

মুহূর্তেই বিব্রত ভাবটা কাটিয়ে উঠল নীনা। একটু পিছনে সরে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল। 'এসো, ভিতরে এসো। একেবারে চমকে দিয়েছ আমাকে।'

'তোমার কিছু লোকজনকে দেখলাম একেবারে মারমুখো হয়ে আছে,' মন্তব্য করল জাভেদ। 'ভাবলাম, ওদের একটু ঠাণ্ডা হবার সময় দিই, আর তা ছাড়া আমাদের পরিচয়টাও একটু গাঢ় করে নেয়া যাবে এই সুযোগে।'

'তুমি ধরেই নিচ্ছ তোমাকে আরও ভাল করে জানার ইচ্ছে আমার আছে?'

'কেন, তা কি নেই নাকি?'

'জানি না,' হাতের ইশারায় ডিভান দেখিয়ে দিল সে জাভেদের বসার জন্য। 'তোমার এখানে আসার মত স্পর্ধা আছে দেখে অবাক হচ্ছি।"

'তোমার কি এরচেয়েও ভাল কোন জায়গা জানা আছে নাকি?' লঘু স্বরেই কথাটা বলে জানালা দিয়ে বাইরে রাস্তাটার দিকে নজর রাখা যায় এমন জায়গা বেছে নিয়ে বসল জাভেদ। 'কিছুটা সময় যখন আমাকে কাটাতেই হবে তখন একজন সুন্দরী মেয়ের সাথে কথা বলে সময় কাটানোর চেয়ে উপভোগ্য আর কী হতে পারে?'

জাভেদই কিছু একটা কথা তুলবে আশা করে চুপ করে অপেক্ষা করছে নীনা। ঘরের চারদিকটায় চোখ বুলিয়ে দেখল জাভেদ। ঘরটা বেশ বড়, ঠাণ্ডা পরিবেশ–ভালই, কিন্তু আরও সুন্দর করার প্রচুর অবকাশ রয়েছে। একপাশে একটা পিয়ানোও আছে–বারের বাইরে জাভেদ বহুদিন পিয়ানো দেখেনি।

'তোমার গানের গলা তো খুব সুন্দর, তুমি কি পিয়ানোও বাজাতে জানো?'

'অবশ্যই।'

'শোনাবে?'

'জাভেদ, তোমার যদি কোন কাজের কথা থাকে আমার সাথে তবে সেটাই বলো। তোমাকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনানোর কোন ইচ্ছে নেই আমার, তোমার এমন ছেলেমানুষী আবদারে অবাক হচ্ছি আমি।'

'আমরা এই এলাকায় ভাল গান-বাজনা শোনার সুযোগই পাই না,' নীনার অস্থিরতাকে পাত্তাই দিল না জাভেদ। 'বিশেষ করে পুরোনো ইটালিয়ান গান তো মোটেই শুনি না।'

'তুমি জানো ওই গানটা?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল নীনা।

'পশ্চিমের কাউ-বয় আমরা–অনেক দেশ ঘুরে এসেছি,' জবাব দিল সে, 'পশ্চিমের বেশির ভাগকেই তুমি দেখবে গরু-মহিষ ছাড়াও আরও অনেক কিছু জানে।' একটু থামল সে, 'আচ্ছা নীনা, তুমি এদিকে কেন এলে বলো তো?'

'কারণ এখানে আমার নিজের জমি আছে,' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল সে। 'এ ছাড়া আর কী কারণ থাকবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল জাভেদ। 'তাই ভাবছিলাম। সাধারণত যাদের ভাল র‍্যাঞ্চ আর এতগুলো পশু আছে তারা নিরুপায় না হলে জায়গা ছেড়ে নড়ে না। ভাবছি তোমরা কেন এলে, আর কেনই বা তোমাদের লোকজন গরু-মহিষের চেয়ে বন্দুকের সাথে বেশি পরিচিত।'

দরজার দিকে চাইল নীনা। বাসায় একাই আছে সে। মেক্সিকান রাঁধুনি মেয়েটা ছাড়া আর কেউ নেই। দ্রুত চিন্তা করছে নীনা, কোন ফন্দি করে তার কিছু কর্মচারীকে এখানে হাজির করা যায় কিনা। জাভেদ ঠিকই আন্দাজ করেছে, ওরা আর যেখানেই খুঁজুক এই বাড়িতে তাকে কিছুতেই আশা করবে না। তার প্রতিটি কার্যকলাপ আর মন্তব্যেই আরও চিন্তিত হয়ে উঠছে নীনা। সে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে যে জাভেদ লোকটা নেহাত সাধারণ মানুষ নয়।

'গভর্নরকে একটা চিঠি দিয়েছি আমি,' বলল সে।

আড়ষ্ট হয়ে গেল নীনা। 'কী বললে?'

'গভর্নরকে চিঠি দিয়েছি আমি। সান্তা ফের ওরা চেনে আমাকে–ওদের লিখে জানিয়েছি আমি এখানে কী ঘটছে।'

ভয় পেয়েছে মেয়েটা। বুঝতে পারছে, এবার তারা ভাল মতই ফেঁসেছে। ওরা যখন পশ্চিমে আসার জন্য তৈরি হচ্ছিল তখন অ্যালেক তাকে বুঝিয়েছিল যে জমিটার উপর তার ভুয়ো হলেও একটা দাবি আছে। কোন ঝামেলাই হবে না এতে, কারণ বর্তমানে জমিটা যে ভোগ করছে, তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলা হবে। সে অবশ্য সন্দেহ করেছিল যে অ্যালেকের নিউ মেক্সিকোর এই র‍্যাঞ্চে আসার পিছনে তার নিজস্ব কোন গূঢ় কারণ আছে, কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে আর বেশি ভাবেনি বা খোঁজখবর নেয়নি সে।

এখন যদি চিঠি পেয়ে ওরা টেক্সাসে অনুসন্ধান চালায় তবে সব ফাঁস হয়ে যাবে। তার এই ভয়ের কথা জাভেদকে বুঝতে দেওয়া চলবে না। এখন উপায়

মাত্র দুটোই আছে, হয় ভুলিয়ে ভালিয়ে নিজের দলে টেনে নিতে হবে, নইলে মেরে ফেলতে হবে ওকে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি গায়েব করে দেওয়া যায়—লোকজন কিছুদিন ওর ফিরে আসার অপেক্ষা করবে বটে কিন্তু কিছুদিন পরে সবাই নির্ঘাত ভুলে যাবে। পড়শীদের সাথে বন্ধুত্ব করে নিয়ে র‍্যাঞ্চ চালাতে তখন আর কোন অসুবিধাই হবে না।

'আমাদের মধ্যে এই বিরোধ না থাকলেই ভাল হত।' উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল নীনা। তার মাথার মধ্যে দ্রুত চিন্তা চলছে—একটা উপায় ভেবে বের করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে সে। 'সত্যি শক্ত মানুষ তুমি, জাভেদ।'

'সাধারণ লোক আমি।'

'না, সাধারণ তুমি মোটেও নও। অনেক রকম গুণই আছে তোমার। অন্য কোন পরিবেশে আমাদের আলাপ হলেই ভাল হত। পুরুষের মত র‍্যাঞ্চ চালাতে অভ্যস্ত আমি, আমার মত মেয়ের চোখে এমন সত্যিকার আকর্ষণীয় পুরুষ আর চোখে পড়েনি।'

কথাগুলো বলে ফেলে নীনা নিজেই উপলব্ধি করল, নিছক চাটুকারিতা করছে না—এগুলো তার মনের কথাই। ঘুরে জাভেদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নতুন চোখ আবার দেখল ওকে নীনা। এই মানুষটার সাথে আরও আগে দেখা হওয়া উচিত ছিল তার।

সুশ্রী চেহারা, দুঃসাহসীও বটে। অ্যালেকের সাথে জাভেদের মিল নেই কোথাও। অ্যালেক সব সময়ই কিছু একটা অভিসন্ধি নিয়ে থাকে। কেবলই বিনা খাটুনিতে টাকা উপার্জনের ধান্ধায় থাকে সে।

জানালার ধার থেকে জাভেদের দিকে এগিয়ে এল সে। একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, বাইরের রাস্তাটা এখনও খালি। 'আচ্ছা, জাভেদ, জীবনে কী চাও তুমি? মানে এই যে বেঁচে থাকা কাজ করা—শেষ পর্যন্ত কী চাও তুমি?'

'ওই র‍্যাঞ্চটাকে আমি সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাই। এটা যে কী রকম কঠিন কাজ হয়তো সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই তোমার। সমতল এলাকার মানুষ তুমি, ওদিকেও অনেক সমস্যা আছে, আর সেসব সমস্যার সমাধানও তোমাদের জানা আছে। কিন্তু এখানে নতুন নতুন উপায় আবিষ্কার করে নিতে হয় মানুষকে। সামান্য কয়েকটা পশু নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম আমি, অনেক খেটে, অনেক ঠেকে, শিখেছি কীভাবে শীতকালেও ওদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখা যায় বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিয়ে।'

'সত্যিই কি জীবন এখানে এত কঠিন?'

'শুধু কঠিন না, আরও খারাপ। চাইলে তুমি নিজেই এসে দেখতে পারো। তোমার লোকজন হয়তো এখন ভাবছে ওরা জিতে গেছে। কিন্তু আসলে আমরা ইচ্ছে করেই র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চলে গিয়েছি। আমরা জানি এই শীতে তোমাদের কী দুরবস্থা হবে, তোমাদের পশুগুলো সব মারা পড়বে, সর্বস্ব হারাবে তোমরা। তাই র‍্যাঞ্চ ছেড়ে দিয়েও নিশ্চিন্তে আছি আমি। তোমার বেশির ভাগ লোকজনও কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে, কারণ ওদের মধ্যে ম্যাট আর সামান্য দু'একজন ছাড়া র‍্যাঞ্চের কাজে কেউই অভ্যস্ত নয়। তবে বলা যায় না, কপাল ভাল হলে এবারে

শীতটা হালকাও যেতে পারে, তাতে কিছুটা রক্ষা পাবে তোমরা।'

ওর কথাগুলো যে কতটা সত্যি তার কিছুটা আঁচ নীনা পেয়েছে নিজের চোখে র‍্যাঞ্চটা দেখে। সত্যিই তার যথাসর্বস্ব জড়িয়ে আছে ওই পশুগুলোর মধ্যে, ওগুলো হারালে সবই হারাবে সে।

'খেয়াল করে দেখেছ তুমি ওই উপত্যকার মাঠগুলোর দিকে? এই দুই দিনেই মাঠের ঘাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখনও পুরো শীতকালটা তো পড়েই আছে সামনে।'

জাভেদকে কী করে সরানো যায়? চিঠির কথায় ভয় পেয়েছে নীনা। এই সম্ভাবনার কথা আগে তার মনেই আসেনি, অথচ এটাই আসলে তাদের বিপক্ষে সবচেয়ে বড় অস্ত্র। কিন্তু জাভেদ যদি কোন কারণে নিরুদ্দেশ হয় তবে জিকো আর মেয়েটাকে নিয়ে তেমন কোন ঝামেলা পোহাতে হবে না তার। সে আর অ্যালেক সান্তে ফি গিয়ে জাভেদের অবর্তমানে আইনের দিকটাও সামলে নিতে পারবে।

'আমাদের কি শত্রু হতেই হবে?' প্রতিবাদ করল নীনা, 'বন্ধু হতে পারি না?'

কাছে সরে এল সে, 'জাভেদ, তুমি বুঝতে পারছ আমার অনুভূতি? বাবা আমার জন্যে কেবল ওই জমিটুকুই রেখে গেছেন—ওটাই আমার সর্বস্ব।'

'আমি বুঝতে পারছি।'

আবেগ ভরা চোখে চাইল নীনা, তার ঠোঁট জোড়া সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে। 'জাভেদ, প্লীজ, তোমাকে বন্ধু হিসেবে পেতে চাই আমি।'

দুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠল জাভেদের চোখে। আমন্ত্রণ সত্ত্বেও নীনাকে বুকে টেনে নিল না সে। কিন্তু সরেও গেল না। 'আমিও শত্রু হতে চাই না তোমার। তুমি তোমার লোকজন নিয়ে সরে গেলেই সব ঝামেলা চুকে যায়।'

মুহূর্তে রাগে লাল হয়ে উঠল নীনার মুখ। একটু পিছনে সরে গেল সে। তীক্ষ্ণ একটা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। 'না, তা আমি করতে পারব না। আমার বাবার প্রতি অমর্যাদা আর বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে তাতে।'

ঘুরে আবার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল নীনা। ওর কাঁধের উপর দিয়ে চেয়ে দেখল জাভেদ রাস্তাটা এখনও শূন্য। হঠাৎ তার সন্দেহ হলো ওই মেয়েটাও হয়তো নজর রেখেছে রাস্তাটার উপর। তার মানে সে কাউকে আশা করছে।

মেয়েটা জানে যে কোন ছুতোয় কেউ না আসা পর্যন্ত ওকে আটকে রাখতে হবে তার। সে এখন ভাল মতই বুঝে নিয়েছে যে জাভেদকে হত্যা করা ছাড়া আর কোন গতি নেই।

না, আর কোন সন্দেহই নেই তার। কিন্তু তবু কথাটা ভাবতে গিয়ে মনে মনে হোঁচট খেয়ে চমকে উঠল নীনা। অপরিচিত কারও হত্যায় মত দেওয়া আর জেনেশুনে চেনা কোন মানুষকে খুন করার আদেশ দেওয়ায় অনেক তফাৎ। কিন্তু সোজা কথা হচ্ছে র‍্যাঞ্চটা চাইলে যেমন করে হোক জাভেদকে তার হত্যা করতেই হবে।

তার বাবা ছিল তার চেয়ে অনেক নরম প্রকৃতির। লড়াই বাধলে ইতস্তত করত সে। তার ছিল কথা বেশি, কাজ কম। কিন্তু নীনা তেমন ভুল করার মত

মেয়েই না—ওটা তার জমি, যে করেই হোক ওটা তাকে পেতেই হবে। র‍্যাঞ্চ দখল করে সে তার চোরাই পশুগুলোকে দূরের কোন উপত্যকায় লুকিয়ে রাখতে পারবে। অ্যালেকের মতে জাভেদ ওই সব জায়গাতেই তার পশুগুলোকে নিরাপদে লুকিয়ে রেখেছে। সরকারী অনুসন্ধান যদি চালানোও হয় ওরা চোরাই পশুর খোঁজ পাবে না কোনদিনই। নীনার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ থাকবে না।

টুপিটা হাতে তুলে নিল জাভেদ। 'এবার যেতে হয়,' বলল সে। সময়ের সাথে সাথে বিপদও বাড়ছে তার। নীনা যে তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন্ বিপত্তি ঘটাবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। তা ছাড়া তার লোকজনও যে-কোন সময়ে এখানে এসে হাজির হয়ে যেতে পারে।

এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল জাভেদ। দ্রুত চিন্তা করছে নীনা, কীভাবে ওকে আর একটু দেরি করানো যায়। হঠাৎ দরজার ফাঁক দিয়ে উঠানে পিস্তল হাতে লরেন্সকে দেখতে পেল সে। জাভেদ যেন চট করে পিস্তল বের করতে না পারে সেজন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে জাভেদের ডান হাত চেপে ধরল নীনা। লরেন্সের পিস্তল জাভেদের দিকে গুলিবর্ষণ করল। অল্পের জন্য বেঁচে গেল সে। গুলিটা ওর গা ঘেঁষে গিয়ে দরজায় লাগল। ডান হাত আটক হয়েছে দেখে বাঁ হাতে পিস্তলটা তুলে নিল জাভেদ। এরমধ্যেই দ্বিতীয়বার গুলি ছুঁড়ল লরেন্স। কিন্তু নীনার গায়ে লাগতে পারে এই ভয়ে এবারের গুলিটাও মিস হলো। গুলিটা আরও দূর দিয়ে গেছে এবার।

গুলি করল জাভেদ, সেই সাথে ঝাড়া দিয়ে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। ডান কাঁধে গুলি খেয়ে একপাশে ঘুরে গেল লরেন্স। ধাক্কার চোটে নীনা টলতে টলতে পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

গুলি খেয়ে হাত থেকে পিস্তল পড়ে গেছিল লরেন্সের। ঝুঁকে বাম হাত দিয়ে ওটা তুলতে চেষ্টা করছে সে। আবার গুলি করল জাভেদ। গুলিটা ওর বেল্টে পিতলের বকলেসে লেগে দিক পরিবর্তন করে লরেন্সের হাতের কিছুটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। একছুটে নিজের ঘোড়ার কাছে চলে এল জাভেদ।

বাড়ির ভিতর থেকে একটা রাইফেল গর্জে উঠল। ঝাঁপ দিয়ে ঝোপের উপর পড়েই গড়িয়ে সরে গেল জাভেদ। দ্বিতীয় গুলিটা ওর সামনেই ঝোপের ভিতর মাটিতে গিয়ে ঢুকল। গড়িয়ে যাবার সময়ে জাভেদের চোখে পড়ল জানালার ধারে দাঁড়িয়ে উইঞ্চেস্টারের লিভার টেনে আবার গুলি করার জন্য তৈরি হচ্ছে নীনা।

কালো ঘোড়াটা গুলির শব্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। রেকাবে পা গলিয়ে ঘোড়ায় চড়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সে-চেষ্টা বাদ দিয়ে সরাসরি লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল ও। ছুটন্ত ঘোড়ার উপর চলতে চলতেই সে ঝুঁকে পড়ে রেকাব গলিয়ে নিল পায়ে। রাইফেলের আরও একটা গুলি ওর মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। পুরো বেগে ঘোড়া ছুটাল সে স্যান সিদ্রো ট্রেইলের দিকে। কিন্তু একটু এগিয়েই সে দেখতে পেল প্রায় বারোজন লোক অর্ধচক্রাকারে ঘিরে ছুটে আসছে তার দিকে। ট্রেইল আর তার মাঝখানে রয়েছে ওরা।

কোন আশাই নেই জাভেদের। ঘোড়াটাকে পিছনের দুই পায়ে দাঁড় করিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটল সে সোজা পুব দিকে। বাড়ি থেকে আর একটা গুলির শব্দ হলো

জাভেদ ঘোড়া ফিরিয়ে বাড়ির কাছ ঘেঁষে যাবার সময়ে। সামনেই উত্তর-পূর্বদিকে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল খাড়া পাহাড়—পনেরোশো ফুট উঁচু। ওদিকে অনেক ফাটল আর খাঁজ আছে বটে কিন্তু জাভেদ জানে ওদিক দিয়ে তার পালিয়ে যাবার মত কোন পথ নেই।

দ্রুত দৌড়াচ্ছে ঘোড়াটা, কিন্তু এভাবে কতক্ষণ চলতে পারবে জানে না সে। এই ঘোড়াটাও তার নিজের ঘোড়াগুলোর মত দানা-খাওয়া ঘোড়া। পিছনের লোকগুলো এখন ঘন হয়ে পরস্পরের কাছাকাছি এসে গেছে। কেবল দুজন লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এগিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। জাভেদের ওদিক দিয়ে পালাবার পথ বন্ধ করার মতলবে আছে ওরা।

দূরের বড় বাঁকটার পিছনে হন্ডো ক্যানিয়ন। জাভেদ যদি ওই দুজন ওখানে পৌছবার আগে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে একমাত্র তবেই সে এই জাল থেকে বেরুতে পারবে। কিন্তু তা না হলেই আটকা পড়ে যাবে ও। ওই পাহাড়ের দিকে পিছু হটে গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওদের হয়তো ঠেকাতে পারবে জাভেদ—কিন্তু গুলি ফুরিয়ে গেলেই নিশ্চিত মৃত্যু হবে তার।

ঘোড়ার পেটে বুটের গোড়ালির খোঁচা দিয়ে তুফান বেগে ছুটল সে বাঁকটার দিকে। প্রবল বাতাসের ঝাপটা লাগছে ওর মুখে। বাতাসে হ্যাটটা মাথা থেকে খুলে গিয়ে থুতনির নীচে বাঁধা সুতোয় ঘাড়ের কাছে এসে উড়ছে। মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে কালো ঘোড়াটার, কিন্তু তবু সমান তালেই ছুটে চলেছে ও। পিছন থেকে মাঝে মাঝে গুলির শব্দ হচ্ছে, তবে ছুটন্ত অবস্থায় ওদের পক্ষে জাভেদের গায়ে গুলি লাগানো প্রায় অসম্ভব।

পিছনে একবারও চাইছে না সে। শুধু আড়চোখে নজর রেখেছে তার ডানদিক দিয়ে যারা আসছে তাদের উপর। খুব বেশি পিছনে আর নেই ওরা দুজন। ভীত খরগোশের মত লাফিয়ে ছুটে চলেছে কালো ঘোড়াটা, যেন টের পেয়ে গেছে পিছনেই স্বয়ং মৃত্যু তাড়া করে আসছে।

একটা গুলি মৌমাছির মত গুঞ্জন তুলে জাভেদের চুল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। চক্রাকারে ঘুরে ওরা দুজন এগিয়ে আসছে দ্রুত। আন্দাজ নিয়ে জাভেদ বুঝল তারই সাথে একই সময়ে ওরাও পৌছবে ওই বাঁকটার কাছে।

উপায় নেই দেখে পিস্তল বের করল জাভেদ। ছুটতে ছুটতেই সে কাছের লোকটার ঘোড়া লক্ষ্য করে পর পর তিনটে গুলি করল। হঠাৎ করে ঘোড়ার গতি ধীর হলো। ভয় পেয়েছে ঘোড়াটা। ওর গায়ে লাগেনি বটে কিন্তু ওর খুব কাছে দিয়েই বেরিয়ে গেছে একটা বুলেট। সামনের ঘোড়াটা গতি কমে যেতেই পিছনের ঘোড়াটা গুঁতো খেল ওর সাথে। ওরা টাল সামলে উঠতে উঠতেই বাঁক ঘুরে বেরিয়ে গেল জাভেদ।

হন্ডো ক্যানিয়নটা মুখের কাছে মাইলখানেক চওড়া হলেও ধীরে ধীরে সরু হতে হতে কানা গলিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। বাম দিক দিয়ে পাহাড়টা পেরিয়ে পশ্চিম ক্যানিয়নে পৌছতে পারলেই রক্ষা। চলতে চলতে এক জায়গায় পাহাড়ের ঢালটা একটু কম দেখে ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করল জাভেদ।

ঘোড়ার গতি কমে গেল। মাথার কাছে পৌঁছে পিছনের দু'পায়ে লাফাতে গিয়ে পিছলে গেল ঘোড়ার পা। লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে লাগাম ধরে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ের মাথার দিকে উঠতে শুরু করল জাভেদ। পিছন থেকে গুলির আওয়াজ হলো। গুলিটা ঘোড়ার পায়ের কাছে পাথরের উপর লাগল। পাথরের ছোট ছোট কয়েকটা টুকরো হুলের মত ঘোড়ার পায়ে বিঁধতেই ঘোড়া লাফিয়ে উঠে পাহাড়ের ওপারে চলে গেল—সাথে জাভেদও।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নিজের উইঞ্চেস্টারটা বের করে নিয়ে একটা পাথরের পিছনে শুয়ে পড়ল জাভেদ। নীচের লোকগুলোর দিকে রাইফেল তাক করেই ট্রিগার টিপে দিল সে। চিৎকার করে উঠল একটা লোক। ওদের লক্ষ্য করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটার পর একটা গুলি চালিয়ে যাচ্ছে জাভেদ।

একটা ঘোড়া ধরাশায়ী হয়ে অসহায় ভাবে পা ছুঁড়তে লাগল। আর একটা ঘোড়ার পায়ের কাছে গুলি লাগতেই লাফিয়ে উঠল সেটা, ভারসাম্য হারিয়ে ওর পিঠ থেকে পড়ে গেল সওয়ার। বেকায়দায় পড়ায় বাম পা'টা ফেঁসে গেল রেকাবের সাথে। ওকে মাটির উপর দিয়ে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে ছুট দিল ঘোড়াটা। অন্যেরা লাফিয়ে নেমে আড়াল নিল।

পিছু হটে ঘোড়ার কাছে সরে এল জাভেদ। ফেনা ঝরছে কালো ঘোড়াটার মুখ থেকে। পিঠটা ঘামে ভিজে উঠেছে—কাঁপছে সে। লাগাম ধরে ধীর পায়ে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল জাভেদ। সে জানে নীনার লোকজন ওই ঘোড়ায় টেনে নিয়ে যাওয়া লোকটাকে উদ্ধার করবে সবচেয়ে প্রথম—তারপর ওরা অন্য কোন পথ খুঁজে নিয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করবে। হয়তো আশা করবে জাভেদ সরে গেছে ওখান থেকে, কিন্তু ঝুঁকি নেবে না ওরা। একটা ঘোড়া মরেছে, একজন তো বটেই সম্ভবত দুজন আহত হয়েছে গুলিতে, আর যাকে ঘোড়া টেনে নিয়ে গেছে তার অবস্থাও খুব ভাল থাকবে না। এত কিছুর পরে আজকের মত ওরা হয়তো ফিরেই যাবে। তবে এতটা সৌভাগ্য আশা করছে না জাভেদ।

ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল সে। দুপুর হয়েছে। বেছে বেছে পাথরের উপর দিয়ে চলেছে ওরা যেন পায়ের ছাপ দেখে কেউ টের না পায় কোন্‌দিকে গেছে। অনেক দূর পায়ে হেঁটে এসে ঘোড়ায় চড়ল জাভেদ। এই এলাকায় কেউ আসে না। জায়গাটা একেবারে অপরিচিত ওর কাছে। জিকোর কাছে সে শুনেছে যে ওই ওজো ডেল ওসো পাহাড়ে একটা ঝর্ণা আছে। ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে ওটা খুঁজে পেয়ে যেতে পারে ও।

আধঘণ্টা পরে সত্যিই ঝর্ণাটা পাওয়া গেল। ঘোড়াকে পানি খাইয়ে বোতলে পানি ভরে নিল জাভেদ। পিছন দিকে চেয়ে দেখল কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ওরা পিছু নিয়ে থাকলেও বোঝা যাবে না দূর থেকে, কারণ পাথরের উপর দিয়ে আসবে বলে ধুলো উড়বে না।

পিস্তলে আবার গুলি ভরে নিল সে। পিছনে কেউ আসুক বা না আসুক সব সময়ে তৈরি থাকতে হবে তাকে। উত্তর দিকে রওনা হয়ে গেল জাভেদ। এদিক দিয়ে দরকার হলে উত্তর-পুবে ঘুরে জিকো আর জেনির কাছে পৌঁছতে পারবে ও। বিশ-পঁচিশ মাইল পুবে হচ্ছে রিও গ্র্যান্দে ক্যানিয়ন। ওটাই দুভাগে ভাগ হয়ে

ফ্রেজোল আর পেজারিতো ক্রীক হয়েছে। বিকেলের ঠাণ্ডা হাওয়া জাভেদের দেহের উপর দিয়ে বারবার তার শীতল পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে।

ঠাণ্ডা। খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। আরও উঁচুতে উঠতে হবে তাকে, সেখানে আরও ঠাণ্ডা। স্বেচ্ছায় কেউ এই বিজন এলাকায় আসে না। ঘোড়ার পিঠে কুঁজো হয়ে বসেছে ক্লান্ত জাভেদ। ঘোড়ার চলাতেও আগের সেই ক্ষিপ্রতা আর তেজ নেই।

ঘোড়া থেকে নেমে আবার হাঁটতে আরম্ভ করল জাভেদ। ক্রমেই আরও উত্তরে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। ছোট ছোট থোকায় পেঁজা তুলোর মত তুষার পড়তে আরম্ভ করল।

ঘোড়ার পিঠ থেকে ভেড়ার চামড়ার তৈরি কোটটা নামিয়ে পরে নিল জাভেদ। ওভার কোটটা পিছন দিক থেকে অনেক উপর পর্যন্ত চেরা, সুতরাং ওটা পরে ঘোড়া চালাতে কোন অসুবিধে হয় না ওর। কিন্তু ঘোড়ায় না চড়ে দ্রুতপায়ে হেঁটেই পথ চলতে লাগল সে। ডান দিকে একটা বিরাট খাদ। প্রায় খাড়াভাবে নীচে নেমে গেছে পাহাড়টা চারশো ফুট। নীচে দিয়ে একটা ছোট্ট ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে। রাতের মত আশ্রয় নেওয়ার জন্য একটা জায়গা খুঁজছে সে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে তবু এগিয়েই চলেছে জাভেদ। চলতে চলতে রাতের মত ক্যাম্প করার একটা জায়গা পেয়ে গেল সে। এমন কিছু না, পাহাড়ের মধ্যে গর্ত মত খানিকটা জায়গা। যা হোক, তুষার আর বাতাসের হাত থেকে কিছুটা রক্ষা পাওয়া যাবে।

দুটো বড় পাথর যেখানে মিলেছে তারই মাঝে আগুন জ্বালাল জাভেদ। গাছের তলায় আরও কিছু লতাপাতা দিয়ে বুনে ঘোড়াটার জন্য মোটামুটি একটা আশ্রয় তৈরি করে দিল। আগুনের তাপও ওখান থেকে কিছুটা পাবে ঘোড়াটা। গাছের শুকনো ঝরা পাতা কিছু কুড়িয়ে নিয়ে ঘোড়ার গা ডলে দিল সে। তারপর বাইরে পাথরের উপর থেকে তুষার সংগ্রহ করে আনল কফি তৈরি করার জন্য। বোতলের পানি এখনই খরচ করতে চাইছে না সে। ঘোড়ার পিঠ থেকে ফ্রেডের দেওয়া খাবার প্যাকেট, কম্বল আর গ্রাউন্ড শীট নামিয়ে নিয়ে ঘোড়ার গলায় চানার থলে ঝুলিয়ে দিল জাভেদ।

তুমুল তুষারপাত হচ্ছে—সেই সাথে সাগুদানার মত শিলাও পড়ছে। গ্রাউন্ড শীটের উপর কম্বল বিছিয়ে বিছানা করে তার উপর বসে কফি আর খাবার খেতে খেতে জাভেদ ভাবছে জেনি আর জিকোর কথা।

রাতের মধ্যে দুবার শীতে কাঁপতে কাঁপতে উঠে আগুনে কাঠ যোগাতে হয়েছে জাভেদকে। শেষের বার উঠে আর ঘুমাল না সে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। আগুনের ধারে উবু হয়ে আগুন পোহাতে বসল জাভেদ। বাইরে চারদিক পুরু তুষারে ঢেকে গেছে। তুষারে ওর পথ চলার সব চিহ্ন একেবারে মুছে গেছে। ওরা যদি এই পর্যন্ত ওকে কোনমতে অনুসরণ করে আসতে পারে তবে এর পর থেকে ওদের আর কোন অসুবিধাই হবে না।

ধীরে ধীরে দিনের আলো ফুটে উঠল। বুট পরে নিয়ে ঘোড়ার খাবার জন্য পানি গরম করে নিজেও কফি আর ঠাণ্ডা গরুর মাংস খেয়ে নিল। তারপর কম্বলটা আগুনে গরম করে ঘোড়ার পিঠে বিছিয়ে তার উপর জিন চাপাল।

রওনা হয়ে গেল জাভেদ। বাইরে পৃথিবীর চেহারাটাই একেবারে পালটে গেছে। সাদায় ছেয়ে গেছে চারদিক। ভাল পাহাড়ী ঘোড়া এই কালো ঘোড়াটা। খুব সাবধানে তুষারে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে ওটা। প্রায় ছয় মাইল পথ চলার পর হঠাৎ গাছের ভিতর থেকে বেরিয়ে তার চোখে পড়ল সামনেই পাহাড়ে ঘেরা একটা সুন্দর বিরাট মাঠ। জাভেদের কাছ থেকে প্রায় পাঁচশো ফুট নীচে ওই মাঠটা, স্প্রুস আর অ্যাসপেন ঝোপে ঘেরা–মাঝে মধ্যে একটা দুটো পাইন গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে। গ্রীষ্মে এটা চমৎকার একটা পশু চরবার জায়গা হতে পারে। জাভেদ উপর থেকে মাঠের পুরোটাই দেখতে পাচ্ছে, প্রায় বিশ মাইল লম্বা হবে ওটা। মনে মনে হিসাব করল সে, কমপক্ষে দেড়শো বর্গমাইল হবে এলাকাটা।

ঘোড়াটাও যেন এই নতুন আবিষ্কারে চমকে গেছে, প্রান্তরের দিকে কান দুটো খাড়া করে ঘুরিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে সে। কোন সন্দেহ নেই যে আগের দিনের বুড়ো ইন্ডিয়ানরা এই উপত্যকার গল্পই করত।

উপত্যকার কাছ ঘেঁষে নীচে নেমে এল জাভেদ। মাঠের মাঝে এগিয়ে গিয়ে দেখল ক্লিফের ধার দিয়ে বেশ উঁচু হয়ে তুষার জমলেও মাঠে শুধুমাত্র একটা পাতলা আস্তর পড়েছে। তুষার সরিয়ে সুন্দর সবুজ ঘাস দেখতে পেল সে। সুযোগ বুঝে কালো ঘোড়াটা মহা আনন্দে ঘাস খেতে আরম্ভ করেছে।

জাভেদের মনটা খুশিতে ভরে উঠল। এতদিন ধরে সে ঠিক এই রকমই একটা জায়গার খোঁজে ছিল। এখানকার ঘাসও নীচের অন্যান্য মাঠের চেয়ে অনেক ভাল। তার র‍্যাঞ্চটা এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল পশ্চিমে। সহজেই সে তার খামার থেকে পশু নিয়ে আসতে পারবে এখানে। একটা ছোট ঝর্ণাও আছে, ঠিক মাঝখান দিয়ে বইছে ওটা। অর্থাৎ এখানে পানিরও অভাব হবে না। যদি র‍্যাঞ্চের বিরোধ বেশিদিন স্থায়ী হয় তবে জাভেদ তার পশুগুলোকে এখানে নিয়ে এসে রাখতে পারবে।

রওনা হয়ে গেল সে।

গোপন আস্তাবলে পৌঁছে ঘোড়া বদল করে নিল জাভেদ। কাছেই একটা ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখে সে বুঝল তুষার পড়ার পরে জিকো এসেছিল এদিকে। চিহ্ন দেখে অনুসরণ করে এগিয়ে চলল জাভেদ। বিকেল হয়ে আসছে। জিকো আর জেনির ক্যাম্পের কাছাকাছি আসতেই রাইফেলে গুলি ভরার শব্দে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়াল সে। 'ভয় নেই, আমি,' চিৎকার করে জানাল জাভেদ।

'সেটা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি,' স্যান্ডির গলা শোনা গেল। রাইফেল হাতে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল সে। 'এসো, এসো, সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

লাগাম টেনে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ছুট লাগাবে কিনা একবার ভাবল জাভেদ। ওর দুপাশেই উঁচু পাহাড়, ছুটে পালাবার বিশেষ সুযোগ নেই। ঠাণ্ডায় জমে অবশ হয়ে আছে ওর হাত, নইলে পিস্তল বের করার চেষ্টা করতে পারত সে। ডান হাতের আঙুলগুলো বগলে চেপে ধরে গরম করে নেওয়ার চেষ্টা করল জাভেদ। সময় আছে এখনও, সুযোগও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। যতক্ষণ পিস্তল আছে ওর কাছে, সুযোগ থাকবে।

গুহাটার মধ্যেই রয়েছে ওরা। ম্যাটকে চিনতে পারছে সে, ওর পাশে বার্টকেও দেখা যাচ্ছে। কোন সন্দেহ নেই, ফাঁদে ধরা পড়েছে সে।

জিকো বসে আছে গুহার দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে। ওর হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। জেনিও রয়েছে ভিতরে, ওর হাত খোলাই রয়েছে–রান্নায় ব্যস্ত সে।

'আমি মনে মনে দোয়া করছিলাম যেন তুমি ফিরে না আস,' বলল জিকো।

'বাইরে খুব ঠাণ্ডা,' আড়ষ্টভাবে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল জাভেদ। 'বেশ বরফ পড়েছে।'

'জাভেদ,' বাধা দিয়ে বলে উঠল ম্যাট। 'পশুদের খাবার কোথাও লুকিয়ে রাখা আছে তোমার–আমি জানতে চাই সেটা কোথায়?'

'বলব না আমি।'

দাঁত বের করে কুৎসিত হাসি হাসল স্যান্ডি। 'ম্যাট, আমার হাতে ছেড়ে দাও ওকে, এক মিনিটে সব কথা বের করে নেব।'

চোখ তুলে ওকে একবার দেখল জাভেদ। 'সে সাধ্য নেই কারও,' বলল সে। 'আমার কাছ থেকে হাজার চেষ্টা করেও কিছুই জানতে পারবে না।'

উত্তরে কী যেন বলতে যাচ্ছিল স্যান্ডি, কিন্তু বিরক্তভাবে তাকে বাধা দিয়ে ম্যাট বলে উঠল, 'আমার আর করার কিছু নেই, জাভেদ, তোমার খেলা আর বাহাদুরি শেষ। তুমি যদি সহযোগিতা করো তবে হয়তো আমি ওদের অনুরোধ করতে পারি–কিন্তু তা না হলে বুঝতেই পারছ! তোমার মৃতদেহ উত্তরের যে কোন একটা নির্জন ক্যানিয়নে ফেলে আসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাদের।'

'একজন অতিথি এসেছিল এখানে,' মন্তব্য করল জিকো।

'তুমি চুপ করো!' ধমকে উঠল স্যান্ডি।

জেনি আন্দাজ করল কথাটা জাভেদের জানা দরকার। আগুনের পাশ থেকে মুখ তুলে সে বলল, 'সে বলে গেছে আবার আসবে।'

খেপে উঠল স্যান্ডি, 'তুমিও চুপ করো! পটপট কোরো না তুমি।'

আড়চোখে স্যান্ডির দিকে চাইল ম্যাট। 'যথেষ্ট হয়েছে এবার থামো স্যান্ডি কোন ভদ্রমহিলার সাথে এভাবে কথা বলা তোমার উচিত নয়।'

'কে ভদ্রমহিলা?' মুখের উপর জবাব দিল সে। 'ওই ছুঁড়ীটা? ও তো...'

কথা শেষ হলো না স্যান্ডির। আগুন থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে বাড়ি কষাল জেনি। লাফিয়ে পিছনে সরে গেল স্যান্ডি। কিন্তু তার আগেই গনগনে আগুনের বাড়ি পড়ল ওর মুখের উপর। আঘাত খেয়ে টলে উঠে পড়ে গেল স্যান্ডি। পোড়া গাল চেপে ধরে যন্ত্রণায় চিৎকার করছে সে।

উঠে দাঁড়াল জেনি। 'আমি তোমার জন্যে রান্না করে দিতে রাজি আছি, কিন্তু তাই বলে ওই ধরনের মন্তব্য সহ্য করতে রাজি নই।'

দুহাতে মুখ চেপে ধরে ককাচ্ছে স্যান্ডি। সেদিকে একবার চেয়ে ম্যাট বলল, 'ঠিক আছে, তোমার রান্না তুমি দেখো।'

আগুনের ধারে ফিরে গিয়ে রান্নার হাঁড়িটা নেড়েচেড়ে ভাল করে পাথরের টুকরোগুলোর উপর বসিয়ে নিল সে শক্ত করে। তারপর বলল, 'লুইস এসেছিল। সে জানিয়েছে যে চার্লি আর সে লোমা কয়োটিতে আছে।'

হঠাৎ চোখ দুটো সতর্ক হয়ে উঠল ম্যাটের। 'কী নাম বললে? লুইস ডিকেনসন? রেঞ্জার ছিল যে?'

'এক সময়ে রেঞ্জার ছিল সে,' ব্যাখ্যা দিল জাভেদ। 'আমার সাথেই কাজ করত, কিন্তু কাজ ছেড়ে দিয়ে একটা ব্যক্তিগত ঝগড়ার নিষ্পত্তি করতে গিয়েছিল।'

'ওরা এখানে কী করছে?'

'আমার বন্ধু ওরা। বললাম না, আমিও একসময়ে রেঞ্জার ছিলাম। আমি ট্যাসকোসার রেঞ্জারদের কাছে একটা চিঠি দিয়েছিলাম কয়দিন আগে।'

জাভেদ বুঝতে পারছে ব্যাপারটা ম্যাটের ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। গুহার মুখে জাভেদের ঘোড়ার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল সে কয়েক মিনিট। এক কোণে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে এখনও গোঙাচ্ছে স্যান্ডি।

ম্যাটের অজানা নেই, রেঞ্জাররা পরস্পরের আপদে বিপদে কেমন একজোট হয়ে সাহায্য করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর লুইস প্রসিদ্ধ লোক। রাইফেলে ওর অব্যর্থ নিশানার কথা কারও অজানা নেই। এ ছাড়াও পেজরা যাদের সাথে ঝগড়া আর মারপিট করে টেক্সাস ছেড়েছে, লুইস ওদের চাচাতো না মামাতো ভাই হয়। সে ওদের অনুসরণ করেনি তো? নাহ্, ব্যাপারটা মোটেই ভাল ঠেকছে না ম্যাটের।

'চার্লি কে?' প্রশ্ন করল সে।

'সে-ও আমার বন্ধু। বৎসর দুই আমরা একসাথেই ছিলাম। ও যদি এখানে আমাকে খুঁজে না পায় তুলকালাম কাণ্ড বাধাবে সে।'

'মোটে দুজনে আর কী করবে?' নীনার দলের একজন বলে উঠল

'ওদের যে-কোন একজনই তোমাদের সবার চামড়া ছিলে দরজার সাথে লটকে রাখতে পারবে—তাতে ওদের বিন্দুমাত্র ঘামও ঝরবে না,' বলল জাভেদ।

যতই ভাবছে পরিস্থিতি ততই জটিল হয়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে ম্যাটের। নীনা পেজকে সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছিল সে, তার উপর এসে জুটল অ্যালেক। সে আসার পর থেকেই ওদের ঝামেলার আর শেষ নেই—নিত্য নতুন ঝামেলা লেগেই আছে।

তুষারপাত আরম্ভ হয়ে গেছে, এখন পশুগুলোর খাবার জোটানো আর এক মাথা-ব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাভেদের শীতের জন্য জমানো খাবারগুলো ব্যবহার করতে না পারলে ওদের পশুগুলো একে একে সব অনাহারে মরবে। এতসবের উপর আবার জুটছে ওই রেঞ্জার দুজন।

ওরা যদি ফিরে আসে তবে ওদের খুন না করে কোন উপায় থাকবে না ম্যাটদের, কারণ ওরা এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে যার জবাব ওরা দিতে পারবে না।

'বর্তমান লড়াইয়ের কথা জানে ওরা?' জিকোকে জিজ্ঞেস করল ম্যাট।

'অবশ্যই, এই ব্যাপারেই এসেছিল ওরা,' জবাব দিল জিকো।

সেরকমই আন্দাজ করেছিল ম্যাট। লোমা কয়োটির কথা শুনেছে সে। কয়েকজন লোককে ওখানে পাঠিয়ে ওদের দুজনকে অ্যামবুশ করে মারার ব্যবস্থা করতে পারে সে, কিন্তু তাতে শেষ পর্যন্ত কোন্‌দিকে গড়াবে পরিস্থিতি? খুন করে

সমস্যার সমাধান করতে চাইলে খুনের সংখ্যাই কেবল দিনদিন বেড়ে যায়ে, সমস্যার সমাধান আর হয় না। বাইরের ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বিরক্ত ভাবে গাল বকল সে। অ্যালেকের সাথে তার একটা বোঝাপড়া করার সময় ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু সেটাও তার পক্ষে প্রীতিকর কোন ঘটনা হবে না।

ম্যাটের প্রতি নির্দেশ আছে জাভেদকে খুঁজে বের করে খুন করে একেবারে গুম করে ফেলতে হবে। এমনভাবে গুম করতে হবে যেন তাকে কেউ কোনদিন খুঁজে না পায়। কাজটা তার পক্ষে এখন খুবই সোজা, জাভেদ এখন তার হাতের মুঠোয়। কিন্তু লুইস আর চার্লির মত লোককে নিয়েই ঝামেলা–জাভেদকে হত্যা করলে আরেকটা বিবাদের সৃষ্টি হবে। সেটা আবার কতদিন চলবে কেউ বলতে পারে না। এতসব ঝামেলা নিয়ে কীভাবে মানুষ শান্তিতে খামার করতে পারে? তা ছাড়া এমন জায়গায় কেউ লাভজনকভাবে র‍্যাঞ্চ চালায় কীভাবে? জাভেদ অবশ্য বলে এটা সম্ভব, কিন্তু এ পর্যন্ত সে যা দেখেছে তাতে জাভেদ যে কী করে এখানে র‍্যাঞ্চ চালাচ্ছে তা ভাবতেই অবাক লাগে তার।

খাবারের প্রথম প্লেটটা জাভেদকে দিল জেনি। দ্বিতীয়টা দিল জিকোকে। জিকোর সামনে প্লেট নামিয়ে রেখে শান্তভাবেই তার হাতের বাঁধন খুলতে শুরু করল সে।

জিকো হাতের কব্জি দুটো ডলতে ডলতে আড়চোখে জাভেদের দিকে চাইল। নীরবে বসে আছে জাভেদ। বার্ট কোলের উপর রাইফেলটা আড়াআড়ি রেখে বসেছে। গুহার মুখের কাছ থেকে ফিরে এসে জেনিকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওর হাত থেকে খাবারের প্লেটটা নিল ম্যাট। গম্ভীর মুখে প্লেটের খাবারের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে খাওয়া শুরু করল সে।

জাভেদকে নিরস্ত্র করা হয়েছে বটে, কিন্তু তার অস্ত্রগুলো তার কাছেই দেয়ালের পাশে রাখা হয়েছে। জাভেদ যেন ওগুলো নেওয়ার চেষ্টা করে সেইজন্য হয়তো স্যান্ডি ইচ্ছে করেই ওর বেশ কাছে ফেলে রেখেছে অস্ত্রগুলো। স্যান্ডির প্রতিটি চাল চলনেই জাভেদের মৃত্যু লেখা আছে বুঝতে পারছে জাভেদ। আসলে ওকে মারা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প উপায়ও খোলা নেই ওদের। খুব সাবধানে নড়াচড়া করছে সে, সবসময়েই হাত দুটোকে সে ওদের চোখের সামনেই রাখছে। খেতে খেতে এখান থেকে পালাবার একটা উপায় ভেবে বের করার চেষ্টা করছে। বোকার মত চুপচাপ বসে থাকলে তার পরিণতি যে কী হবে তা খুব ভাল করেই বুঝতে পারছে জাভেদ।

উত্তরের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। জাভেদ বলল, 'এই রকম হাওয়া বইতে থাকলে তুষারের স্তূপ জমবে আর তোমাদের গরু-মহিষগুলো না খেতে পেয়ে মারা পড়বে।'

চেহারা বেজার করে জাভেদের দিকে চাইল ম্যাট, র‍্যাঞ্চের মানুষকে ওকথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দরকার পড়ে না। কোন মন্তব্য করল না সে।

জাভেদ তার খাওয়া শেষ করে আরও কফি খেল, তারপর তামাক বের করে সিগারেট বানাতে আরম্ভ করল। ওর হাত বাঁধা হোক এটা চাইছে না সে, সম্ভব

হলে জিকোর হাত দুটোও ছাড়াই দেখতে চায় সে, তাই ম্যাটকে কথায় ব্যস্ত রাখতে চাইছে ও। 'শোনো, ম্যাট, বাতাসের সাথে তোমাদের পশুগুলো যেদিকে যেতে চায় যেতে দাও–ওদের পিছু পিছু তোমরাও বিদায় নাও। এই লড়াই করে কী লাভ হবে তোমাদের? তোমরা যদি আমাদের সবাইকে মেরেও ফেলো তবু হেরে যাচ্ছ তোমরা। তোমরা এত জলদি পশুর খাবারের ব্যবস্থা কিছুতেই করতে পারবে না, সে-কথা তুমি নিজেও ভাল করেই জানো।'

একটু থেমে সিগারেটটা বানানো শেষ করে ঠোঁটে লাগাল জাভেদ। আড়চোখে চেয়ে দেখল সে সবচেয়ে কাছে যে পিস্তলটা রাখা আছে, সেটাও তার নাগালের বাইরেই। স্যান্ডি খাচ্ছে না, কাছেই বসে নিজের মুখে চর্বি ঘষছে। ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হয়তো ওর পিস্তলটা কেড়ে নিতে পারবে জাভেদ–কিন্তু তাতে ঝুঁকি অনেক বেশি।

'আমার বন্ধু দুজন ঠিকই ফিরে আসবে আবার, জানি আমি। তারা সরাসরি এসে ফাঁদে পা দেবে না। প্রচণ্ড লড়াই হবে আশা করেই আসবে ওরা, আর তার জন্য তৈরি হয়েই আসবে।

'তুমি হয়তো জানো, লোমা কয়োটিতে এই দেশের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আর দুঃসাহসী আট দশজন যোদ্ধা আছে, তোমাদের গরু-মহিষের ভাগ পাবে জানতে পেলে ওরাও আসবে সবাই লুইস আর চার্লির সাথে।

'জিম হারভিকে চেনো? টেনেসির লোক। সে-ও এখন লোমা কয়োটিতেই। জিকোকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো রাইফেলে দুর্দান্ত ওস্তাদ লোক সে। জিকোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু–এই লড়াইয়ে যোগ দেওয়ার জন্য সে এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে। নিজেই বুঝতে পারছ তোমাদের কিছু পশু যদি শীতের শেষে বেঁচেও থাকে, ওরা খেদিয়ে নিয়ে যাবে সব।

'আরও কথা আছে, ম্যাট; তোমাদের পশুগুলোর মার্কা যেন কেমন গোলমেলে। কেউ যদি ওগুলোর একটার ছাল ছাড়িয়ে উল্টো দিক থেকে মার্কা পড়ার চেষ্টা করে তখন কী মার্কা দেখা যাবে কে জানে?'

'চুপ করো!' রাগের মাথায় ধমকে উঠল ম্যাট। 'বড় বেশি বাজে বকছ তুমি!'

'আমি চুপ করাচ্ছি,' বলল স্যান্ডি। 'তুমি কেবল একবার বললেই হয়–একেবারে চুপ করিয়ে দেব আমি ওকে,' ফোলা ফোলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বিকৃত শোনা গেল ওর কথাগুলো।

আগুন জ্বলছে গুহার ভিতর পুরো মাত্রায়। বাইরে অবিরাম তুষারপাত চলেছে। এই অবস্থায় পালিয়েও লাভ নেই, সহজেই অনুসরণ করে ধরে ফেলবে ওরা। পালালে এমন ভাবে পালাতে হবে যেন ওরা টের পাবার আগেই পায়ের চিহ্ন তুষারে ঢাকা পড়ে যায়। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই এখন। পাথরে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল জাভেদ। জিকো প্রায়ই বলে, সত্যিকার ইন্ডিয়ানের মতই ধৈর্য তার। একটা ফন্দি এসেছে ওর মাথায়–জিকোর কথা ঠিক কিনা তার প্রমাণ শিগ্‌গিরই পাওয়া যাবে।

আগুনের আলো কেঁপে কেঁপে খেলছে ওদের মুখের উপর। রাইফেলের নল আর বেল্টের চকচকে ধাতুর উপর প্রতিফলিত হচ্ছে আগুনের আলো। বাইরে

নিঃশব্দে ঝরছে তুষার। বিষণ্নভাবে আগুনের দিকে চেয়ে বসে আছে ম্যাট। ওর ওই অভ্যাসটা খেয়াল করল জাভেদ। কেউ আগুনের দিকে চেয়ে থাকলে হঠাৎ করে অন্ধকারের দিকে চেয়ে সে কিছুই দেখতে পাবে না–অন্তত কিছুক্ষণ তো বটেই, এরচেয়ে বেশি আর কী চাই?

ওরা যদি এখনও জাভেদের লুকানো পশুর খাবার খুঁজে না পেয়ে থাকে, তবে আর ভবিষ্যতে যে পাবে এমন আশা কম। গিরিপথগুলো এখন তুষারে বন্ধ হয়ে থাকবে। জাভেদ জানে কোথায় বেশি তুষার জমে, আর কোন্ পথে ওখানে পৌঁছানো যায়। এই চার বৎসরে দক্ষ জেনারেলের মত সবকিছু লক্ষ করেছে, আর সেগুলো কাজেও লাগাচ্ছে সে।

বার্ট দেয়ালে হেলান দিয়ে ওর ঘোড়ার জিনটাকে বালিশ বানিয়ে আরাম করে বসেছে। সামান্য নাক ডাকছে তার মাঝে মাঝে। স্যান্ডি আহত কুকুরের মত জেনির দিকে চেয়ে আছে নীরবে। জাভেদ আগুনে একটা সরু কাঠ গুঁজে দিয়ে ওটার দপ করে জ্বলে ওঠা দেখল। সে আন্দাজ করে নিয়েছে, তাকে খুঁজে বের করে খুন করার নির্দেশ ম্যাটকে দেওয়া হলেও সেটা কার্যকর করার মত মানসিকতা বা সাহস কোনটাই ওর নেই। বিশাল লোকটা ভাল পশুপালক, লড়াইয়ে সে হয়তো মানুষ হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হবে না, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে মারতে সে পারবে না। খুনী নয় সে।

এক্ষেত্রে পালাতে চেষ্টা করলে মারা পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। এত কাছে থেকে গুহার মধ্যে গোলাগুলি চললে যে কেউ মারা পড়তে পারে। জেনিও বিপদের মুখে থাকবে। ওর হাতে জ্বলন্ত কাঠের বাড়ি খেয়ে খেপে আছে স্যান্ডি। সুযোগ পেলে ছাড়বে না সে।

একটানা তুষার পড়েই চলেছে। জাভেদ বুঝছে সারারাত এমন তুষার পড়লে ওদের পক্ষে এই ক্যানিয়ন ছেড়ে বেরুনো অসম্ভব না হলেও খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

বাতাসের একটা ঝাপটা এসে ঢুকল গুহার ভিতরে। আগুনের একটা ফুলকি বাতাসে ঘোড়ার খাবারের ছালার কাছে উড়ে গিয়ে পড়ল। উঠে আগুনটা নিভিয়ে ফেলল জিকো। রাত গভীর হয়েছে।

অস্থির হয়ে উঠে গুহার মুখে গিয়ে দাঁড়াল ম্যাট। বাইরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'এই ক্যানিয়নে তুষার কত ফুট পর্যন্ত গভীর হয়?'

'এখানে?' কাঁধ ঝাঁকাল জাভেদ। 'এই রকম তুষারে মাঝে মধ্যে বাতাসে ঠেলে আট-দশ ফুট উঁচু স্তূপও তৈরি করে ফেলে, তবে সাধারণত এর চেয়ে কমই হয়। শীতকালে বিশ ফুট পর্যন্ত তুষারের স্তূপও জমে। এ ছাড়া পাহাড়ের চূড়া থেকে বড় বড় ধসও নামে।

ক্লান্ত দেহে পাথরের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে গা এলিয়ে দিল জাভেদ। দেহ ক্লান্ত হলেও মনটাকে সজাগ রেখেছে সে, এই পরিস্থিতিতে মনটাকে সক্রিয় রাখতেই হবে তার। জিকো জেগে আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। ইন্ডিয়ান ইঙ্গিতে জাভেদ জানাল এখন বিশ্রাম নেবে সে। জিকোকে সামান্য মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাতে দেখল জাভেদ। নিশ্চিন্ত হয়ে নড়েচড়ে আরাম করে ঘুমাবার জোগাড় করল সে।

চোখ বোজার আগে অস্ত্রগুলোর অবস্থান আর একবার ভাল করে দেখে নিল ও।

আগুন থাকা সত্ত্বেও ভিতরটা খুব ঠাণ্ডা। গুহাটা বেশি গভীর নয়। গাছ আর গুহার ছাদের তলায় জায়গাটা কিছুটা আড়াল পেলেও বাতাস বাগ মানছে না। বারবার ঝাপটা মেরে ওদের কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কম্বলের তলায় গুটিসুটি মেরে ঘুমাচ্ছে জাভেদ, আর মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে উঠে বাইরে বাতাসের শব্দ আর আগুনে কাঠ পোড়ার পটপট আওয়াজ শুনছে কান পেতে। থেকে থেকে জিকোর শুকনো ডাল ভেঙে আগুনে দেওয়ার শব্দও কানে আসছে তার। কেউ বলে না দিলেও আগুনটাকে জিইয়ে রাখার দায়িত্ব নিজের কাঁধেই নিয়েছে জিকো। কেউ এতে আপত্তিও করেনি। আসলে সাহায্য করাটা ওর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এই অছিলায় নিজের কিছুটা স্বাধীন চলাফেরার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে নিচ্ছে সে–সময়ে এটা কাজে লাগতে পারে তার।

একটুও ঘুমায়নি ম্যাট। কিছুক্ষণ বসে আগুনের দিকে চেয়ে, আর বাকি সময় পায়চারি করে সময় কাটাচ্ছে সে। ওর অস্বস্তিটা উপলব্ধি করতে পারছে জাভেদ, তিন হাজার আধপেটা পশুর দায়িত্ব ওর কাঁধে। খিদের জ্বালায় ওরা যে-কোন দিকে হাঁটা ধরতে পারে।

আড়চোখে জেনির দিকে চাইল জাভেদ। কাছেই ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে জেনি। ঘুমাচ্ছে না। বড় বড় নীল চোখে ওর দিকেই চেয়ে আছে। ওর দিকে চোখ রেখেই কম্বলের তলায় হাত দিয়ে কী যেন সরাল জেনি। কম্বলের ফাঁকে পরিষ্কার একটা পিস্তলের বাঁট চোখে পড়ল জাভেদের। ওর হাত সাথে সাথেই আবার অদৃশ্য হলো কম্বলের নীচে।

একটা পিস্তল!

সাবধানে চিন্তা করছে জাভেদ। জেনি যে কেমন করে কখন ওটা জোগাড় করেছে জানে না সে, কিন্তু এতেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে জেনিও সক্রিয়ভাবে চিন্তা করছে পালাবার কথা। ওই পিস্তলটা তার দরকার–কিন্তু ঠিক সময়ে, জায়গা মত পেতে হবে তাকে ওটা। এখনকার মত জেনির কাছেই ওটা নিরাপদ থাকবে, কারণ ওকে সার্চ করার সম্ভাবনা কম।

আবার ঘুমাতে চেষ্টা করেও কিছুতেই আর ঘুম এল না জাভেদের। তার ভেড়ার চামড়ার ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে নিল সে। 'তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও, জিকো,' বলল জাভেদ। 'আমি আগুনটা দেখছি।'

ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে স্যান্ডি লক্ষ করছে ওকে। ওর মুখটা কাঠের আঘাতে ফুলে ফোস্কাসহ একটা বিকট আকার ধারণ করেছে। চামড়ায় টান লেগে অসহ্য যন্ত্রণা হবে এই ভয়ে মুখের ভাব পরিবর্তন করতেও ভয় পাচ্ছে সে।

আগুনে দেওয়ার মত কাঠ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। জাভেদ তার গ্লাভস্ পরে নিয়ে গুহার মুখের কাছে এসে একটু থেমে বাইরে পা বাড়াল। পিছন দিক থেকে নড়াচড়ার সাথে সাথে পিস্তল কক করার শব্দ কানে এল তার। সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব দেখিয়ে সহজ ভাবেই সে শুকনো বড় গাছের ডালটা থেকে ছোট শাখাগুলো ভাঙতে শুরু করল। বড় ডালটা জাভেদই গুহার মুখে টেনে এনেছিল।

এটাই একমাত্র উপায় বলে মনে হয়েছে জাভেদের। দুজন ঘুমাচ্ছে, বাকিজন যদি একটু অন্যমনস্ক হয়—একটা সুযোগ করে নিতে পারবে সে। পালালে যদিও কোন অস্ত্র সাথে থাকবে না তার, কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। তার কেবিনের পাশের মেসাতে একটা রাইফেল আর তিনটে পিস্তল লুকানো আছে। স্যান অ্যান্টোনিও উপত্যকার কাছে আর এক জায়গায় লুকানো আছে একটা রাইফেল আর একটা বন্দুক। দু'জায়গাতেই যথেষ্ট খাবারও লুকানো আছে।

জাভেদ নিজে পালাতে পারবে এই উপায়ে। কিন্তু জেনির কী হবে? ম্যাট যতক্ষণ আছে স্যান্ডি রাগে ফুঁসলেও জেনির গায়ে হাত তোলার সাহস পাবে না—কিন্তু কোন কারণে ম্যাট কোথাও গেলে তখন কী হবে? তখন কে ঠেকাবে স্যান্ডিকে?

পরিস্থিতি বিবেচনা করে সত্যিই সমস্যায় পড়ল জাভেদ। আবার নতুন করে সমস্যাটা নিয়ে ভাবতে শুরু করল সে। এতক্ষণ তার বিশ্রামের দরকার ছিল. নিজেদের অবস্থাটা ভাল করে বুঝে নেওয়ার দরকার ছিল। দুটোই হয়ে গেছে. এখন যত জলদি এখান থেকে পালানো যায় ততই মঙ্গল। ম্যাট নিজেই স্বীকার করেছে জাভেদকে খুন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওকে। নিজে না পারলেও অনায়াসে সে ভোরবেলা স্যান্ডির উপর কাজ শেষ করার ভার দিয়ে নিজের ঘোড়ায় চেপে কেবিনে ফিরে যেতে পারে। বগলে করে অল্প কিছু কাঠ নিয়ে ভিতরে ফিরে এল জাভেদ।

ভোর হয়ে আসছে। শিগ্‌গিরই দিনের আলো ফুটবে। এখনও তুষার পড়ছে। ঘোড়া বা খাবার সাথে নেওয়ার কোন সুযোগ পাবে না ওরা, কাজেই সবচেয়ে কাছের ক্যাম্পটায় পৌঁছতে হবে তাদের সবচেয়ে প্রথম। এই তুষারের ভিতর তুষারের জুতো পরে পায়ে হেঁটেই ঘোড়ার চেয়ে তাড়াতাড়ি চলা সম্ভব।

স্নো-শু।

এগুলো নিজেই তৈরি করে নেওয়া যায়। অনেক আগে এক বুড়ো ইন্ডিয়ান তাকে শিখিয়েছিল কী করে ওই জুতো বানাতে হয়। ওই জুতো ঠিক তাড়াতাড়ি চলার জন্য নয়, তুষারে যেন মানুষ ডুবে না যায় সেই জন্য।

প্রথমে ওদের খুব জলদি পথ চলতে হবে, অন্তত ক্যানিয়নটা পার না হওয়া পর্যন্ত। ক্যানিয়নের নীচে প্রায় চার ফুট মত তুষার জমেছে—কোন কোন জায়গায় আরও বেশি। ঘূর্ণি হাওয়া কিছু জায়গায় বেশি তুষার নিয়ে জমিয়েছে। যাওয়ার সময়ে দ্রুত আর নির্দিষ্ট পথে চট করে সরে যেতে হবে ওদের।

আগুনের কাছে বসল জাভেদ। হাত দুটো আগুনে গরম করছে সে। বাম হাতের তালু নীচের দিকে করে হাত বাড়িয়ে আগুনের দিকে আরও নীচে নামাল ও। ডান হাত দিয়েও ঠিক একই ভঙ্গি করল, তারপর বাম হাতে আবার তাই করল। যে-কোন সাধারণ লোকের চোখে মনে হবে যে জাভেদ হাত সেঁকছে—কিন্তু আধা ইন্ডিয়ান জিকোর কাছে এর মানে ইন্ডিয়ান সঙ্কেত: 'হাঁটো'।

এক মিনিট পরেই সে আবার হাতের তালু উপরের দিকে করে তিন আঙুল দেখিয়ে অন্য হাতে জামার হাতাটা উপরের দিকে টানল।

আগুনের উল্টোদিকে বসা জিকোকে দেখে মনে হচ্ছে আধো ঘুমের মধ্যে

রয়েছে সে। চোখের কোণ দিয়ে জেনির দিকে চাইল জাভেদ। ওর দিকেই চেয়ে ছিল জেনি, চোখাচোখি হতেই সামান্য মাথা ঝাঁকাল সে। জাভেদ ভাবতেও পারেনি জেনিও ইন্ডিয়ান সঙ্কেতের অর্থ বুঝতে পারবে। নিশ্চয়ই জিকোর কাছ থেকেই এসব শিখেছে মেয়েটা ছেলেবেলায়।

হঠাৎ ম্যাট গুহার মুখের কাছে এগিয়ে গিয়ে বাইরেটা ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, 'বরফ পড়া থামার কোন লক্ষণ দেখি না। তুষারপাত থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করার মত খাবারও নেই আমাদের কাছে।' জাভেদের দিকে ফিরে সে জিজ্ঞেস করল, 'এখান থেকে তোমার র‍্যাঞ্চ কতদূর?'

'সরাসরি দক্ষিণে আট মাইল মত হবে।'

'খুব ঠাণ্ডা পড়েছে, একদিন চলার মত খাবারও নেই আমাদের সাথে, সবাই মিলে মরার জোগাড় হচ্ছে।'

'ঠিক তাই, যত দেরি করা যাবে ওই তুষার ততই পুরু হবে, আর এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া আরও অসম্ভব হয়ে উঠবে। কে জানে, হয়তো এখনই তা অসম্ভব হয়ে উঠেছে,' জবাব দিল জাভেদ।

'আট মাইল আর কী এমন পথ?' মন্তব্য করল স্যান্ডি। 'উল্টোভাবে হাতে হেঁটেই ওই পথ পার হওয়া যায়।'

ওর কথাকে কোন পাত্তা না দিয়ে জাভেদ ম্যাটকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কোন কোন জায়গায় তুষার জমে গাছের নিচু ডালের সমান উঁচু হয়ে গেছে এরমধ্যেই। তুষার উড়িয়ে নিয়ে স্তূপ করে ফেলার জন্যে বেশি বাতাসের দরকার হয় না এখানে।'

'আমিই যাব,' বলে উঠল ম্যাট। 'আমার ঘোড়াটাই সবচেয়ে ভাল আর তেজী, চেষ্টা করলে আমি যেতে পারব।'

জেনির দিকে চেয়ে রয়েছে স্যান্ডি। তার চোখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে। ম্যাট চলে গেলে স্যান্ডিই হবে নেতা। প্রথমেই জাভেদ আর জিকোকে মেরে ফেলবে সে। তারপর...। জাভেদ ওর চিন্তাগুলো স্পষ্ট পড়তে পারছে ওর মুখ দেখে। ম্যাট আর ওদের চোখের দিকে চাইতে পারছে না দেখে আরও বুঝতে পারছে যে ম্যাটও একই কথা ভাবছে।

'হ্যাঁ, একটা কথা বলছি, হয়তো শিগ্‌গিরই নিজেরাও টের পাবে, তোমরা যে ছোট টাট্টু ঘোড়া ব্যবহার করো টেক্সাসে, সেগুলো এখানে তুষারে একেবারেই অচল। এখানে দরকার শক্ত হাড় আর সবল পেশীওয়ালা মন্টানা ঘোড়া।'

'আমাদের যা আছে তাতেই কাজ চালিয়ে নেব আমরা,' জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নিজের ঘোড়া আনতে বেরিয়ে গেল ম্যাট।

একটু পরেই ঘোড়ার লাগাম ধরে টানতে টানতে ওটাকে গুহার মধ্যে নিয়ে এল সে। ওর পিঠের উপর থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলে একটা কম্বল বিছিয়ে জিন চাপাল। কম্বলটা গরম করে নেওয়ার কথা মনে পড়েনি ওর। ঘোড়াটা অস্থির ভাবে লাফালাফি শুরু করল। স্যান্ডির সাহায্য নিয়ে কোনমতে ঘোড়াটাকে জোর করে ধরে শান্ত করল ম্যাট।

'ওর পিঠে কম্বলটা বিছাবার আগে ওটা একটু গরম করে নেয়া উচিত ছিল,'

মন্তব্য করল জাভেদ। রাগের সাথে ঘুরে দাঁড়াল ম্যাট।

'বেশি জ্ঞান দান করার অভ্যাস তোমার,' ব্যঙ্গ করে বলল সে। 'যেন তুমি ছাড়া আর কেউ কোনদিন খামার চালায়নি!'

'চালাবে না কেন? তবে কথা হচ্ছে, কেউ শেখে, কেউ শেখে না,' হাসি মুখেই জবাব দিল জাভেদ।

ওর মনে হলো যেন রাগের চোটে ওকে মারতে আসবে ম্যাট। বিশাল দেহ লোকটা এক পা এগিয়েও এসেছিল ওর দিকে। হাসি মুখে ম্যাটের দিকে চোখ তুলে চাইল সে। একমুহূর্ত জাভেদের দিকে কটমট করে চেয়ে নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে গেল ম্যাট।

'একটা কথা কি জানো, ম্যাট? আমরা দুজনে একই পক্ষে কাজ করলে বেশ মিলত আমাদের।'

কোন জবাব দিল না ম্যাট—ঘুরেও তাকাল না। জাভেদ নিচু স্বরে আবার বলল, 'ভাবছি নিজের বিবেককে কী জবাব দেবে তুমি। আজ রাতে শান্তিতে ঘুম হবে তো তোমার?'

কথাটা শুনে কাজ করতে করতেই একমুহূর্ত একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ম্যাট। যখন ঘুরল, জাভেদ দেখল ওর মুখটা একেবারে সাদা হয়ে গেছে। জাভেদের দিকে ইচ্ছে করেই আর চাইল না সে, সোজা ঘোড়ায় উঠে স্যান্ডিকে বলল, 'তুমি আর বার্ট থাকো এখানে। আমি গিয়েই কিছু খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের এখান থেকে বেরুবার পথ করার জন্যেও লোক লাগিয়ে দেব আমি, ওরা তোমাদের জন্য পথ করে দেবে। আর বন্দীদের ওপর নজর রেখো।'

'নিশ্চয়ই!' দাঁত বের করে হাসল স্যান্ডি। 'নজর রাখব আমি। আদর যত্নের কোন ত্রুটি হবে না, অ্যালেক স্পষ্টই বলেছে ওদের কতটা যত্ন নিতে হবে।'

আর কথা না বাড়িয়ে তুষারের মধ্যেই রওনা হয়ে গেল ম্যাট। পাহাড়ের সরু ধার ধরে কিছুদূর গিয়ে কিছুটা সমতল জায়গা, ওখানে তুষার বেশি গভীর নয়। একশো গজ যাওয়ার আগেই সে টের পেল অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে তাকে।

ঘোড়াটা ধারের বাইরে পা দিয়ে হঠাৎ পেট পর্যন্ত ডুবে গেল তুষারের ভিতর। আরও নীচে ঢুকে যাচ্ছে। বেপরোয়া ভাবে লাফিয়ে তোলপাড় করে কোনমতে ওই সমান জায়গাটায় পৌঁছল ঘোড়া। লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে দক্ষিণে চাইল ম্যাট। এবড়োখেবড়ো কঠিন পথটার দিকে চেয়ে বিরক্তিতে মুখ বাঁকাল। এই প্রথম বারের মত মনে মনে ভয় পেল ও।

বাইরে খুব ঠাণ্ডা। গুহার ভিতর ঠাণ্ডাটা ঠিক টের পায়নি সে। বাতাস নেই বটে কিন্তু এরই মধ্যে ঘোড়ার গায়ে তুষার জমে বরফ হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। ম্যাট বুঝতে পারছে জাভেদ ঠিকই বলেছিল। ঘোড়াটা ছোট, সমতল এলাকার জন্য খুব ভাল হলেও এখানে আসলে দরকার ছিল পেশীওয়ালা বড় ঘোড়া টাট্টু ঘোড়াটার এইসব বড় বড় তুষারের স্তূপ পেরিয়ে অনায়াসে চলার শক্তি নেই। অসম্ভব ঠাণ্ডা পড়েছে, এখনও তুষারপাত চলেছে। এই এলাকায় ঠাণ্ডায় মানুষ মরাটাও বিচিত্র কিছু নয়।

কিন্তু ফিরে যাবে না সে। ওই গুহায় যা ঘটতে যাচ্ছে তা দেখার বিন্দুমাত্র

ইচ্ছে নেই ওর। অ্যালেকের ইচ্ছাতেই এমন হতে চলেছে, হয়তো নীনার ইচ্ছাও তাই, কিন্তু সে তো খুনী নয়–অনেকটা পালিয়েই এসেছে সে। স্যান্ডির কথা ভাবছে না ও। দুদিন পর্যন্ত খাবার না পাঠালেও ওদের এমন কোন ক্ষতি হবে না। দুজনের জন্য দুই দিন চলার মত যথেষ্ট খাবার গুহায় আছে।

হঠাৎ পিছন থেকে একটা গুলির শব্দ শোনা গেল। অস্পষ্ট শব্দ, কিন্তু অনেক দূর থেকে এলেও ওটা যে গুলির শব্দ তাতে কোন সন্দেহ নেই। বোঝা যাচ্ছে, মোটেও সময় নষ্ট করেনি স্যান্ডি।

পাঁচ

ঘুরেই গুলি করেছে স্যান্ডি। তাড়াহুড়ো করে গুলিটা করেছে সে। একটু আগে জাভেদ যেখানে ছিল সেখানে গিয়ে লাগল গুলিটা।

একেবারে বোকা বনে গেছে জাভেদ। এমনটা কখনও আশা করেনি সে। ওর ধারণা ছিল ওদের মারার আগে অন্তত কয়েক মিনিট বড় বড় কথা বলবে আর বাহাদুরি দেখাবে স্যান্ডি। কিন্তু সেসব কিছু না করে ঘুরেই সোজা গুলি করেছে সে। ক্ষিপ্রতার সাথে গুলি করলেও ঠিক জায়গা মতই গেছে ওটা।

আগুনে কাঠের জোগান দেওয়ার জন্য উবু হয়ে বসেছিল জাভেদ। বুলেটটা ওর মাথার উপর দিয়ে চলে গেল।

ডাইভ দিয়ে পড়ে জেনির হাত থেকে বাড়িয়ে ধরা পিস্তলটা নিয়ে একপাক গড়িয়েই গুলি করল জাভেদ।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

এত কাছে থেকে গুলি করেও স্যান্ডির মতই তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে মিস করল জাভেদ। কিন্তু তার দ্বিতীয় গুলিটা স্যান্ডির গলা ফুঁড়ে ঢুকে কানের একটু উপর দিয়ে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল।

নিজের সফলতা সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত ছিল স্যান্ডি। জাভেদকে শেষ করে তার মুখের বর্তমান অবস্থার জন্য জেনির উপর নির্যাতন চালিয়ে তার শোধ নেবে ভেবে ঘুরেই গুলি করেছিল সে। আর একমুহূর্ত পরেই এখন তার মুখ দিয়েই গলগল করে রক্ত পড়ছে, মরতে বসেছে ও। বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে চেহারা, কী ঘটছে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না স্যান্ডি।

যন্ত্রচালিতের মতই দ্বিতীয়বার গুলি করল সে। সোজা গিয়ে আগুনে ঢুকল বুলেট, চারদিকে আগুনের ফুলকি ছিটে পড়ল। তারপরেই তার হাতের আঙুল ফসকে পড়ে গেল পিস্তলটা। জাভেদের দিকে চেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত চোখে কী যেন বলার চেষ্টা করল–মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে তার বুঝে ফেলেছে সে।

হাঁটু ভাঁজ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল স্যান্ডি। মাথাটা আগুনের দিকে, পা দুটো রইল গুহার বাইরে তুষারের মধ্যে। তৈরি হয়ে পিস্তল হাতে ফিরল জাভেদ। সামনেই, বার্ট পড়ে আছে মাটিতে, মাথা থেকে রক্ত চুয়ে পড়ছে। একটা জ্বালানি

কাঠ তুলে নিয়ে ওর মাথায় আঘাত করেছে জিকো।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে জেনির মুখ। স্যান্ডির মৃতদেহের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে। 'কিছু গরম গরম খাবার দরকার আমাদের,' বলতে বলতে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল মেয়েটা। 'আমি...'

জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে বুঝতে পেরে জাভেদ চট করে এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেলল ওকে। কয়েক মুহূর্ত জাভেদের বুকে সেঁটে থেকে নিজেকে জোর করে সামলে নিল জেনি। 'আর একটু হলেই ঝামেলা বাধিয়েছিলাম,' বলল সে একটু অপ্রস্তুত ভাবে। 'এখন ঠিক হয়ে গেছে।'

এরই মধ্যে উইঞ্চেস্টারটা হাতে তুলে নিয়েছে জিকো। বলে উঠল, 'তোমার কি মনে হয় ম্যাট গোলাগুলির শব্দ পেয়েছে, জাভেদ?'

'পেয়েছে, তবে সে আর ফিরে আসবে বলে মনে হয় না আমার।'

এগিয়ে গিয়ে স্যান্ডির মৃতদেহটা পা ধরে টেনে বাইরে নিয়ে তুষার দিয়ে ঢেকে দিল জিকো। ফিরে এসে যাবার জন্য যা যা নেওয়া দরকার সব একে একে গুছাতে আরম্ভ করল সে।

বার্টের দিকে দেখিয়ে জাভেদ বলল, 'ওর জন্যে কিছু খাবার রেখে দাও। আমাদের কোন ক্ষতি করেনি ও। আমরা গুপ্ত ক্যাম্পে পৌঁছে অনেক খাবার পাব।'

নিজের জিনিসপত্রও গুছিয়ে নিয়ে রাইফেল আর পিস্তলের ম্যাগাজিনে গুলি ভরে নিল জাভেদ। তারপর তার 'বাওই' ছুরিটা হাতে করে বাইরে বেরিয়ে গেল গাছের কয়টা ডাল কাটতে।

চারটা ডাল কেটে নিয়ে আরও দুটো আনার জন্য আর একটা গাছের দিকে গেল জাভেদ। প্রত্যেকটা ডালই প্রায় সাতফুট লম্বা, মোটা থেকে ধীরে ধীরে একেবারে সরু হয়ে গেছে মাথার দিকে–ঠিক চাবুকের মত। ডালগুলো থেকে ছোট ছোট শাখাগুলো ছেঁটে ফেলে দিয়ে সাবধানে একে একে সেগুলোকে আগুনে গরম করল সে। সবগুলো গরম করা হলে চিকন দিকটা ঘুরিয়ে এনে গোড়ার সাথে বাঁধল। ওগুলো দেখতে অনেকটা গোল আকৃতির হলো।

কাঠামোটার উপর চামড়ার দড়ি দিয়ে বুনে মাকড়সার জালের মত তৈরি করল সে। জিকোও তার দেখাদেখি লেগে গেল কাজে। জেনি ব্যস্ত রইল রান্নার কাজে। খাবার তৈরি হতেই ওরা সবাই খেয়ে নিয়ে আবার কাজে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই বার্টের জ্ঞান ফিরে এল।

চোখ খুলে গুহার ছাদটার দিকে চেয়ে রইল সে একমুহূর্ত। তারপরে ঝট করে উঠে বসেই দুহাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরে বোকার মত এদিক ওদিক চাইল বার্ট। মাথার ভিতরটা দপ্দপ্ করছে।

জাভেদের উপর এসে ওর দৃষ্টি স্থির হলো।

'ঝামেলা করলে তোমাকেও ওখানে তোমার সঙ্গীর পাশে শুইয়ে রাখা হবে,' স্যান্ডির কবরটা দেখিয়ে বলল জাভেদ। 'আর সুবোধ বালকের মত চললে যাওয়ার সময়ে তোমার জন্যে দু'দিনের খাবার রেখে যাব আমরা। জ্বালানি কাঠও প্রচুর আছে এখানে, সুতরাং অসুবিধা হবে না তোমার। এই তুষারের মধ্যে এ জায়গা ছেড়ে যেতে চাইলে বুঝব তোমার মাথায় দোষ আছে।'

‘ওকে আমার কোনদিনই পছন্দ হত না,’ মাথা ঝাঁকিয়ে কবরের দিকে ইঙ্গিত করে বলল বার্ট।

‘ঠিক আছে,’ বলল জাভেদ। ‘তোমার সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই, তুমি ভাল থাকলে আমাদেরও ভালই পাবে।’

কোন জবাব না দিয়ে বার্ট আবার শুয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাল।

বিকেলের দিকে বেরিয়ে পড়ল ওরা। জাভেদ পথ দেখিয়ে আগে আগে চলেছে। সোজা দক্ষিণ দিকে এগুচ্ছে ওরা। স্নো-শুগুলো ওদের কেবিনের ধারে মেসার গুপ্ত-ক্যাম্প পর্যন্ত টিকলেই রক্ষা।

সহজ গতিতে চলেছে ওরা। শীতের দেশে ঠাণ্ডায় দিন কাটাতে গিয়ে মানুষকে অনেক কিছুই শিখতে হয়–জাভেদও শিখেছে। প্রথম কথা হচ্ছে কখনও ঠাণ্ডার মাঝে পথ চলতে গিয়ে ঘামতে নেই। কারণ ঘামলে সেই ঘাম কাপড়ের নীচেই বরফে পরিণত হবে গতি কমালে বা থামলে। ভিতরে যদি একবার বরফ জমে তবে তাড়াতাড়ি কোন আশ্রয়ে যেতে না পারলে মারা পড়বে নির্ঘাত।

এটাও শিখেছে যে খুব বেশি জামা-কাপড় পরতে নেই। ঢিলা পোশাক পরাই বাঞ্ছনীয়। এতে চামড়ার উপরে একটা গরম বাতাসের পরত আটকে থাকে, তাতে ঠাণ্ডা অনেক কম লাগে। এস্কিমোরা অনেক আগে থেকেই জানে এই চালাকি, উত্তরের ইন্ডিয়ানদেরও একথা অজানা নেই। মানুষ যে-কোন দেশেই সফল ভাবে বেঁচে থাকতে পারে যদি সে তার সাধারণ জ্ঞান আর শিক্ষাকে কাজে লাগায়।

খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। বাতাসটা নির্মল। সমুদ্র থেকে আট হাজার ফুট উপরে আছে ওরা। এই অবস্থায় বহু মাইল দূরের শব্দও বেশ পরিষ্কার শোনা যাবে। জাভেদ জানে, শীতই এই লড়াইয়ে তার সবচেয়ে বড় সহায়।

তাদের অনেক নীচে দিয়ে গভীর তুষারের সাথে লড়তে লড়তে কেবিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ম্যাট। এতক্ষণে নিশ্চয়ই তার বোঝা হয়ে গেছে জাভেদ যে-সব কথা বলেছিল তার প্রত্যেকটি সত্য। ওই ছোট টাট্টু ঘোড়াটা আর বেশিক্ষণ ম্যাটের মত ভারি ওজনের মানুষকে এই তুষারের ভিতর বইতে পারবে না। এরই মধ্যে পায়ে হেঁটে এগুতে বাধ্য না হলেও ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যে তার তাই করতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ভাল আবহাওয়া থাকলে ওই আট মাইল পার হতে দুই ঘণ্টার বেশি কোনমতেই লাগত না তার। কিন্তু বরফের মধ্যে তাকে যেদিকে তুষার কম গভীর সেই সব জায়গা বেছে নিয়ে এগুতে হবে। অনেক মাইল ঘুরে যেতে হবে। কপাল খুব ভাল হলে সে হয়তো রাত হবার আগে র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে পারবে।

হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। ধীর গতিতে আগে বাড়ছে জাভেদ ইচ্ছে করেই। কিছুদূর চলার ফলে শরীর কিছুটা গরম হওয়ায় এখন সহজ গতিতে চলতে আর কোন কষ্ট হচ্ছে না ওদের। এই এলাকাটা জাভেদের খুব পরিচিত, বেছে বেছে যে-সব জায়গায় তুষার কম জমেছে সেই সব উঁচু এলাকা দিয়ে সে সবাইকে দক্ষিণে নিয়ে চলেছে।

বাতাসের বেগ অনেকটা বেড়েছে এখন। আকাশটা এখনও মেঘাচ্ছন্ন ধূসর। আকাশ দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। উঁচু ঢিবি এলাকা ছেড়ে এবার নিচু

এলাকায় ঘন জঙ্গলে ঢুকল ওরা। বাতাস আরও জোরে বইতে আরম্ভ করেছে।

কতদূর এসেছে ওরা? পাঁচ, কি ছয় মাইল? এখন দিন অনেক ছোট, অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে আর বেশি বাকি নেই। তিন ঘণ্টা যাবৎ পথ চলছে ওরা।

'ঝামেলা হবে মনে হচ্ছে, জাভেদ,' হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে বলে উঠল জিকো। 'দেখেছ কেমন বাতাস উঠেছে?'

'শুধু শুধু কষ্ট করে লাভ নেই,' জবাব দিল জাভেদ। 'আমরা একটা ভাল জায়গা বেছে নিয়ে রাতের জন্যে আস্তানা গাড়ব।'

এগিয়ে চলল ওরা আবার।

বাতাস আরও বাড়ছে। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় ওদের মুখ লাল হয়ে উঠল। মনে হচ্ছে যেন নাক আর কান শীতে জমে পথে কোথাও পড়ে গেছে। ওগুলো আছে বলে মালুমই হচ্ছে না।

একটা বিশাল মরা গাছ উপড়ে পড়ে আছে দেখে আবার থেমে দাঁড়াল জিকো। গাছের গুঁড়িটা প্রায় সাত-আট ফুট চওড়া হবে। ওটা উপড়ে পড়ায় একটা উঁচু দেয়ালের মত সৃষ্টি হয়েছে।

বিনা বাক্যব্যয়ে জাভেদ আর জিকো জঙ্গল থেকে ছুরি দিয়ে ডালপালা কেটে এনে গাছের গায়ে একটা আশ্রয় তৈরি করে নেওয়ার কাজে লেগে গেল। মোটা মোটা কয়টা কাঠের টুকরো এনে আগুন জ্বালাবার একটা জায়গা করে নিল তুষারের উপরেই।

'আর কয়মাইলই বা বাকি ছিল?' বলে উঠল জেনি। 'একবারে ওখানে পৌঁছে নিলেই তো হত?'

'সেখানেও ঠাণ্ডার মধ্যেই ঘুমাতে হত আমাদের। অযথা ক্লান্ত হয়ে কী লাভ? ক্লান্ত মানুষই সাধারণত মারা পড়ে ঠাণ্ডায়। ঠাণ্ডার যাত্রীরা যদি সবাই এইকথা মেনে চলত তবে খুব কম লোকই মারা পড়ত।'

'কিন্তু ঠাণ্ডার মধ্যে ঘুমালে মানুষ জমে যাবে না?'

'একেবারে অবসন্ন দেহ না হলে সে সম্ভাবনা কম। শরীরের সব তাপ যদি চলার কাজেই খরচ হয়ে যায় তখন আর ঠাণ্ডার সাথে যুঝবার মত তাপ অবশিষ্ট থাকে না। তাই বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ার আগেই থামা উচিত। এমনও সময় গেছে যখন শূন্যেরও পঞ্চাশ ডিগ্রী নীচের তাপমাত্রায় বাইরে ঘুমিয়েছি আমি।'

আগুনের চারপাশে বসে ফুটন্ত গরম কফির সাথে মাংস খেলো ওরা। ডাল-পাতার তৈরি ছাদের উপর তুষার পড়ে বাতাস আর ঠাণ্ডা থেকে কিছুটা আড়াল করেছে ওদের। ক্যাম্পের বাইরে বাতাস মাটি থেকে তুষার তুলে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। আর এক কাপ করে কফি খেয়ে শেষ করার আগেই বাতাস ঝড়ের আকার নিল। সময় মত আশ্রয় নিয়েছে ওরা।

জাভেদের র‍্যাঞ্চে কেবিনের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে নীনা পেজ। ভীষণ ঠাণ্ডা। ভয় পেয়েছে নীনা। বাইরের চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা ওর ভিতরে। কেবিনটা আরামদায়ক আর গরম, কিন্তু ওর ভিতরের ঠাণ্ডা দূর হচ্ছে না। রাগ, ঘৃণা আর ভয়, সব মিলে ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে জমে গেছে যেন।

অ্যালেক বসে আছে তার পিছন দিকের টেবিলে। ম্যাট বসে আছে অ্যালেকের উল্টো দিকে। মাত্র কয়েক মিনিট আগেই এসে পৌঁছেচে বিশাল মানুষটা। ক্লান্তি আর অবসাদে প্রায় ভেঙে পড়েছে সে। পথ হারিয়ে সারারাত ধরে ঘুরেছে ও। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তুষারের মধ্যে চলার পর ঘোড়াটা পথেই মারা গেছে। কপালগুণে কয়েকটা গাছ পেয়ে তার আড়ালে আগুন জ্বেলে রাত কাটিয়েছে ও। ক্লান্তিতে টলতে টলতে কোনমতে র‍্যাঞ্চে এসে পৌঁছেচে ম্যাট। কীভাবে যে ঝড়ের রাতটা কেটেছে আর কেমন করেই বা সে শেষ পর্যন্ত খামারে পৌঁছেচে তা সে নিজেও জানে না।

'তা হলে খতম হয়েছে ব্যাটা,' অ্যালেকের সন্তুষ্ট কণ্ঠস্বর কানে গেল নীনার। কেন যেন ওর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। অকারণেই রেগে গেল সে।

'বিশ্বাস করি না আমি,' বলে উঠল নীনা। 'ওর লাশ না দেখা পর্যন্ত আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না জাভেদ মারা গেছে।'

'বোকার মত কথা বোলো না,' চোখ তুলে ওর দিকে চাইল অ্যালেক। ওর চোখ দুটো জানালা দিয়ে আসা আলো পড়ে চকচকে সাদাটে দেখাচ্ছে। 'স্যান্ডি নিজের হাতে মারতে চেয়েছিল ওকে–সুযোগ সে পেয়েছে। এরচেয়ে বেশি আর কী প্রমাণ দরকার?'

উঠে দাঁড়িয়ে জানালার ধারে এগিয়ে গেল অ্যালেক। 'এবার র‍্যাঞ্চ করা ছাড়া আর কোন কাজ থাকল না তোমার, ম্যাট। গরু-মহিষ দেখাশোনা করার জন্যে চারজন লোক দেয়া হবে তোমাকে।'

অবাক হয়ে ম্যাট ফিরে চাইল অ্যালেকের দিকে।

'আর অন্যেরা?'

'ওদের ব্যবস্থা আমি করব। তুমি চোখ কান বুজে থাকলেই চলবে।'

কথাটা নিজের মনে উল্টেপাল্টে ভেবে দেখল ম্যাট। বানান করে বলে দেওয়ার দরকার নেই–ইঙ্গিতটা ঠিকই বুঝেছে সে। অবশ্য অ্যালেকের মত লোকের কাছ থেকে এই রকমই একটা কিছু আশা করেছিল ও।

'সময় খুব খারাপ,' শান্ত ভাবেই বলল ম্যাট। 'তোমার ওই ফন্দি কাজে লাগালে বিপদ হতে পারে।'

মৃদু হেসে নায়কের মত জ্যাকেট সরিয়ে বেল্টের ফাঁকে দুই বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে দাঁড়াল সে। বলল, 'তুমি বুঝতে পারছ না, ম্যাট। এই র‍্যাঞ্চটা লোকালয় থেকে অনেক দূরে। উত্তরে রয়েছে অনেক ইন্ডিয়ান ট্রেইল–এখান থেকে সহজেই ডেনভার, লেডভিল বা অন্য ডজনখানেক জায়গার যে-কোনখানে যাওয়া যাবে। এই পথে যাতায়াতও করে না কেউ।

'মোট কথা একেবারে নিখুঁত। চট করে যে-কোন একটা মাইনিং শহরে গিয়ে সোনা লুট করে ঘুর পথে ফিরে আসতে পারব আমরা। একবার দেখেই আমি চিনেছি, আমাদের জন্যে একেবারে আদর্শ জায়গা এটা। সোনা হাতে নিয়ে বসে আছে ওরা আমাদের জন্যে। টাকা কামানোর এর চেয়ে সহজ উপায় আর নেই।'

'তোমার এই বুদ্ধি কাজে লাগবে না, জাভেদের কথা যদি সত্যি হয়, তবে একটা সরকারী অনুসন্ধান অবশ্যই চালানো হবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'বয়েই যাবে আমাদের, জানো তো জোর যার মুল্লুক তার। আমাদের সাথে কেউ লাগতে আসার সাহস পাবে না। জাভেদ নেই, আমরাও সময় মত খাজনা দিয়ে সৎ লোকের মত র‍্যাঞ্চার সেজে থাকব, চিন্তা কি আমাদের?'

'না।'

হঠাৎ নীনার গলা শুনে দুজনেই ফিরে তাকাল। অ্যালেক কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু নীনাই আবার বাধা দিল তাকে।

'না, অ্যালেক, আমি এতে রাজি নই।'

'তবে কী করবে তুমি? কোন বারে বার-মেইড্ হবে, নাকি রেস্তোরাঁর ওয়েট্রেস হবে? তোমার জন্যে তো আর কোন কাজ দেখি না আমি।'

চুপ করে রইল নীনা। তুষারের মধ্যে তার পশুর দল এদিক ওদিক চলে গেছে—বেশ কিছু মারাও পড়েছে সন্দেহ নেই। জাভেদের কথাই সত্যি। ওর কথাগুলো এমনভাবে অক্ষরে অক্ষরে ফলতে দেখে লোকটার উপর রাগই ধরেছে তার।

জাভেদের অনুপস্থিতিতে এখন সব রাগ গিয়ে পড়ল অ্যালেকের উপর। সে যে তাকে এতদিন বোকা বানিয়ে এসেছে তা বুঝতে আর বাকি নেই নীনার। অ্যালেকের এই র‍্যাঞ্চ দখল করা, জাভেদকে হত্যা করা, এসবে যে তার আপত্তি ছিল তা নয়, কিন্তু এখন সে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে সব কিছুর পিছনেই অ্যালেকের নিজস্ব আলাদা প্ল্যান ছিল। নীনার সাথে জড়িয়ে আসলে নিজের মতলব হাসিল করার তালেই ছিল অ্যালেক।

আগেও কয়েকবার নীনার মনে নানা সন্দেহ জেগেছে অ্যালেকের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া দিনগুলো সম্বন্ধে। এখন সে নিশ্চিত। উপায় নেই তার, হয়তো অ্যালেকের প্ল্যানে কাজ হতেও পারে। সবাই জানে, কলোরাডো আর নেভাডার মাইনিং শহরগুলোতে অনেক সোনা আছে। তা ছাড়া এটা একটা সম্পূর্ণ নিরাপদ আস্তানা। কেউ এদিকে আসলে বহুদূর থেকেই দেখা যাবে তাকে। হ্যাঁ, কাজ হতে পারে। খুব জলদি বড়লোক হবার খুব সুন্দর উপায়। ঝুঁকিও র‍্যাঞ্চ চালাবার প্রায় সমানই।

জাভেদ মরে গেছে। ওর উপর রাগ ছিল—ওকে ভয়ও ছিল নীনার। কিন্তু মরে গেছে সে। ভিতরটা কেমন যেন খালি খালি মনে হচ্ছে নীনার। অদ্ভুত অজানা একটা অনুভূতি। কারও সম্বন্ধে এমন করে ভাবেনি সে, অথচ সে নিজেই প্রথম জাভেদকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু এখন কেন যেন অন্তরের অন্তস্তল থেকে অনুশোচনা আসছে, মনে হচ্ছে যেন তার জীবন থেকে অমূল্য কিছু খোয়া গেছে।

জানালার ধার থেকে ওদের কথা শুনতে শুনতে ম্যাটের গররাজি ভাব বুঝতে পেরে নীনার নতুন করে মনে পড়ল, আগেও সে অনেকবার ওর ব্যাপারে অ্যালেককে সাবধান করেছে। আজ আরও ভাল করে উপলব্ধি করল, ম্যাটের উপর র‍্যাঞ্চের কাজ ছাড়া এদিক ওদিক অন্য কোন কাজ চাপালেই সে বিগড়ে যাবে।

কী হয়েছে নীনার? গত কয়েকদিনে কেমন করে যেন ধীরে ধীরে দলের নেতৃত্ব ওর হাত থেকে অ্যালেকের হাতে চলে গেছে। তার মানসিক অনিশ্চয়তার সুযোগে নীরবে চতুরতার সাথে কর্তৃত্ব নিয়ে নিয়েছে অ্যালেক। ওকে ঘৃণা করে নীনা। ওকে হাতের মুঠোয় রেখে ইচ্ছে মত চালিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নিতে পারবে ভেবেছিল সে। এখন দেখা যাচ্ছে সে-ই উল্টো নীনাকে ব্যবহার করছে নিজের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে। যাই হোক, একটা কিছু করা দরকার।

কিছু করারই বা দরকার কী?

চুপচাপ থেকে ওকে ডাকাতিগুলো করার সুযোগ দিলেও মন্দ হয় না। যখন যথেষ্ট টাকা জমবে তখন ওর ব্যবস্থা করার জন্য একজন বন্দুকবাজ ভাড়া করলেই চলবে। তারপর স্যান ফ্রানসিসকো, নিউ ইয়র্ক, প্যারিস, ভিয়েনা–আর অফুরন্ত টাকা।

এতে তার কোন ঝুঁকি নেই। যদি ধরা পড়ে চোটটা অ্যালেকের উপর দিয়েই যাবে। সে স্রেফ মানা করে দেবে যে এসবের সে কিছুই জানে না…নির্ঝঞ্ঝাট র‍্যাঞ্চার সে, আর ম্যাট তার ফোরম্যান...তার সরলতার সুযোগ নিয়েই অ্যালেক এইসব করেছে। হ্যাঁ, কাজ হবে এতে। গুছিয়ে কাজ সারতে পারলে সবকিছুই তার স্বপক্ষে চলে আসবে।

'ম্যাট,' এখন থেকেই তার প্রস্তুতি নিতে হবে। 'ঝড় থেমে গেলেই দুজন লোক নিয়ে আমাদের স্টক কী আছে না আছে ভাল মত খবর নেবে। আমাদের আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হবে সব।'

ম্যাট চলে গেলে পর নীনা এগিয়ে এসে টেবিলে বসল। অ্যালেক তার দাঁতে কামড়ে ধরা চুরুটটা রোল করে ঠোঁটের ডান কোণে এনে নীনার দিকে চেয়ে হাসল। আজ ওর মনটা খুব খুশি। অনেক দিন অপেক্ষার পর আজ সে বিজয়ী। এখন থেকে সে-ই চালাবে সবকিছু, হাবভাবে সে বুঝে নিয়েছে যে নীনাও মনে মনে তার কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছে।

'সামনের মাসের পাঁচ তারিখে সোনার একটা চালান যাবে লেডভিল থেকে ডেনভারে,' বলল সে। 'কিন্তু চালানটা ডেনভারে পৌঁছবে না।'

বুলেটটা ঠিক টেবিলের মাঝখানে আঘাত করে ঝনঝন শব্দে একটা গ্লাস ভেঙে বেরিয়ে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে টেবিলের উপর গুলির দাগটার দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে রইল নীনা।

দ্বিতীয় বুলেটটা বাতিতে লেগে ওটা উল্টে পড়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ল ঘরটাতে। চট করে উঠে একটা কম্বল দিয়ে কয়েকটা বাড়ি দিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলল অ্যালেক।

অন্ধকারে মেঝেতে উবু হয়ে বসল ওরা। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে নীনার। ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে ওদের দুজনেরই। ধোঁয়া, তেল আর কম্বলের পশম পোড়া গন্ধে বাতাসটা ভারি হয়ে উঠেছে।

'খুব বেশি চালাক তুমি,' ব্যঙ্গ করে বলে উঠল নীনা। 'অনেক মুরোদ তোমার, অ্যালেক! গর্দভ কোথাকার! জাভেদ বেঁচে আছে এখনও–আবারও ব্যর্থ হয়েছ তুমি। মরেনি জাভেদ!'

সাথে সাথে কোন জবাব এল না অ্যালেকের মুখে। অন্ধকারে হামাগুড়ির ভঙ্গিতে বসে রাগে আর অপমানে বুদ্ধি লোপ পেল তার। লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ে ওকে পিটিয়ে মেরে ঠাণ্ডা করতে ইচ্ছে করছে ওর। কিন্তু শত্রু ওর নাগালের বাইরে অন্ধকারে কোথায় আছে জানে না সে।

'হতেই পারে না!' প্রতিবাদ করল অ্যালেক। 'নিশ্চয়ই অন্য কেউ হবে। এ একেবারেই অসম্ভব!'

'কী চমৎকার তোমার প্ল্যানিং, কত নিখুঁত! কী করে যে তুমি পারো, ভেবে অবাক হই আমি।'

'চুপ করো!' নিচু ভয়ঙ্কর স্বরে ধমক দিল অ্যালেক। এর আগে কখনও ওর এমন বুক-কাঁপানো গলা শোনেনি নীনা। 'আমি বলছি ও ব্যাটা মরেছে। ওটা হয়তো ওর সাথের দো-আঁশলা জিকো বা অন্য কেউ হবে।'

অন্ধকারে অপেক্ষা করছে নীনা, দুরুদুরু বুকে আরও গুলির আশঙ্কা করছে সে। নিজের অবস্থাটা ভাল করে ভেবে দেখার অবকাশ হলো তার। অ্যালেকজান্ডারকে যে সে দুচোখে দেখতে পারে না তা এই প্রথম স্পষ্ট অনুভব করল ও। এর আগে সে কোনদিন এমন করে ভেবে দেখেনি, কারণ, সবকিছুই লেখা ছিল তার নামে–কর্ত্রীর আসন ছিল তার। অ্যালেকের ধার ধারবার কোন দরকারই ছিল না ওর। কিন্তু এখন ওর কথা মত চলতে গিয়ে তুষার ঝড়ে প্রায় সব স্টক হারিয়েছে সে–র‍্যাঞ্চটাও শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এখন সরাসরি অ্যালেকের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে সে। এখন একমাত্র ম্যাটই আছে, যে একমাত্র তার প্রতি অনুগত। এখন তার টাকা পয়সার অবস্থা খুব কাহিল, তাই অ্যালেকের সোনা হাতানো পর্যন্ত তার চুপচাপ থাকাই ভাল হবে। সে জানে স্টেজ-ডাকাতির সাথে তাকে কেউ কোনদিন জড়াবে না। আর ওই সব ডাকাতিতে তার প্রত্যক্ষ কোন হাত থাকছে না।

অন্ধকারে অপেক্ষা করছে ওরা। অ্যালেক এতক্ষণ দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসেছিল। অন্ধকারে বানানো সিগারেটটা এবার ধরাল সে।

'আমাদের করার কিছুই নেই,' বলে উঠল সে। 'লোকটা ওখানে ঠাণ্ডার মধ্যে চিরকাল কাটাতে পারবে না–ম্যাটের একদিনেই ঠাণ্ডার মধ্যে থেকে কী অবস্থা হয়েছিল তা তো নিজেই দেখেছ তুমি। ওর ফেরার পথ আটকে রেখে ওকে আমরা আজ না হলেও কাল মারার সুযোগ পাবই।'

'তুমি যে সব ইন্ডিয়ান ট্রেইল ব্যবহার করবে বলছিলে ডাকাতির জন্যে সেগুলো যদি ওর চেনা থাকে?'

'সেগুলো সব তুষারে ঢেকে গেছে এখন।'

'তা হলে তোমরাই বা ডাকাতি করার পর পথ চিনে পালাবে কী করে?'

কয়েক মিনিট চুপ করে রইল সে। তারপর বিরক্তির সাথে জবাব দিল, 'সে ব্যবস্থা আমরা করব।'

অ্যালেক খুব সতর্ক ভাবে প্ল্যান করে, কিন্তু কেউ তার প্ল্যানের দোষ ধরুক এটা সে চায় না। নিজের ভুল স্বীকার করতে সে একেবারেই নারাজ। তা ছাড়া লোক হিসাবে খুবই আশাবাদী সে–তার ধারণা ভাগ্য তাকে সব সময়েই সহায়তা

করবে।

তবু, সাময়িক ভাবে সে হয়তো জিতবে। নীনা উঠে জানালার উপর একটা কম্বল ঝুলিয়ে দিয়ে মোমবাতি জ্বালাল। তারপর একটা ঝাড়ু এনে ভাঙা কাঁচের টুকরোর সাথে নষ্ট বাতিটাও বাইরে ফেলল।

নীনা বসার ঘরে ফিরে এসে দেখল অ্যালেক নেই। জাভেদের চিন্তা আবার ঘিরে ধরল তাকে।

সে কি সত্যিই মারা গেছে? যতই চিন্তা করছে নীনা ততই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে এটা তার কাছে। খুব চতুর যোদ্ধা জাভেদ। তার বিশ্বাসই হচ্ছে না স্যান্ডির মত লোক তাকে মারতে পারবে।

কয়েকদিন কিছুই ঘটল না। সূর্যের তাপে কিছু কিছু জায়গা থেকে তুষার গলে সরে গেল। খুব খাটছে ম্যাট। ঘুরে ঘুরে সব জায়গা থেকে সে রিপোর্ট নিয়ে ফিরল। প্রথমে যতটা বিপর্যয় হয়েছে ভেবেছিল নীনা আসলে ওদের স্টকের ততটা ক্ষতি হয়নি। মাত্র কয়েকশো গরু-মহিষ মারা পড়েছে। কিন্তু তা হলেও পুরো শীতটা এখনও পড়েই আছে সামনে। তুষারপাত চলতে থাকলে হয়তো পুরো স্টকই হারাতে হত ওদের, কিন্তু কয়েকদিন ভাল আবহাওয়া থাকায় এখন কিছুটা রেহাই পাওয়া গেছে।

যে কয়জন লোককে অ্যালেক র‍্যাঞ্চের কাজের জন্য নীনার কাছে রেখেছে, গিরিপথ আর ট্রেইলগুলো বরফে আটকা পড়ায় তাদের এদিক ওদিক যাওয়া বন্ধ রয়েছে। সাধারণ র‍্যাঞ্চেই সবটুকু এলাকা একজনের পক্ষে চেনা দুষ্কর, আর জাভেদের র‍্যাঞ্চের তো কথাই ওঠে না। এরই মধ্যে কোথাও জাভেদ তার স্টক লুকিয়ে রেখেছে। সেখানে পশুর শীতের খাবারও জমা করা আছে।

অ্যালেক তার প্ল্যান নিয়ে ব্যস্ত। বাকি লোকদের সে তিনটে ভাগে ভাগ করে নিয়েছে। প্রত্যেক দলে ছয়জন করে লোক। তিনটে দলই এক সাথে আঘাত হানবে নিজ নিজ এলাকায়। তিনটে ভিন্ন এলাকা থেকে তারপর দ্রুত নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে ওরা। অনেক উত্তরের এলাকা ঠিক করা হয়েছে ওদের জন্য। তবে পথে দুটো র‍্যাঞ্চ পড়বে, যেখান থেকে ওরা নিজেদের ঘোড়াগুলো বদলে তাজা ঘোড়া সংগ্রহ করতে পারবে। র‍্যাঞ্চগুলোর মালিকেরা দুজনেই আইনভঙ্গকারী লোক। উত্তরে যতদূর সম্ভব লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে ট্রেইলগুলো খোলাই আছে। সুতরাং আবার নতুন করে তুষার না পড়লে ওদের ডাকাতি করে পালানো খুব একটা কঠিন হবে না।

ম্যাটকে চারজন লোক দেওয়া হয়েছে কাজের জন্য। নীনা ঘোড়ায় উঠতে যাবে এমন সময়ে ম্যাট এসে হাজির হলো তার কাছে।

'আমরা প্রায় সব জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি, মিস পেজ,' বলল সে। 'কিন্তু কোথাও জাভেদের মার্কার একটা পশুও চোখে পড়েনি আমাদের। আর ওর পশুর খাবার যে কোথায় লুকানো আছে তারও খোঁজ পাওয়া যায়নি।'

'তোমরা মনে হয় কেবল কাছাকাছিই খুঁজেছ,' বলল নীনা। 'একটা উপত্যকা বা মালভূমি থাকতেই হবে যেখানে গরু-মহিষ রেখেছে ও।'

'দক্ষিণ আর পশ্চিম দিক নদীর ওপার পর্যন্ত ভাল করে খুঁজে দেখেছি আমরা। ঠিক আছে, উত্তর আর পুবেই এবার খুঁজে দেখব।'

'তোমরা কোন চিহ্নই দেখতে পাওনি?' জিনের পেটি আর একটু শক্ত করে বেঁধে নিল নীনা। 'মানে লোকজনের পায়ের চিহ্ন?'

একটু ইতস্তত করল ম্যাট। 'বুঝতে পারছি আপনি কীসের কথা জিজ্ঞেস করছেন। আমি নিজেই আপনাকে বলব ভাবছিলাম, সেদিন কেবিনে যে লোকটা গুলি করেছিল তার পায়ের ছাপ খুঁজে বের করেছে বাড্।'

আগ্রহ নিয়ে ম্যাটের দিকে ফিরে দাঁড়াল নীনা। শোনার আগেই বুঝে নিয়েছে সে ম্যাট কী বলবে, তবু অপেক্ষা করল সে।

'জাভেদই ছিল ওখানে। দক্ষিণের ওই পাহাড়ের মাথায় এসেছিল সে। কিন্তু ও যে কীভাবে সবার অলক্ষ্যে ওখানে পৌঁছল সেটা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না আমি। ওর পায়ের ছাপ চিনি আমি–পায়ের ছাপ অনুসরণ করে মাইল দুই পশ্চিমে ওদের ক্যাম্প দেখে এসেছি আমি। খুব সুন্দর জায়গা–প্রচুর খাবারও আছে ওদের ওখানে।'

'ওদের, মানে?'

'ওরা তিনজন আছে। জাভেদ, জিকো আর সেই মেয়েটা।'

তা হলে স্যান্ডি ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু বার্টের কী খবর?

মনে মনে খুশিই হয়েছে সে জাভেদ বেঁচে থাকার খবর শুনে। জাভেদের মৃত্যু আসলে চায়নি সে। কিন্তু তাই কি? নাকি অ্যালেক ব্যর্থ হয়েছে বলেই খুশি হয়েছে সে?

'ম্যাট, তুমি বলছিলে ওদিকে একটা মাঠে আমাদের কিছু গরু চরতে দেখেছ তুমি। আরও পাঁচশো গরু-মহিষ তাড়িয়ে নিয়ে ওখানে রেখে এসো ঘাস খাবার জন্যে।'

মুখ তুলে নীনার দিকে চাইল ম্যাট। সে ঠিকই বুঝেছে নীনা কেন তাকে এই নির্দেশ দিয়েছে। নীনার পরবর্তী কথায় সে বুঝল ঠিকই আন্দাজ করেছিল সে।

'আমরা হয়তো আমাদের সবগুলো পশু বাঁচাতে পারব না এই শীতে, কিন্তু অন্য কোথাও নতুন করে শুরু করতে হলে কিছু পশু আমাদের বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।'

'ঠিক আছে,' পকেট থেকে তামাক বের করে সিগারেট বানাতে শুরু করল ম্যাট। 'আর কথাটা গোপন রাখতে হবে, এই তো?'

'ঠিক তাই।'

'শেরিফ বব কিন্তু ঘটে অনেক বুদ্ধি রাখে, অ্যালেক ওকে কেয়ার না করলে ভুল করবে।'

'অ্যালেকও ধুরন্ধর কম না,' এই প্রথম নীনা অন্য কারও কাছে অ্যালেক সম্বন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করল। 'কিন্তু আমার ধারণা, এবার ঘোল খেয়ে যাবে ও জাভেদের কাছে।'

'আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন আপনি,' বলল ম্যাট। 'গরুগুলো তাড়িয়ে নেয়ার ব্যবস্থা এখনই করছি আমি।'

ম্যাটের উপর আস্থা আছে নীনার। তার বিশাল কাঁধ ফিরিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল ম্যাট। সেদিকে চেয়ে নীন। ভাবল কারও উপর নির্ভর না করে কেবল নিজের উপর আস্থা রাখাই হয়তো সবচেয়ে ভাল। জাভেদ আর অ্যালেক পরস্পর মারামারি করে মরুক গিয়ে, সে মাঝখান থেকে নিজের স্বার্থ গুছিয়ে নেবে।

বার্ট এসে হাজির হলো। ঘোড়াটা প্রায় আধমরা দেখাচ্ছে, তার অবস্থাও তথৈবচ। র‍্যাঞ্চে নীনা একাই ছিল সে-ই প্রথম গল্পটা শুনল ওর কাছে। কীভাবে স্যান্ডি মারা গেছে আর কীভাবেই বা সে ভাগ্যক্রমে একটা হরিণ শিকার করে গত তিন-চারদিন লবণ ছাড়া সেই মাংস খেয়ে কাটিয়েছে, তার বিশদ বিবরণ দিল সে।

কেবিনে বসে গরম খাবার পেট ভরে খেয়ে কফিতে চুমুক দিতে দিতে সে বলল, 'একটা কথা না বলে পারছি না। ওই জাভেদ লোকটা! বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি সে। জিত হবেই এ বিষয়ে যেন সে নিশ্চিত। আমার ধারণা সে লোমা কয়োটিতে গেছে সাহায্যের জন্যে।'

এরপর ম্যাটের কাছ থেকে নীনা আগেই যা শুনেছে তাই আবার নতুন করে শুনল বার্টের মুখে। লোমা কয়োটির লুইস, চার্লি, জিম, সবার কথাই মনোযোগ দিয়ে শুনল সে।

ঠাণ্ডার মধ্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কম্বলের বিছানার আরাম ছেড়ে রাতের আগুনটাকে উস্কে দিয়ে আরও কাঠ চাপাতে উঠল জাভেদ। শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে কয়টা কাঠ আগুনে চাপিয়ে দিয়েই ঝট করে আবার কম্বলের তলায় ঢুকল সে। পাশের বিছানার দিকে চাইতেই দেখল জেনি ওর দিকে চেয়ে হাসছে।

'ঠাণ্ডা!' কৈফিয়ত দিল সে।

'বুঝতেই পারছি!' হাসতে হাসতেই বলল সে। 'যেমন ঠকঠক করে দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছিল তোমার তাতে তো আমার ভয়ই হচ্ছিল তোমার দাঁতগুলো বুঝি ভেঙে যাবে।'

'ঠাট্টা করছ? ঠিক আছে, আগামীকাল আগুন জ্বালাবার ভার থাকল তোমার ওপর–তখন দেখা যাবে!'

'রাতের বেলাই ওগুলো হাতের কাছে তৈরি রেখে ঘুমাব আমি। সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়েই কাজ সারব।'

'ফাঁকিবাজি বুদ্ধির তো কমতি নেই দেখছি!'

অল্পক্ষণের মধ্যেই আগুন থেকে লকলকে শিখা উঠে মেসার উপরের গুহাটা গরম করে তুলল। আসলে র‍্যাঞ্চ থেকে মাত্র মাইল খানেক দূরে এই গুহাটা। মেসার উপর থেকেই কেবল ঢোকা যায় গুহায়। জাভেদ নিজের হাতে খুঁড়ে বড় করে নিয়েছে ওটাকে। জাভেদের হাতের ছোঁয়ায় দুটো কামরা মত তৈরি হয়েছে–একটা বিরাট, অন্যটা সেই তুলনায় অনেক ছোট। আগুনের ধোঁয়া একটা চিমনির সাহায্যে গাছের শিকড় আর লতাপাতার ভিতর এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে কয়েক গজ দূর থেকেও সহজে ধোঁয়া দেখা যায় না।

গুহাটা মোটামুটি গরম হয়ে উঠতেই বিছানা ছেড়ে উঠে দ্রুত জামা-কাপড়

পরে বাইরে যাবার জন্য তৈরি হলো জাভেদ।

'উত্তরের ট্রেইলটার খবর কী?' জিকোকে জিজ্ঞেস করল সে। 'তোমার কি মনে হয় লোমা কয়োটির রাস্তা খোলা আছে?'

'কখন যেতে বলো আমাকে?'

'তুমি না, আমি।' এগিয়ে গিয়ে জাভেদ জানালার মত ঘুলঘুলিটার ভিতর দিয়ে বাইরেটা ভাল করে দেখে নিল। খুব খাড়া ধরনের পেঁচিয়ে ওঠা একটা পথ দিয়েই কেবল মেসার মাথায় ওঠা সম্ভব। কিন্তু ওটা দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে এটাই উপরে ওঠার পথ। জানালাটা দিয়ে ওই পথের বেশ কিছুটা দেখা যায়। 'তোমরা এখানেই থাকো-আমি যাব,' বলল জাভেদ।

'কিন্তু লোমা কয়োটির ওরা আমাকে চেনে,' প্রতিবাদ করল জিকো।

'লুইস চেনে আমাকে। চার্লিও চেনে। অন্যদের সাথে আলাপ করে নিতে পারব আমি। তা ছাড়া জেনির সাথে আমার এখানে একা থাকাটা ঠিক হবে না।'

'ভয় পাও?' প্রশ্ন করল জেনি।

'আমি?' ওর দিকে চেয়ে হেসে জাভেদ বলল, 'না আমি ভয় পাচ্ছি না, কিন্তু তোমার পাওয়া উচিত। আমরা দু'জনে এখানে একা থাকলে কী ঘটবে তার কি কিছু ঠিক আছে?'

'কিছুই ঘটবে না,' জবাব দিল জেনি। 'অন্তত আমি না চাইলে ঘটবে না।'

চোখে কৌতুক নিয়ে ওর দিকে চাইল জাভেদ। 'হয়তো তোমার কথাই ঠিক, হয়তো না। লোভ দেখিয়ো না, তবে হয়তো থেকেই যাব!'

বাইরের বড় ঘরটায় চলে এল জাভেদ। ঘোড়াগুলোকে খাওয়াল। খড়ের গাদার দিকে চেয়ে দেখল খড় আর বেশি নেই, তবে চানা অনেকই আছে। গোলা-বারুদ যা আছে এখানে তাতে গেটিসবার্গের যুদ্ধ আবার নতুন করে লড়া সম্ভব।

ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে জাভেদ তার অন্যান্য জিনিস-পত্র আনতে গেল ছোট ঘরটায়। জেনি বিছানা ছেড়ে উঠে কফি চাপিয়েছে আগুনে।

'অনেকদিন হলো আমাদের স্যান অ্যান্টোনিয়োর স্টকের কোন খোঁজখবর নেয়া হয়নি-চাও তো আমি খোঁজ নিতে পারি,' প্রস্তাব দিল জিকো।

জেনির দিকে চাইল জাভেদ। 'তা হলে তো জেনিকে একা থাকতে হয় এখানে, তুমি কি একা থাকতে পারবে, জেনি?'

'পারব,' প্লেটে করে এক টুকরো মাংস বেড়ে এগিয়ে দিতে দিতে বলল জেনি। 'একা থাকতে পারব-আর কেউ যদি জায়গাটা খুঁজে বের করেও ফেলে, তাকে ঠেকাতেও পারব।'

'পথ থেকে তুষার সরে গেছে,' মন্তব্য করল জিকো। 'আমরা কোন চিহ্ন না রেখেই নামতে পারব। আমার মনে হয় না কেউ এই জায়গাটা খুঁজে পাবে।'

দুটো ঘোড়া হাঁটিয়ে বাইরে বের করল ওরা। জাভেদ আবার ফিরে এল জেনির কাছে। ওর হাত থেকে খাবারের পোঁটলাটা নিয়ে ঘোড়ার পিঠে ঝোলানো ব্যাগে রাখল। 'সাবধানে থেকো,' নারীসুলভ সাবধানবাণী শোনাল জেনি।

ফিরে চাইল জাভেদ। এতসব অসুবিধার মধ্যে দিন কাটিয়েও জেনির সুন্দর চেহারাটা বিন্দুমাত্র মলিন হয়নি। বলল, 'তুমিও সাবধানে থেকো, জেনি। গুহা

থেকে বাইরে বেরিয়ো না, যদি বেরুতেই হয় তবে খাঁড়ির ধারে যেয়ো না। আর রাতের বেলা কোনরকম রান্না কোরো না।'

'হ্যাঁ, সে-ব্যাপারে তুমি আগেও সাবধান করেছ আমাকে, রাতে খাবারের গন্ধ অনেক দূর থেকেও পাওয়া যায়।'

'ঠিক তাই। ধোঁয়ার গন্ধে কিছু আসে যায় না কারণ ওদের আগুন থেকেও একই গন্ধ পাবে ওরা। কিন্তু খাবারের গন্ধ ঠিকই টের পাবে।

'ভয় নেই, রাতে রান্না করব না আমি।'

ঘোড়ার পিঠে ওঠার জন্য তৈরি হলো জাভেদ। হাত বাড়িয়ে আলতো ভাবে ওর জ্যাকেটের হাতা ছুঁয়ে জেনি আবার বলল, 'সাবধানে থেকো, জাভেদ।'

জাভেদ চেয়ে দেখল ওর চোখ ছলছল করছে। চট করে অন্যদিকে মুখ ফিরাল। কাঁদছে কেন মেয়েটা? সত্যিই মেয়েদের বোঝা ভার। এমনও না যে সে তার ঘনিষ্ঠ কোন আত্মীয়। ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে গেল সে নীচে নামার রাস্তার দিকে। ঘোড়াটা অভ্যস্ত পায়ে প্রায় নিঃশব্দেই নীচে নামতে শুরু করল।

নীচে পৌঁছে চারদিক আবার ভাল করে দেখে নিয়ে ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। একটু পরে জিকোও একই ভাবে জঙ্গলে ঢুকল। 'কেউ দেখেনি আমাদের,' উৎফুল্ল সুরে বলল জিকো।

মাথা ঝাঁকাল জাভেদ। অনিচ্ছাসত্ত্বেও গাছের ভিতর দিয়ে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে চলল সে। জেনিকে একা ফেলে যেতে মন সরছে না ওর। কতদিন যে মেয়েটাকে একা একা কাটাতে হবে তার কোন ঠিকঠিকানা নেই। অন্যান্য অনেক মেয়ের চেয়ে জেনির সাহস অনেক বেশি তার প্রমাণ পেয়েছে জাভেদ। অবাক লাগে তার ভাবতে, এত ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে জেনিকে অথচ প্রতিবাদে টুঁ শব্দটি করেনি সে। শক্ত ভাবেই সে তার কাজ করে গেছে।

ভাচে ক্রীকের থেকে যেখানে উত্তরের আর স্যান অ্যান্টোনিয়োর রাস্তা দুদিকে চলে গেছে সেখানেই জিকোর কাছ থেকে বিদায় নিল জাভেদ।

মহিষের চামড়ার ওভারকোট পরে জিকোকে বিশাল দেখাচ্ছে। বিদায় নেওয়ার সময়ে সে বলল, 'খুব সাবধান, জাভেদ, লোমা কয়োটির সব লোক কিন্তু বন্ধু নয়।'

'ঠিক আছে।'

'বিশেষ করে প্যাডি ম্যাকর্নি সম্পর্কে সাবধান–ব্যাটা আইরিশ, নিজেকে পিস্তলে ওস্তাদ বলে বড়াই করে। একটু মাতব্বরি ভাব আছে ওর।'

'তাই নাকি?' হাসল জাভেদ। 'তা হলে ওকে হয়তো লুইস এতদিনে ঠাণ্ডা করে ফেলেছে।' লাগাম হাতে তুলে নিল সে। 'লুইস কাউকে ছেড়ে কথা বলে না, একটু মেজাজীও।'

সেররো জারোসিটোর ধার ঘেঁষে উত্তর দিকে রওনা হলো জাভেদ। পুব দিকে মাত্র মাইল ছয়েক দূরে আছে একটা ঝর্ণা। ঝর্ণা পার হয়ে কয়োটি ক্রীক আরও তিন মাইল। তারপরে সেখান থেকে সোজা উত্তরে আরও মাইল সাতেক গিয়ে তবে লোমা কয়োটি। মোট প্রায় সতেরো আঠারো মাইল। পাঁচ ছয় ঘণ্টা লাগবে কপাল ভাল থাকলে।

উত্তরের হাওয়া বইছে, আকাশটা স্লেট রঙের হয়ে রয়েছে। জাভেদের ধারণা আবার তুষার পড়বে। কিন্তু তার ধারণাই ঠিক হোক, এটা চাইছে না। ঝড়ের পরে আর কেউ এই পথ ধরে যায়নি বোঝা যাচ্ছে। কিছু কিছু জায়গায় তুষার জমে শক্ত হয়ে রয়েছে। দুপুর হবার আগেই তার অন্তত দশ মাইল চলা উচিত ছিল কিন্তু সে ছয় মাইলও এসেছে কিনা সন্দেহ। একবার সে ঘন জঙ্গলে সহজ চলার পথ পাবে মনে করে তিন মাইল বেশি ঘুরেছে।

ঝর্ণায় ঘোড়াকে পানি খাইয়ে নিয়ে কয়োটি ক্রীকে পৌঁছে সে দেখল সেখানে অনেকখানেই পানি জমে বরফ হয়ে রয়েছে। পার হওয়া কঠিন হয়ে উঠল কারণ পার হতে গেলেই তাদের ভারে বরফের পাতলা স্তর ভেঙে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরের ঠাণ্ডা বাতাসে তার মুখ আড়ষ্ট হয়ে গেছে, হাতও অবশ হয়ে এসেছে।

বিকেলের দিকে শহরে পৌঁছল সে। সরু রাস্তাগুলো একেবারে জনশূন্য। উতে সেলুনে আর হোটেলটায় আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। একটা রেস্তোরাঁয়ও আলো জ্বলছে।

লোমা কয়োটিকে ঠিক শহর বলা যায় না। আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে আসা লোকজনের কারণেই এই শহরের উৎপত্তি। কোন আনন্দ উৎসবের আয়োজন কখনও হয় না এখানে। দুজন প্রসপেক্টর আছে এই শহরে, কিন্তু পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে প্রসপেক্টিং করার চেয়ে উতে সেলুনেই বেশির ভাগ সময় কাটে ওদের।

এখানকার লোকসংখ্যা তিরিশের বেশি কখনও ওঠে না। তিন-চারজন ছাড়া বাকি সবাই পুরুষ। একবারই মাত্র ওদের সংখ্যা পঞ্চান্নতে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু তা উতে যুদ্ধের সময়ে।

রাস্তার শেষ মাথায় একটা বিরাট ছাউনি। পড়া যায় না, এমন একটা নোটিশ ঝুলছে বাইরে। ওতে লেখা আছে এটা একটা আস্তাবল—ঘোড়াকে খাবার দেওয়া আর দেখাশোনা করা হয় ওখানে।

ওরই সাথে লাগানো বাড়িটায় টিমটিম করে একটা বাতি জ্বলছে। আর কোন আলো নেই সেখানে।

জাভেদ ঢুকতেই অন্ধকার থেকে কেউ একজন চেঁচিয়ে বলল, 'খড় চাইলে নিজেই নিয়ে যাও, অনেক আছে। কিন্তু ঘোড়াকে দানা খাওয়াতে হলে পঞ্চাশ সেন্ট খরচ পড়বে।'

'এত দাম চাইছ কেন?'

'দাম পঞ্চাশ সেন্টই পড়বে, ইচ্ছা হলে কেনো নইলে রাস্তা মাপো। ঝামেলা করতে চাইলে শটগান দিয়ে ভুঁড়ি ফুটো করে দেব।'

অফিস ঘর থেকে মাথা কেটে ফেলা শটগান হাতে করে বুড়োটা বেরিয়ে এল। লণ্ঠনটা তুলে ধরে জাভেদকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, সাবধানের মার নেই, বুঝলে না? ঘোড়াকে খড় খাওয়াও কোন পয়সা লাগবে না তোমার—কিন্তু চানা খাওয়াতে চাইলে একটু বেশি পয়সা দাবি করি আমি, কারণ যারা তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে তারাই ঘোড়াকে চানা খাইয়ে নিতে চায়। সাধারণত

বেশি পয়সা দেয়ার ক্ষমতাও তাদের থাকে।'

'আমি কারও কাছ থেকে পালাচ্ছি না। আমার বন্ধু লুইস ডিকেনসনের খোঁজে এসেছি আমি।'

'কোনদিন ওই নাম শুনেছি বলে মনে পড়ে না। অবশ্য নাম আমার খুব একটা মনেও থাকে না–তা ছাড়া নাম দিয়ে এই এলাকায় চেনা যায় না মানুষকে। এখানকার লোকজন প্রায় রোজই একবার করে নাম আর ঠিকানা বদলায়।'

'দক্ষিণের র‍্যাঞ্চের মালিক আমি। আমার নাম জাভেদ।'

চোখ ছোট করে ভাল করে জাভেদকে আবার দেখল বুড়ো। 'হয়তো র‍্যাঞ্চ আছে তোমার, হয়তো নেই, জানি না আমি, কিন্তু লোকের মুখে যা শুনেছি তাতে মনে হয় না বেশিদিন তোমার মালিকানা থাকবে।'

'আমি এখনও ওই র‍্যাঞ্চের মালিক, দশ বছর পরেও তাই থাকব,' ঘোড়ার জিন খুলে নামাতে নামাতে বলল জাভেদ। 'তুমি যদি কোন গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করো তবে ফিরে এসে তোমাকেই আস্তাবলে ঘোড়ার জায়গায় বেঁধে আগুন ধরিয়ে দেব।'

সভয়ে একটু পিছু হটে গেল বুড়ো। 'এটা আবার কী ধরনের কথা হলো? তোমার ঘোড়াই তো রাখছি আমি। বললামই তো আমি তোমার ঘোড়ার জন্যে যা চানা লাগে নিয়ে নাও। বলিনি আমি?' কথার সুর সম্পূর্ণ পালটে গেছে বুড়োর। 'তুমিই কি সেই লোক যার ওখানে জিকো কাজ করে?'

'হ্যাঁ, জিকো আমার সাথেই থাকে।'

'ঠিক আছে, আমি তোমার ঘোড়াকে ভাল করে দলাই-মালাই করে চানা খাওয়াচ্ছি। নতুন কাউকে খুঁজলে তাকে দুই সেলুনের একটাতে পেয়ে যাবে মনে হয়। তবে এই বুড়োর উপদেশ যদি শোনো, ভেগে যাও। সেলুনের ধারে কাছেও যেয়ো না আর–প্যাডিম্যাকনির আজ মেজাজ খুব খারাপ।'

দরজার সামনে এসে মাথা নিচু করে রেস্তোরাঁর ভিতর ঢুকতে হলো জাভেদকে। কাউন্টারে মোটাসোটা কঠিন চেহারার এক মহিলা দাঁড়িয়ে। জাভেদকে ঢুকতে দেখেই এক কাপ কফি এগিয়ে দিল সে। বলল, 'চাইলে খাওয়া পেতে পারো, কিন্তু আর কিছু চাইলে আগে থেকেই জানিয়ে রাখছি আজ রাতে আর তা পাওয়া যাবে না।'

'খেতেই এসেছি আমি।'

ওর দিকে চাইল মহিলা। 'আপাতত তাই চাইবে জানি। দেহ থেকে ঠাণ্ডা নেমে যেতে ঘণ্টাখানেক লাগবে, তখনই মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে অন্য চিন্তা।'

'মোটা একচাক মাংস হলেই আমি খুশি।'

'ভালুকের মাংসই খেতে হবে তোমাকে, আর কিছুই নেই। ঝড়ের পর থেকে আর গরুর মাংস এদিকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। ট্রেইল বন্ধ।'

নীরবে খাওয়া সারল জাভেদ। মহিলা সারাক্ষণ বকবক করেই চলল, জাভেদ মাঝে মধ্যে 'হুঁ' 'হাঁ' করে তাল দিয়ে গেল।

খাওয়া শেষ করে দাম মিটিয়ে দিল জাভেদ। মাথায় টুপি পরে নিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে মহিলা বলল, 'খুব তো সাধু পুরুষ সেজে বেরিয়ে যাচ্ছ, জানি

তোমাকে আবার আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তিনটে মেয়ে আছে–একজনের বয়স ষোলো আর দুজনের উনিশ।'

রাস্তা পার হয়ে উতে সেলুনে ঢুকল জাভেদ।

বারটা দশফুটের বেশি লম্বা হবে না। বড় বড় তক্তা পেতে বেঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। বারের পিছনের লোকটা প্রায় বারের সমানই লম্বা। দুজন লোক বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আরও কয়েকজন বসে আছে টেবিলে। জাভেদ ঢোকার সাথে সাথেই সবাই একবার করে চাইল ওর দিকে। নতুন লোক দেখে আবার ফিরে চাইল ওরা জাভেদের দিকে।

'হুইস্কি,' বারটেন্ডারকে অর্ডার দিল সে। 'অর্থাৎ, ওই নামে যা তোমরা বিক্রি করছ তাই!'

বিশাল লোকটা বারের পিছন থেকে ঝুঁকে বলল, 'আমাদের ড্রিঙ্ক তোমার পছন্দ না হলে খেয়ে কাজ নেই তোমার।'

'দাও, চেখে দেখি পছন্দ হয় কিনা?'

'না আগে বলতে হবে,' গোঁ ধরল বারের মালিক।

'ঠিক আছে,' বারে বসা লোকদের দেখিয়ে বলল। 'এই ভদ্রলোকেরা যখন পছন্দ করছে তখন ধরে নিলাম আমারও পছন্দ হবে। দাও।'

'দেখো, ভাল হচ্ছে না কিন্তু! আবারও তুমি আমার মাল সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছ। এটা আমিও পছন্দ করি না!'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে জাভেদের দিকে চেয়ে গ্লাস ভরতে গেল সে। গ্লাস ভর্তি করে জাভেদের সামনে এগিয়ে দিল।

গ্লাসে চুমুক দিল জাভেদ। মনে হলো আগুন গিলে ফেলেছে। গ্লাসটা নামিয়ে রাখল সে। 'এক ব্যারেল গাছের ডাল ভেজানো পানি, দুই আউন্স তামাক, একটু ফেনা তোলার জন্যে একটা সাবান, তিন গ্যালন অ্যালকোহল আর রঙ করার জন্যে কিছু গ্রীজউড, এই ফরমুলায় তৈরি। বিচ্ছিরি স্বাদ তো হবেই। উতেদের কাছে বিক্রি করার জন্যে তৈরি। এগুলো খেয়েই তো এমন তিরিক্ষি হয়েছে ওদের মেজাজ।'

'গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করছ তুমি,' সাবধান করল মালিক।

'গোলমাল মোটেও পছন্দ করি না আমি। বারের তলা থেকে ওই জগটা বের করে ঢেলে দাও ড্রিঙ্ক–কোন আপত্তিই আর করব না আমি।'

বেজার মুখে বিড়বিড় করতে করতে জগ বের করে সার্ভ করল বারের মালিক। জাভেদের আদেশে বারে উপস্থিত সবার জন্যই এক গ্লাস করে মদ ঢালল সে।

'আমার নাম জাভেদ,' বলল সে। 'দক্ষিণের ব্যাঞ্চের মালিক। কোন না কোন সময়ে আমার মার্কা দেয়া গরুর মাংস নিশ্চয়ই খেয়েছ তোমরা।'

গোল মুখের একটা লোক তার গ্লাসের অর্ধেক হুইস্কি ফেলে দিয়ে উদ্ধত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি বলতে চাও আমরা গরু চোর?'

'সত্যি কথাই বলছি আমি,' জবাব দিল জাভেদ। 'মাঝে মধ্যে একটা দুটো গরু ধরে খেলে তাতে দোষ ধরার মানুষ আমি না। তবে তোমরা মিছেই আমার ছোট স্টকের দিকে নজর দিচ্ছ যখন তিন হাজারের একটা দল অন্যায় ভাবে

রয়েছে ওখানে।'

'আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছ?'

'আমি কেবল খবরটা জানালাম। তোমরা কি করবে না করবে সেটা সম্পূর্ণ তোমাদের ব্যাপার। বর্তমানে ওদের সাথে র‍্যাঞ্চ নিয়ে লড়াই চলেছে আমার।'

দরজা খুলে গেল। ঠাণ্ডা হাওয়া ভিতরে ঢুকছে। সেই সাথে ছিপাছপে গড়নের একটা লোক ঢুকল ভিতরে। চোখ দুটো কোটরে ঢোকা, ভুরুগুলো সোজা সোজা, মুখটা লম্বাটে। জ্যাকেটের মত ভেড়ার চামড়ার ওভারকোট পরেছে লোকটা। পিস্তলটা বেশ নিচুতে ঝুলছে, ওভারকোট পরেও ওটা বের করতে ওর কোন অসুবিধাই হবে না। ছোট মাথার উপর বীভারের টুপি চেপে বসে আছে।

এই সময়ে বাইরে কয়েকটা ঘোড়ার খুরের শব্দ পাওয়া গেল। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে জাভেদ দেখল অ্যালেক আসছে ঘোড়ায় চড়ে, ওর সাথে রয়েছে ওরই দলের বারো-চোদ্দ জন লোক।

চট করে গায়ে ওভারকোট চাপিয়ে নিল জাভেদ। নতুন আগন্তুক ওর দিকে চেয়ে দেখছিল। 'তোমাকে চিনলাম না,' বলে উঠল সে। 'আমি প্যাডি ম্যাকনি।'

'আমি উইল হ্যাভ্ টুওয়েট,' হাসতে হাসতে জবাব দিল জাভেদ।

'কী বললে?' কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

'উইল হ্যাভ্ টুওয়েট, অর্থাৎ অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে। র‍্যাঞ্চ লড়াই-এর কথা বলতে বলতেই ওরা এসে হাজির হয়েছে।

প্যাডি জানালা দিয়ে চেয়ে দেখল। 'ও তো বিল শার্প। ওর সাথে তোমার বিরোধ থাকলে ওর পক্ষ হয়ে তোমাকে এখানে আটকে রাখব আমি।'

'ছেড়ে দাও ওকে,' বারের মালিক বলে উঠল। 'কেউ কাউকে কারও জন্যে আটকাবে না এখানে।'

'তুমি চুপ করো—'

পিছনের দরজাটা শব্দ করে বন্ধ হলো। প্যাডি ঘুরে দেখল জাভেদ অদৃশ্য হয়েছে।

ছয়

জোর ঠাণ্ডা বাতাস বইছে বাইরে। পিছনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কান পেতে ভিতরের শব্দ শোনার চেষ্টা করল জাভেদ। অস্পষ্ট গুঞ্জন ছাড়া কথা কিছুই বুঝতে পারল না সে। সামনের দরজা খোলার শব্দটা শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করল জাভেদ, তারপর নীচে নেমে দ্রুত হেঁটে আস্তাবলের কাছে চলে এল সে।

আস্তাবলের দেয়ালের সাথে সেঁটে দাঁড়িয়ে দ্রুত চিন্তা করে নিল সে। শহরে মোটে কয়েকটা বাড়িই আছে, আর সেগুলোর সবকটাতেই তল্লাশী চালানো হবে, সুতরাং ওগুলোর কোনটায় আশ্রয় নেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

অ্যালেক হঠাৎ এখানে হাজির হওয়ায় খুব অবাক হয়েছে জাভেদ। সে যে

এখানে এসেছে তা জানার কথা নয় ওর। হয়তো ওরা লুইস আর চার্লিকে খুঁজতে এসেছে–কিন্তু ওদের সাথে তো অ্যালেকের কোন বিরোধ নেই? অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন কোন কারণে এখানে ওদের আগমন হয়েছে।

প্যাডি ওকে বিল শার্প নামে চেনে। এর মানে কী? ভুল করেছে প্যাডি? কিন্তু মনে হয় প্যাডি ওকে অনেক আগে থেকেই চেনে। হতে পারে অ্যালেকই আগে অন্য নাম ব্যবহার করত।

এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কোন লাভ হবে না। কিছু একটা করা দরকার তার। ওখান থেকেই সে লক্ষ করল চারদিকে লোকজন খুঁজতে বেরুল। প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি খোঁজ করছে ওরা। ধীরে ধীরে পিছু হটে জঙ্গলের দিকে চলে গেল জাভেদ। ওরা মোটেও আশা করবে না এই শীতে বাইরে রয়েছে সে।

কিছুক্ষণ পরে অ্যালেককে দেখা গেল পিছনের দরজায়। চেঁচিয়ে তার লোকজনকে ডাকল সে। 'আর সময় নেই এখন আমাদের হাতে, আমরা ফেরার পথে ওর ব্যবস্থা করব,' জোরে জোরেই অ্যালেককে কথাটা ঘোষণা করতে শুনল জাভেদ।

কোথায় যাচ্ছে ওরা? এত তাড়া কেন ওদের?

খানিক বাদেই ঘোড়ায় চেপে ওদের শহর ছেড়ে যেতে দেখল সে। এই শীতের রাতে যাত্রা শুরু করেছে, অর্থাৎ অনেক দূরে কোথাও যাচ্ছে ওরা।

জাভেদকে আবার বারে ফিরে যেতে দেখেও কেউ কোন মন্তব্য করল না। বারের মালিক নিজেই হাত বাড়িয়ে ভাল হুইস্কির জগ থেকে এক গ্লাস মদ ঢেলে বাড়িয়ে দিল জাভেদের দিকে। 'এটা আমার তরফ থেকে,' বলল সে।

'বাইরে খুব ঠাণ্ডা,' মন্তব্য করল জাভেদ।

'ভয়ে যাদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে তাদের জন্যে বাইরে ঠাণ্ডা আরও বেশি,' সবাইকে শুনিয়ে জোর গলায় বলে উঠল প্যাডি।

জাভেদ তার গ্লাসটা নিয়ে ধীর স্থির ভাবে সবটুকু পান করে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে চাইল প্যাডির দিকে। পুরো এক মিনিট সে চেয়ে রইল ওর দিকে। চুপ হয়ে গেছে বারের সবাই। কেউ একজন বোতল খুলে গ্লাসে মদ ঢালছে–নীরব ঘরটাতে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে হুইস্কি ঢালার শব্দ।

'হ্যাঁ,' বলে উঠল জাভেদ। 'ঘোড়ায় চড়ে অনেক দূর পথ চলে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়েই ছিল। আর তা ছাড়া বাইরের এতজনকে একসাথে সামলানোর ইচ্ছাও আমার ছিল না।'

'তাই নাকি?' চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসছে প্যাডি।

'এখন তোমার সাথে আর কেউ নেই?'

বাজ পড়ল প্যাডির মাথায়। আর যাই হোক তাকে কেউ এভাবে চ্যালেঞ্জ করে বসতে পারে স্বপ্নেও ভাবেনি ও। বেকায়দায় পড়েছে সে, মুহূর্তে বুঝে নিল এইরকম বসা অবস্থায় তার পক্ষে পিস্তল বের করা অসম্ভব। অথচ সামান্য নড়াচড়া করলেও সেটাকে পিস্তল বের করার চেষ্টা মনে করে গুলি করতে পারে প্রতিপক্ষ। লোকটা অল্পকিছু পিস্তল চালানো জানলেও তার মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু

এখনও মরার জন্য প্রস্তুত নয় সে।

একেবারে স্থির হয়ে বসে রয়েছে প্যাডি। গুলি খাওয়ার ঝুঁকি না নিয়ে কোন উপায়ে নড়েচড়ে সুবিধা মত অবস্থায় আসা যায় কিনা ভাবছে সে।

ওর মাথার মধ্যে কীসের ভাবনা চলছে অজানা নেই জাভেদের। সহজে নিস্তার দেবে না ওকে জাভেদ। সে বলল, 'আমি তৈরি, যে কোন মুহূর্তে তুমি চেষ্টা করে দেখতে পারো। কিন্তু এটা জেনো, পিস্তলে হাত দিতে গেলেই মরবে তুমি।'

মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে প্যাডির। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে তার। একটু নড়তে খুব ইচ্ছা করছে। একই ভাবে বসে থাকতে থাকতে আড়ষ্ট হয়ে গেছে তার দেহ। কিন্তু নড়ার সাহস পাচ্ছে না সে, জাভেদ যে মিথ্যা হুমকি দেয়নি বুঝতে পারছে পরিষ্কার।

জাভেদ লক্ষ করছে লোকটাকে, তার চোখের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। লোকটাকে মারতে চায় না জাভেদ। কিন্তু দরকার পড়লে মারতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না সে।

'যে লোকটাকে বিল শার্প বলছিলে তাকে চেনো তুমি?'

'ভাল করেই চিনি–কেন?'

'তোমার মতই সাহসের অভাব আছে লোকটার। নিজের লড়াই নিজে না লড়ে লোক ভাড়া করে।'

হেসে উঠল প্যাডি। 'তুমি লোক চিনতে ভুল করেছ। নিজেরটা নিজেই সামলাবার ক্ষমতা সে রাখে।'

'তবে আমাকে মারতে শাইনি ডিককে কেন ভাড়া করেছিল?'

কথাটার পরিপূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করে প্যাডির চোখ দুটো ঈষৎ বিস্ফারিত হতে দেখল জাভেদ।

'তুমিই কি জাভেদ বক্স?'

'হ্যাঁ, ওটাই আমার নাম।'

এতদিনে শাইনি ডিকের মৃত্যুর খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিমের রীতি অনুযায়ী যেখানেই লোকজন জড়ো হয়েছে সেখানেই ওই গল্প হয়েছে। তাসের টেবিলে, ক্যাম্প ফায়ারের ধারে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়েছে গল্পটা।

দরজা খুলে তিনজন লোক ঢুকল ঘরে। প্রথমজন চওড়া কাঁধওয়ালা লম্বা লোক। লালচে লম্বা চুল কাঁধ পর্যন্ত ঝুলছে, গোঁফটাও একই রঙের। দ্বিতীয়জন লম্বায় একটু ছোট, চৌকো মুখ, শক্ত-সমর্থ গড়ন। তৃতীয়জন সবার চেয়ে লম্বা, ছিপছিপে চেহারা, ছোট্ট মাথাটা লম্বা গলার উপর বসানো। নাকটা বেঢপ রকম লম্বা।

'এসো, এসো,' বলে উঠল জাভেদ। কিন্তু চোখ মুহূর্তের জন্যও প্যাডির উপর থেকে সরায়নি সে। 'নাচের টিকিট বিক্রি করছি আমি। নিজেদের সাথী বেছে নাও তোমরা।'

'এটা যদি তোমার লড়াই হয়, আমরা তৈরিই আছি,' জবাব দিল লুইস। মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতিটা আঁচ করে নিয়েছে সে।

চার্লি আর জিম হারভি এগিয়ে গিয়ে বারের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল

জাভেদের পাশে। ওরা দুজনই তাকিয়ে আছে প্যাডির দিকে।

'এই লোকটা কি তোমার সাথে লড়াই করার উপযুক্ত মানুষ হলো?' শান্ত গলায় প্যাডিকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল লুইস।

'এটা খিদে বাড়াবার জন্যে বোরহানীর মত। আসল খানা আসছে পরে বিল শার্প বা অ্যালেকজান্ডার শার্পের সাথে।'

আরও আড়ষ্ট হয়ে গেছে প্যাডি ম্যাকনি। জাভেদ এগিয়ে গেল তার টেবিলের কাছে। 'তোমার হাত কেউ বেঁধে রাখেনি, প্যাডি,' কথার ছলে বলল জাভেদ। 'তুমি যেন কী বলছিলে আমাকে বিলের জন্যে আটকে রাখবে না কি? সে-চেষ্টা কি এখনই করবে?'

জাভেদের দিকে চোখ তুলে চেয়ে আছে প্যাডি। ওর দৃষ্টি জাভেদের বুকের উপর নিবদ্ধ। সে ভাবছে পিস্তল বের করতে গেলে তা টেবিলে বেধে যাবে না তো? আর লাফিয়ে টেবিল থেকে পিছনে সরে যেতে চাইলে পিস্তল তোলার আগেই গুলি খাবে সে।

'মনে হচ্ছে একটু অসুবিধার মধ্যে রয়েছ তুমি,' বলল জাভেদ। 'চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াও, তোমাকে সমান সুযোগ দেয়া হবে। হঠাৎ কিছু করতে যেয়ো না, ধীরে সুস্থেই ওঠো।'

নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না প্যাডি। পুরো সুযোগ দেওয়া হচ্ছে তাকে! ধীরে চেয়ার ছেড়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জাভেদের চোখে চোখে চাইল সে। ঘুসি মারল জাভেদ।

ঘুসিটা যে কোথা থেকে এল বুঝতেই পারেনি প্যাডি। ঘুসির জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। মারটা তার চোয়ালের উপর পড়তেই মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকে উঠল ওর। টাল সামলাতে না পেরে মেঝেতে পড়ে গেল। মাথার ভিতরটা ঝাঁঝা করছে। মুখের ভিতর কেমন একটা ধোঁয়াটে স্বাদ। শক্ত দুটো হাত ওর বুকের জামা ধরে টেনে দাঁড় করাল। একটা সিধে আর একটা উল্টো হাতের চড় পড়ল ওর গালে।

জীবনে ঘুসাঘুসি করেনি প্যাডি। সব রকম বিরোধ সে পিস্তল দিয়ে মেটাতেই অভ্যস্ত। রাগে অন্ধ হয়ে পিস্তল বের করার চেষ্টা করল সে। বাম হাতে ঘুসি বসাল জাভেদ ওর মুখে। ঠোঁট কেটে দরদর করে রক্ত বেরিয়ে এল।

'প্যাডি ম্যাকনি,' কোন রাগ প্রকাশ পেল না জাভেদের গলায়। 'আমি এসেছিলাম লোমা কয়োটিতে আমার কাজে। তোমাকে জ্বালাতে যাইনি আমি, তুমিই গায়ে পড়ে লাগতে এলে আমার সাথে।'

'শোনো,' বলে চলল জাভেদ 'তোমার ভালর জন্যেই বলছি আমি, এই শহরের দক্ষিণে পা বাড়িও না। উত্তরে যেখানে খুশি যাও আপত্তি নেই আমার, কিন্তু দক্ষিণে আমার র‍্যাঞ্চের ধারে কাছে তোমাকে দেখলে তোমার ঠ্যাঙ ভেঙে দেব। কথাটা মনে রেখো।'

ঘুরে বারের কাছে দাঁড়ানো তিনজনের কাছে ফিরে এল জাভেদ। লরেন্সকে সে বলল, 'গোলাগুলিতে হাত ভাল এমন কিছু লোকের দরকার আমার।'

প্রথম দিনটা জেনির গুহা পরিষ্কার করে আর উপরে ওঠার রাস্তার উপর নজর

রেখেই কাটল। রান্নার ধারে-কাছেও গেল না সে। কেবল কফি আর শুকনো মাংস খেয়েই কাটল তার দিনটা। একা একা থাকতে ভয় লাগছে ওর, অস্বীকার করার উপায় নেই।

দ্বিতীয় দিনে জোর বাতাস বইতে শুরু করল র‍্যাঞ্চের দিক থেকে। খাবার তৈরির গন্ধ র‍্যাঞ্চের দিকে যাবার সম্ভাবনা নেই দেখে কিছু শুকনো আপেল বের করে পানিতে ভিজিয়ে আপেল পাই বানাতে লেগে গেল জেনি। ওরা দুজন ফিরে এলে অভ্যর্থনা করবে বলে বিভিন্ন আয়োজন করল সে।

জেনি জানে না যে তাদের গরু-মহিষের খোঁজে র‍্যাঞ্চ থেকে অনেক পশ্চিমে ঘোরাঘুরি করছে বার্ট। ফেরার পথে পাই বেক করার গন্ধ হঠাৎ করে গেল তার নাকে।

অসম্ভব! সে জানে এটা নিতান্তই অসম্ভব। কিন্তু তবু পরিচিত সুস্বাদু খাবারের গন্ধে জিভে পানি এসে গেল তার। তাড়াতাড়ি ঘোড়া থামিয়ে টেনে টেনে শ্বাস নিয়ে সে বোঝার চেষ্টা করল গন্ধটা কোন্‌দিক থেকে আসছে, কিন্তু গন্ধটা বাতাসে হারিয়ে ফেলেছে সে। ওটাকে নিছক তার মনের কল্পনা বিলাস বলে উড়িয়ে দিয়ে রওনা হতে যাবে, এমন সময়ে আবার গন্ধটা নাকে এল।

এক ঘণ্টা পুরো ঘোড়া ছুটিয়ে এদিক ওদিক গিয়ে ঘ্রাণের উৎসটা আন্দাজ করার চেষ্টা করল বার্ট। কিন্তু র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি এসে পড়েও কিছু বুঝে উঠতে পারল না সে। অবশেষে অন্ধকার হয়ে আসছে দেখে ক্ষান্ত দিল।

সম্ভবত র‍্যাঞ্চেই কেউ পাই বা কেক বেক করছে। জাভেদ যদি আশেপাশে কোথাও আস্তানা নিয়েও থাকে, সে এমন সুগন্ধ ছড়িয়ে কিছু বেক করবে আশা করা যায় না। অত্যন্ত সাবধানী লোক সে।

র‍্যাঞ্চে ফিরে কেবিনে ম্যাটের কাছে দিনের কাজের রিপোর্ট দিতে গেল বার্ট। ভিতরে নীনা পেজ আর ম্যাট বসে গল্প করছে। বার্ট আশা করেছিল দরজা খুলতেই সদ্য বেক করার সুগন্ধ নাকে আসবে তার। দরজা খুলে খুব অবাক হলো সে। ভিতরে কাঠের আগুন আর কফির গন্ধ ছাড়া অন্য কোন গন্ধ পেল না ও।

সতর্ক লোক বার্ট। সবই রিপোর্ট করল সে কিন্তু ওই গন্ধ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করল না। তাদের পশুগুলোর অবস্থা খুব খারাপ। যেটুকু জমিতে ঘাস ছিল তা শেকড় পর্যন্ত খেয়ে শেষ করে ফেলেছে ওরা। খুর দিয়ে তুষার সরিয়ে ঘাস খাওয়ায় অভ্যস্ত নয় এই পশুগুলো। ম্যাটের চেহারা চিন্তিত হতে দেখল বার্ট, নীনার মুখও গম্ভীর।

লোমা ফয়োটি থেকে একজন লোক ফিরে এসে খবর দিল জাভেদকে ওখানে দেখা গেছে। রাতে বাড সিগারেট ধরাতে ধরাতে জানাল, 'এখান থেকে পুব দিকে একটা সদ্য তৈরি ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখলাম আজ। আমি হলপ করে বলতে পারি ওটা ওই আধা ইন্ডিয়ানটারই ঘোড়ার ছাপ।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, দেখে মনে হয় হয়তো গতকালের ছাপ হবে। আড়াআড়িভাবে অনেক এলাকা জুড়ে খেয়াল রেখেছি আমি, ফিরে আসেনি সে।'

চোখ দুটো ছোট করে ভাবছে বার্ট। ওর পায়ের কাছে ওর প্রিয়

অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা শুয়ে আছে।

ওরা একজন লোমা কয়োটিতে, আর অন্যজন পুবদিকে গেছে, ফেরেনি এখনও। অর্থাৎ–চোখ দুটো আরও ছোট হলো তার–জেনি একেবারে একাই রয়েছে কোথাও।

আকর্ষণীয়া নারী জেনি। মেয়েদের পিছনে বার্ট ঘোরে না বটে, কিন্তু গত চার মাসে কোন নারীসঙ্গ লাভ করেনি সে।

ভোর হতেই রওনা হবার জন্য তৈরি হলো বার্ট। ওর কুকুরটাও পিছন পিছন ঘুরছে–সাথে যাবে। কয়েকবার ধমক দিল সে, কিন্তু কুকুরটা নাছোড়বান্দা। ঘোড়া নিয়ে বের হবার পরও ওর পিছন পিছন আসতে লাগল অ্যালসেশিয়ানটা। ঘোড়া থেকে নেমে বার্ট একটা পাথর ছুঁড়ে মারল ওকে। আজকে ওকে সাথে নেওয়ার কোন ইচ্ছে নেই তার।

পাথরের আঘাতে কুকুরটা থেমে দাঁড়াল। করুণ মিনতি ভরা আহত চোখে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে বার্টের দিকে। মনিবের কাছ থেকে এমন ব্যবহার আশা করেনি সে। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে হঠাৎ করেই ঘুরে ফিরে চলল ও আবার র‍্যাঞ্চের দিকে।

যাত্রাতেই খারাপ হয়ে গেল বার্টের মন। আজ পর্যন্ত কোনদিন মন্টির গায়ে হাত তোলেনি সে। আবার ঘোড়ায় চড়ে জেনির কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলল ও–কিন্তু তার মনটা কেমন যেন খচ্ খচ্ করতে লাগল।

মেসাটাকে ডান হাতে রেখে প্রাচীন একটা আবছা ট্রেইল ধরে পশ্চিমে এগিয়ে চলল বার্ট। জাভেদের গুপ্ত ক্যাম্পটা খুঁজে বের করার উদ্দেশ্য নিয়েই আজ বেরিয়েছে সে। প্রথম দেখার পর থেকেই মেয়েটাকে আর ভুলতে পারেনি বার্ট। ওর উন্নত বুক, শরীরের সুন্দর বাঁধুনি, চলা, বলা সবই নিভৃতে তার মনে কামনার আগুনে ইন্ধন জুগিয়েছে।

মেয়েটার কথা ভাবতে ভাবতেই চলেছে বার্ট। ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে পশ্চিম দিকে। জাভেদ যদি র‍্যাঞ্চের ধারে কাছে কোথাও ক্যাম্প করে থাকে তবে তা এই মেসার ধারেই কোথাও হবে। তামাক-দণ্ড থেকে একখণ্ড তামাক দাঁতে কেটে নিল বার্ট।

পুরোনো ট্রেইলটা এক জায়গায় এসে মেসার দেয়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে মুখ থেকে খয়েরী রঙের লালা ফেলল তুষারের উপর। বাতাসে রান্নার গন্ধ পাওয়ার চেষ্টা করল সে বুক ভরা শ্বাস নিয়ে, কিন্তু না, পাইন বনের তাজা গন্ধ ছাড়া আর কোন গন্ধ নেই বাতাসে।

খুশি মনে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে অ্যালেক। জাভেদকে শেষ করার সময় পায়নি সে লোমা কয়োটিতে। কিন্তু লোকটাকে একবার যখন ভিটে ছাড়া করা গেছে তখন বেশিদিন আর ওর পক্ষে পালিয়ে পালিয়ে থাকা সম্ভব হবে না, শেষ পর্যন্ত মারা সে পড়বেই। আর কয়েক মাইল গেলেই সত্তর হাজার ডলার মূল্যের সোনা এসে যাবে ওর হাতের মুঠোয়। র‍্যাঞ্চ করার চেয়ে এই ব্যবসা অনেক বেশি লাভজনক।

ক্লান্ত শরীর জাভেদের। পরপর কতগুলো লম্বা যাত্রা সেরে লোমা কয়োটিতে

একটু বিশ্রাম নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। জেনির জন্য বিশেষ চিন্তা নেই, কারণ জিকো আজ রাতেই পৌঁছে যাবে জেনির কাছে।

কিন্তু সে জানে না যে জিকো পুবের রাস্তায় বারো মাইল দূরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। হঠাৎ ঝোপের ভিতর থেকে এক ঝাঁক পাখি শব্দ করে উড়াল দিতেই জিকোর ঘোড়াটা ভয় পেয়ে লাফিয়ে ওঠে। সামলাতে না পেরে জিকো ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগে জ্ঞান হারায়।

তৃতীয় দিন সকালে জেনির ঘুম ভাঙল একাকীত্বের অস্বস্তি নিয়ে। তাড়াতাড়ি জামা পরে নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে উঁকি দিল সে। অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না ওর। জাভেদের তৈরি দ্বিতীয় ঘুলঘুলিটা দিয়ে আরও ভাল করে বাইরেটা দেখে নেওয়ার জন্য উঁকি দিতেই একজন ঘোড়সওয়ার চোখে পড়ল জেনির।

নিছক পথচারী নয় লোকটা। অ্যাপাচির মতই সতর্কভাবে চিহ্ন লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে সে। ইন্ডিয়ানদের সাথে বেশ কিছুকাল কাটিয়েছে জেনি। চিহ্ন লক্ষ্য করে শিকারী নির্দিষ্ট শিকারের কাছাকাছি পৌঁছে গেলে তার কেমন প্রতিক্রিয়া হয় তা অজানা নেই ওর। ভীত চোখে লোকটার কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগল জেনি। প্রথমেই জিকো আর জাভেদের জন্য দুশ্চিন্তা হলো তার। ওরা কেউ যদি ফিরে আসে এখন, আর লোকটা যদি আগেই দেখে ফেলে, কী উপায় হবে?

অন্য কামরায় যেখানে ঘোড়া রাখা রয়েছে সেখানে গিয়ে একটা পিস্তল কোমরে বেঁধে নিল সে। তারপর একটা রাইফেল হাতে তুলে নিল। গুলি ছোঁড়ায় ওর হাত খারাপ নয়। আজ পর্যন্ত কোন মানুষকে গুলি করেনি বটে, কিন্তু জেনি যাদের ভালবাসে তাদের ক্ষতি চায় ওই লোকটা। ওকে গুলি করতে হাত কাঁপবে না তার।

ঘোড়াগুলোকে খাবার দিয়ে সে প্রবেশ পথের কাছে গিয়ে নীচের দিকে চাইল। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। জাভেদ ওকে একটা পাথর দেখিয়ে দিয়ে গেছে পাহাড়ের মাথায়। ইচ্ছে করলে সহজেই ওটাকে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে দিতে পারবে জেনি। পাথরটা নেড়েচেড়ে দেখল সে–হ্যাঁ, জোরে ধাক্কা দিলেই গড়িয়ে নীচে নামবে ওটা।

কিন্তু লোকটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। জাভেদ আর জিকোর ফেরার সময় হয়ে এসেছে, এইজন্যই তার ভয় করছে আরও বেশি। হঠাৎ নীচে একটা গাছের আড়ালে নড়তে দেখল সে লোকটাকে। সে কি ট্রেইল খুঁজছে? নাকি টের পেয়ে গেছে যে কেউ তাকে লক্ষ করছে? উপরে ওঠার জন্য রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে কি লোকটা?

ধীরে সময় পেরিয়ে যেতে লাগল। কিছুই ঘটল না। ওদের ফেরার পর সে যে পার্টি দেবে বলে ঠিক করেছিল তার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল জেনি। তার ছোট পোঁটলার ভিতর একটা সুন্দর জামা লুকিয়ে রেখেছিল। সেটা বের করে ঝুলিয়ে দিল সে কুঁকড়ে যাওয়া ভাঁজ সমান হওয়ার জন্য। তারপর জানালার ধারে গিয়ে দেখল–কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

রাইফেল হাতে মেসার উপর বেরিয়ে এসে হামাগুড়ি দিয়ে ধারের কাছে চলে এল সে। নীচে ঘোড়ার পিঠে দেখা যাচ্ছে লোকটাকে, র‍্যাঞ্চের দিকে ফিরে যাচ্ছে

সে। কিন্তু তাই বলে সে যে আবার ফিরে আসবে না এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

লোকটা যদি ফিরে আসে তবে অলক্ষ্যে থেকে তাকে হত্যা করতে হবে। ঘাপটি মেরে জাভেদ আর জিকোর জন্য পথের ধারে লুকিয়ে বসে থেকে ওদের বিপদ ঘটাতে কিছুতেই দেবে না জেনি।

মেসার উপরটায় কিছুটা ঘুরে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে গুহায় ফিরে এল জেনি। কফি তৈরি করে খেল। আবার লাফিয়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে বাইরেটা দেখল—না, কেউ নেই। তবু কেমন যেন ভয় ভয় করছে ওর। মেসার উপর ফিরে গিয়ে উত্তর আর পুবের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, খুব খেয়াল করে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখল সে। ওদিক দিয়েই জাভেদ আর জিকোর ফেরার কথা, কিন্তু ওদের ফেরার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আবার ফিরে এল সে গুহায়।

ওরা কেউ যদি ফিরে না আসে? ওরা যদি কোন বিপদে পড়ে থাকে? যদি অ্যামবুশ করে হত্যা করে থাকে ওদের নীনার দলের লোক? তা হলে একেবারে এতিম হয়ে যাবে সে। এই পৃথিবীতে তার আর যাবার কোন জায়গাই থাকবে না।

অশুভ চিন্তাগুলোকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা জামাটা নামিয়ে আনল সে। সময় হলে ঠিকই ফিরে আসবে ওরা। অধীর আগ্রহে জামাটা পরে নিল জেনি। তার ছোট আয়নায় একবারে কেবল নিজের একটু অংশ দেখতে পাচ্ছে সে। চুল ছেড়ে দিয়ে চুল আঁচড়ে নিল ভাল করে। তারপর চুল বেঁধে নিয়ে আবার আয়নায় নিজের চেহারা দেখল সে। সত্যিই সুন্দর লাগছে তাকে দেখতে, মনে মনে স্বীকার করল সে নিজেই। জাভেদ ফিরে ওকে এইরূপেই দেখুক, এটাই চায় জেনি।

'ঠিক বৌ-এর মতই লাগছে,' চেয়ে থাকতে থাকতে নিজেই বলে উঠল জেনি।

পিছন থেকে কেউ বলে উঠল, 'ঠিক তাই—অপূর্ব!'

আড়ষ্ট হয়ে গেল জেনি। একেবারে জমে পাথর হয়ে গেছে সে। বিন্দুমাত্র নড়ছে না। দ্রুত চিন্তা চলেছে তার মাথায়। পরিষ্কার চিন্তা করছে ও। ভীষণ রকম বিপদের মধ্যে পড়েছে সে, উদ্ধার পাবার কোন আশা নেই। একমাত্র—কিন্তু ওদের ঠিক এই সময়ে ফেরা, খুব বেশি আশা করা হবে সেটা।

ধীরে ধীরে বড়-গুহার মুখের দিকে ঘুরে তাকাল সে। বার্ট—মুহূর্তে চিনতে পারল সে গুহার মুখে দাঁড়ানো বার্টকে। স্টেজ থেকে নামার সময়ে সে দেখেছে এই লোকটাকে।

হ্যাংলা চেহারার লম্বাটে নোংরা লোকটা। দাড়ি কামানো নেই, তামাকের বাদামী রঙ কিছুটা লেগে রয়েছে গোঁফে।

'ভাবছিলাম আর কত দেরি হবে তোমার পৌঁছতে,' বলল জেনি। 'অনেক আগেই তোমাকে আশা করেছিলাম।'

বড় রকমের একটা হোঁচট খেল বার্ট। আশা করেছিল মেয়েটা ভয় পাবে, চ্যাঁচাবে, প্রতিবাদ করবে; কিন্তু তাকে এমন স্থির আর শান্ত দেখে বেশ হকচকিয়ে গেল বার্ট। এরপরে যে তার করণীয় কী তা ভেবে পাচ্ছে না। এমন সুন্দরী আর সংযত মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে অস্বস্তি বোধ করছে ও। মেয়েটার শুভ্র কাঁধের দিকে চেয়ে মুখের ভিতরটা শুকিয়ে আসছে তার কামনা আর উৎকণ্ঠায়। ওর শান্ত

ভাবভঙ্গিতে মনে মনে রেগে উঠছে বার্ট। সামান্য একটা মেয়ে বৈতো নয়, তাও আবার একলা রয়েছে–এত দম্ভ কীসের ওর?

'যাক, এসে গেছি আমি,' একটু রাগের ভাব নিয়েই বলল সে। 'তুমি নিশ্চয়ই জানো আমি কেন এসেছি?'

'নীচে তোমাকে চিহ্ন খুঁজতে দেখেছি আমি। কয়েকদিন থেকেই তোমাকে খেয়াল করছি,' বলতে হঠাৎ সরাসরি চোখেচোখে চাইল জেনি। 'ইচ্ছা করলে যে-কোন সময়ে আমি শেষ করতে পারতাম তোমাকে।'

মেয়েটার দিকে চেয়ে রয়েছে বার্ট। ওর শান্ত ঠাণ্ডা ব্যবহারে অস্বস্তি তো বোধ করছেই, তা ছাড়া গত কয়দিন এরই রাইফেলের নলের তলায় সে ঘুরে বেড়িয়েছে ভাবতে কেমন যেন লাগছে ওর।

'এখন আর সে-কথা বলে লাভ নেই,' জবাব দিল বার্ট। 'তোমার সুযোগ তুমি হারিয়েছ।'

'কফি বানাচ্ছিলাম আমি, তোমাকে দেব এক কাপ?'

জেনি ওকে যেটুকু দেরি করাতে পারে সেটুকুই তার লাভ। তাকে কথায় ব্যস্ত রাখতে পারলে জাভেদ বা জিকো এর মধ্যে ফিরে আসতে পারে। কিংবা কথার ফাঁকে সে নিজেও হয়তো একটা কিছু করার সুযোগ পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা সে যাই করুক, প্রথমবারেই সফল হতে হবে তাকে–কারণ দ্বিতীয় সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।

'হুম্! এক কাপ কফি হলে নেহাত মন্দ হয় না,' সম্মতি দিল বার্ট।

মন্দ কি? একটু গরম হয়ে নেওয়া যাবে। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। গুহার চারপাশে চোখ বুলাল সে। যতই দেখছে জাভেদের প্রতি শ্রদ্ধা মনে মনে বেড়েই চলেছে তার। চমৎকার জায়গা বেছে নিয়েছে সে এখানে এই মেসার উপর। যথেষ্ট খাবার এনে রেখেছে, বৃষ্টি বাদলের ভয় নেই, আগুন জ্বালাবার জন্য যথেষ্ট কাঠ আর ঘোড়ার জন্য প্রচুর খাবার–সবই রয়েছে। দরকার পড়লে সারা শীতকালটাই এখানে আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে জাভেদ।

একেবারে বার্টের গা ঘেঁষে এগিয়ে গেল জেনি। একমুহূর্ত আগেও সে ভাবতে পারেনি এটা তার দ্বারা সম্ভব। পাশ দিয়ে যাবার সময়ে ভয়ে তার গা কাঁটা দিয়ে উঠলেও ওর পাশ দিয়েই গেল সে।

'সুন্দর জামা,' জেনির পরনের কাপড়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলল বার্ট। 'এটা কি তোমার নাচে যাবার পোশাক?'

'পার্টি ড্রেস এটা,' জবাব দিল জেনি। 'মেক্সিকোতে অনেক পার্টিতেই আমি এই পোশাক পরে গেছি। কনভেন্টে পড়তাম আমি ওখানে।'

'তুমি কনভেন্টে ছিলে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

'কেন, এতে অবাক হবার কী আছে? সতেরো বৎসর বয়স আমার, রীতিমত ভদ্রমহিলা!'

নাক সিটকাল বার্ট। 'ভদ্রমহিলা না ছাই! দু'দুটো মিনসের সাথে থেকে আবার বড়াই করছ?'

'জিকো ওয়াইল্ড আমার পালক পিতা, তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে আমি নিজের

বাপ-মার মতই জানি।' মাংস কাটার বাওই ছুরিটা তার চোখে পড়ল। 'তাঁর মত মানুষ হয় না, আর জাভেদ সাহেবও নিতান্তই ভদ্রলোক।'

বিরক্ত চোখে জেনির দিকে চাইল বার্ট। কোন কিছুই আজ আর তার প্ল্যান মাফিক চলছে না। কফিতে চুমুক দিতে দিতে মেয়েটার দিকে চেয়ে সে বুঝে ওঠার চেষ্টা করছে মেয়েটা সত্যি কথাই বলছে, নাকি সে যা ধারণা করেছে মেয়েটা তাই? শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল, মিথ্যা কথাই বলছে মেয়েটা।

কফি পটের নীচে আগুনটা খুঁচিয়ে একটু উস্কে দিয়ে দুটো কাপ বের করল জেনি। ছুরির হাতলটা সামান্য দেখা যাচ্ছে আজ সকালে ব্যবহার করা পুরোনো কাপড়ের টুকরোটার তলায়। হয়তো বার্টের চোখে পড়ে যাবে ছুরিটা এই ভয়ে সে ওটার ধারে কাছেও গেল না। জেনির রাইফেল আর পিস্তলটার পাশেই বসেছে বার্ট। ওগুলো আর কাজে লাগাতে পারবে না সে।

জেনির হাত ছুঁয়ে কফির কাপটা নিয়ে ওর দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসল সে। দেখেও না দেখার ভান করল বটে, কিন্তু ভিতরটা ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেছে জেনির।

'ওরা কেউ এখন ফিরে আসতে পারে মনে করে থাকলে সে আশা ছাড়ো–ওরা এখন আর ফিরছে না। জাভেদ গেছে উত্তরে আর জিকো পুবে। এর পরে আর ওদের কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি।'

ওরা তা হলে সবই জানে: ভাবছে জেনি।

'ওখানে জাভেদের বেশিদিন টেকার প্রশ্নই ওঠে না, প্যাডি ম্যাকনি আছে লোমা কয়োটিতে। আর সে যদি ওকে সামলাতে না পারে তবে বস্ সে ব্যবস্থা করবে ফেরার পথে।'

'অ্যালেকজান্ডার সাহেব কি বাইরে কোথায়ও গেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, বিশেষ একটা কাজে গেছে,' অত্যন্ত গরম কফিতে চুমুক দিয়ে কোনমতে সেটা গিলল বার্ট। 'ওই আধা ইন্ডিয়ানটাও বোধ হয় মারাই গেছে। ওর ঘোড়াটা র‍্যাঞ্চে ফিরে এসেছে। ঘোড়ার পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে গিয়ে ওরা ঘটনাস্থলে জিকোকে পায়নি বটে তবে তুষারের মধ্যে রক্তের দাগ দেখে এসেছে। পায়ে হেঁটে ঠাণ্ডার মধ্যে জখম অবস্থায় ব্যাটা নিশ্চয়ই মরবে।'

বার্টের কঠিন চোখে একটু ব্যঙ্গাত্মক হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল। 'ওদের কাছ থেকে সাহায্য আসবে আশা করে বসে থেকে কোন লাভ নেই। তোমাকে উদ্ধার করতে আর আসবে না ওরা।' পায়ের উপর পা চড়িয়ে বসল বার্ট। 'এই কঠিন দেশে কোন মেয়ের পক্ষে একা চলা অসম্ভব। তাই বলছি, আমাকে খুশি রাখতে পারলে তোমার কোন চিন্তা নেই।'

ঝপ্ করে বাওই ছুরিটা তুলে নিয়েই হাত লম্বা করে সমস্ত শক্তি দিয়ে কোপ মারল জেনি। আগুন পুহিয়ে গরম হয়ে নিশ্চিন্তে বসে ছিল বার্ট। এই সুযোগে আঘাত হেনেছে মেয়েটা। হাতের সাথে সাথে নিজেও ঘুরল সে। আরও কাছে গিয়ে আঘাত করা উচিত ছিল ওর। ছুরির মাথাটা শার্ট আর হাতের পেশী কেটে পেটের উপর আঁচড়ের লম্বা দাগ রেখে বেরিয়ে এল। হাত থেকে কফির কাপটা পড়ে গেল ওর। মুহূর্তে বুঝে নিল জেনি, ব্যর্থ হয়েছে সে। কোন সন্দেহ

নেই—লোকটা এবার তাকে খুন করবে।

দৌড়ে ছুটে পালাল জেনি। কিন্তু যাবার আগে নিজের রাইফেলটা হাতে তুলে নিল সে। বড় গুহাটা পেরিয়ে মেসার উপর উঠে এল জেনি। ঠাণ্ডা বাতাসটা একেবারে শরীর কেটে ভিতরে ঢুকছে। মরিয়া হয়ে ছুটছে জেনি। পিছনে ধুপধাপ শব্দ তুলে ছুটে আসছে বার্ট। মেসার উপরে গাছপালার ভিতর ঢুকে গেল সে।

ইন্ডিয়ানদের সাথে ছেলেবেলা কাটানো বৃথা যায়নি তার। চট করে মাটিতে শুয়ে পড়ে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে থাকা পাথরগুলোর আড়ালে চলে গেল হামাগুড়ি দিয়ে। ওর এক হাতে এখনও বাওই ছুরি আর অন্য হাতে রাইফেলটা ধরা।

ব্যর্থ হয়েছে জেনি। এবারে লোকটা তাকে শিকার-খোঁজা করে খুঁজে বের করে হত্যা করবে। রক্তপাত ঘটিয়েছে সে। হাতের কাটাটা বেশ গভীর। পেটের সামান্য আঁচড়টা নিয়ে মাথা ঘামাবে না লোকটা, তার হাতের জন্য একটা ব্যবস্থা করেই ফিরে আসবে সে জেনির খোঁজে।

রাইফেলটা পরীক্ষা করে দেখল জেনি। চেম্বারে একটা আর ম্যাগাজিনে তিনটে গুলি রয়েছে ওতে। কিন্তু মোটে চারটে গুলি ওর জন্য নিতান্তই কম। ক্যালামিটি জেনের মত অব্যর্থ নয় তার লক্ষ্য। স্বভাবতই দূর থেকে গুলি তার মিস হবে—কিন্তু বেশি মিস করার উপায় নেই তার।

অল্প পরেই দূরে বার্টকে দেখতে পেল জেনি। গুলি করল সে। ওর গায়ে লাগাতে পারবে ভেবে গুলি করেনি ও, করেছে ওর কাছে যে রাইফেল আছে সে কথা বার্টকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। গুলির সাথে সাথেই বার্ট মাটিতে শুয়ে পড়ে ওর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। ইন্ডিয়ান চিন্তাধারা অনুসরণ করেই জেনি নিজের জায়গা থেকে সরে পিছন দিকে মেসার আরও নিরাপদ একটা জায়গায় চলে এল। ওখানে বসেই বার্টের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করছে সে। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন দেখাই মিলল না তার।

দিন শেষ হয়ে এসেছে। রাত নামলে কনকনে ঠাণ্ডা পড়বে মেসার উপর। প্রচণ্ড বাতাসও বইবে সেই সাথে, অথচ সাহস করে আগুন জ্বালাবার উপায় নেই তার।

ইন্ডিয়ান শিক্ষা এবার পুরোপুরি কাজে লাগবে ওর। যদিও খুব বেশিদিন ওদের সাথে কাটায়নি সে তবু তার মধ্যেই সে শিখেছে মিছে ভাগ্যকে দোষারোপ না করে কীভাবে ক্ষুধা, শীত, আর প্রবল বাতাসের ঝাপটা সহ্য করে টিকে থাকতে হয়।

জেনি জানে তার গায়ে যে জামাটা আছে সেটা পরে থাকাটা তার ভীষণ ভুল হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ওটা খুবই অসুবিধার সৃষ্টি করবে। ধবধবে সাদা রঙ এই মেসার উপরে রাতের বেলাও পরিষ্কার দেখা যাবে। কিন্তু এটাই তার একমাত্র সুন্দর মেয়েলী জামা। এই জামা পরেই পরিপূর্ণ নারী হয়ে বাঁচতে চায় সে—আর মরলেও এই জামা পরেই মরবে ও।

মরতে বসে বারবারই কেবল জাভেদের কথা মনে পড়ছে জেনির। জাভেদ জানে না, ওকে বলা হয়নি সে তাকে ভালবাসে। জেনির বড্ড খারাপ লাগছে

ভাবতে যে তার মনের কথাটা জাভেদ কোনদিনই জানবে না। ওকে সে-কথা বলার সুযোগ আসার আগেই মরে যেতে হচ্ছে তাকে। নিজের দেহ-মন সে জাভেদকেই সঁপে দিয়েছিল। শেষ গুলিটা সে নিজের জন্য তুলে রাখবে না, বার্টের জন্যই রাখবে সে ওটা; বার্টকে সামনাসামনি একেবারে কাছে থেকে গুলি করে ওর পেট ফুটো করবে সে নিজে মরার আগে। আর কাউকে ভোগ করতে দেবে না সে তার দেহ।

ফাঁদে পড়া সিংহীর মত ঝোপ আর পাথরের আড়ালে বসে অপেক্ষা করছে জেনি। লোকটাকে খুন করবে সে, একটুও বুক কাঁপবে না তার, একটু দুঃখও হবে না তার বার্টের জন্য।

হঠাৎ খেপে উঠল জেনি। শব্দ তুলে রাইফেলের চেম্বারে গুলি ভরল সে। অনেক দূর পর্যন্ত গেল শব্দটা। বন্য চিৎকার দিয়ে সে বলে উঠল, 'কোথায় তুমি, বার্ট? আমাকে ভোগ করতে চাও, এগিয়ে এসো। তুমি আমার হাতে মারা না পড়লেও জাভেদ তোমাকে ঠিকই শেষ করবে।'

দুশো গজ দূরে বার্ট শুনতে পেল বাতাসে বয়ে আনা জেনির কণ্ঠস্বর। গলার স্বরের ভাবটা পছন্দ হলো না তার, পাথরের আড়ালে আরও গেড়ে বসল সে। মেয়েটার শব্দ তুলে উইনচেস্টারে গুলি ভরার আওয়াজটাও কানে এসেছে তার। আপন মনেই সে ভাবল আবোল-তাবোল বকছে মেয়েটা। মাথা খারাপ হয়নি তো ছুঁড়ীর?

কিন্তু মেয়েটাকে পেতেই হবে তার। ভাল করে নড়েচড়ে আরাম করে পাথরের আড়ালে অপেক্ষা করতে বসল বার্ট। মেসার উপর ঠাণ্ডার মধ্যে মেয়েটা কতক্ষণ বাইরে থাকতে পারে দেখতে চায় সে।

ফিনফিনে পাতলা পোশাক ওর পরনে, তার উপর কাঁধ দুটো প্রায় সম্পূর্ণই খোলা। এখন সে যতই তেজ দেখাক, রাত নামলে ঠাণ্ডায় যে তার তেজ ধীরে ধীরে মজে আসবে, এতে বার্টের কোন সন্দেহ নেই। অপেক্ষা অনেক করেছে, আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে সে।

উত্তর দিকের গাছগুলোর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল জাভেদ। সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে সে চারদিকে। ওর পিছন দিক থেকে বাতাস বইছে তবু তার মনে হলো যেন মেসার দিক থেকে অস্পষ্ট একটা গুলির আওয়াজ কানে এল।

আরও কয়েক মাইল পুবে লুইস, চার্লি আর জিম ছড়িয়ে পড়ে এগিয়ে যাচ্ছে খামারের দিকে। নীনা পেজের লোকজনের জন্য চারদিকে সতর্ক নজর রেখেই এগুচ্ছে ওরা। আগামীকাল দুপুরের আগেই প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে একটা কিছু হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। জাভেদ জানে ওরা ফিরে যাবার আগে প্রচুর রক্ত ঝরবে পাহাড়ের বুকে।

গুলির শব্দ শুনে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে পশ্চিমে এগুলো জাভেদ। পড়ন্ত বিকেল, তবু বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার নজর চলে। হঠাৎ তার মনে হলো মেসার উপর সাদা মত কিছু নড়তে দেখল সে। দুই ঘণ্টা পরে চক্কর দিয়ে ঘুরে দক্ষিণ দিক দিয়ে আসার সময়ে ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখল জাভেদ।

বুকের ভিতরটা কেমন হিম হয়ে আসছে, ঘোড়া নিয়ে মেসার উপর উঠতে আরম্ভ করল জাভেদ। কিন্তু মাঝ পথেই ঘোড়া থেকে নেমে গেল। সাবধানে আগে বাড়তে হবে তাকে, কারণ মেসার উপরে যে তার জন্য কী অপেক্ষা করছে তার কোন ধারণা নেই ওর।

একটা চিৎকারের অস্পষ্ট শব্দ তার কানে পৌঁছল সন্ধ্যার একটু আগে। কিন্তু শব্দটা দ্রুত মিলিয়ে গেল বাতাসে। উপরে উঠার ঢালের মাথায় গড়িয়ে নীচে ফেলার জন্য রাখা পাথরটা যথাস্থানে রয়েছে দেখে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করল জাভেদ। থেমে দাঁড়িয়ে বুট জুতো খুলে মোকাসিনের নরম নিঃশব্দ জুতো জোড়া পরে নিল সে। জুতো জোড়া সে সব সময়ই ঘোড়ার পিঠে সাথে নিয়ে চলে। রাইফেলটা বের করে নিয়ে সাবধানে আবার উপরে উঠতে আরম্ভ করল জাভেদ।

কয়েক পা এগিয়েই গুলির শব্দ শুনল সে। বাতাসে স্পষ্ট শোনা গেল শব্দটা। প্রায় একই সাথে বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিধ্বনি শুনতে পেল সে। মেসার উপর থেকেই শব্দটা এসেছে বটে, কিন্তু ঠিক কোন্খান থেকে তা বোঝার কোন উপায় নেই। সন্তর্পণে উপরে উঠে এল জাভেদ।

মেসার উপরে বসে নিজের গোঁফের ডগা চিবাচ্ছে বার্ট। মেয়েটা তাড়াহুড়োর মধ্যে তার রাইফেলটাই তুলে নিয়ে ছুট দিয়েছিল। সে জানে ঠিক আর কয়টা কার্তুজ আছে ওই রাইফেলটায়। বাঁচতে হলে সবাইকেই নিজের রাইফেলের খবর রাখতে হয়।

গতটা ছিল তিন নম্বর গুলি। আর একটাই মোটে বুলেট রয়েছে এখন রাইফেলে। এই গত গুলিটার সময়ে সে বেশ বড় রকমের একটা ঝুঁকি নিয়েছিল। জেনিকে গুলি করতে আগ্রহী করার জন্য পুরোপুরি বাইরে বেরিয়ে দেখা দিয়েছিল। রাইফেল চালাতে জানলেও মেয়েটার হাত যে খুব ভাল নয় তা বুঝে ফেলেছে ও। গুলি চালাতে জেনি সামান্য একটু দেরি করে ফেলায় অল্পের জন্য বেঁচে গেছে সে। লোভ দেখিয়ে শেষ গুলিতে এনে ঠেকাতে পেরেছে বার্ট। যদি মেয়েটাকে তার পেতে হয় তবে আর একবার ঝুঁকি তাকে নিতেই হবে।

ঝাল এখনও মজেনি মেয়েটার, তবে একটু তেজওয়ালা মেয়েই সে বাগে আনতে বেশি মজা পায়। শব্দ তুলে বাতাস বয়ে চলেছে বার্টের আস্তানার পাশ দিয়ে।

তামাকের টুকরোটা মুখের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে বার্ট ভাবছে মেয়েটার কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, অর্থাৎ তার শেষ গুলিটা দূর থেকে গুলি করে আর নষ্ট করবে না জেনি। সুতরাং অনেক কাছে গেলেও খুব একটা ভয়ের কিছু নেই। একটু ঝুঁকি নিয়ে ওর হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিতে হবে।

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে বিশ ফুট দৌড়ে একটা গাছের আড়ালে চলে এল বার্ট। কিছুই ঘটল না। আর একছুটে ত্রিশ গজ দূরে বড় পাথরটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল সে। এবারেও কিছু ঘটল না। আর সামান্য কিছুটা গেলেই জেনির কাছে পৌঁছে যাবে সে।

বড় পাথরটার পাশ দিয়ে ঘুরে পা টিপে-টিপে এগুচ্ছে বার্ট। ওপাশের পাথরের উপর দিয়ে সাদা মত একটা জিনিস নজরে পড়ল ওর। জেনি যদি ওই পাথরের

আড়ালে থাকে তবে তাকে কায়দা মতই পেয়েছে বার্ট। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল সে–সাদা কাপড়টার উপর সতর্ক নজর তার। ফাঁকায় বেরিয়ে আসতেই একটা রাইফেল গর্জে উঠল।

গরম বুলেটের ছ্যাঁকা খেয়ে লাফিয়ে পিছনে চলে এল বার্ট। শব্দ লক্ষ্য করে চেয়ে দেখল পঞ্চাশ গজ বামে অন্য এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা।

হাড়-হারামী মেয়ে। ঠকিয়েছে তাকে। ছেলে ভুলানোর মতই তাকে সে ভুলিয়েছে স্কার্টের নীচের কিছুটা অংশ ছিঁড়ে।

তাক করা রাইফেলটা নামিয়ে নিল বার্ট।

মেয়েটা তাকে ঠকিয়েছে বটে কিন্তু মিস করেছে। মারতে পারেনি তাকে। কাঁধের কাছ থেকে কিছুটা মাংস উড়ে গেলেও বেঁচে গেছে সে। রক্ত মাংসের যুবতী নারীকে উপভোগ করার সুযোগ এসেছে…

'বার্ট!'

পুরুষের গলা শুনতে পেল সে তার পিছন দিকে। বিড়ালের মত লাফিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বার্ট। পা মাটি ছোঁয়ার সাথে সাথেই গুলি ছুটল তার রাইফেল থেকে। হোঁচট খেল সে, পেটে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মেরেছে কেউ। দুপাশে দু'পা ছড়িয়ে টলতে টলতে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। দেখল তার সামনে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জাভেদ। যেন ডুয়েল লড়ার জন্য প্রস্তুত।

উইনচেস্টার তুলে গুলি করল বার্ট। তার হাতে রাইফেলটা লাফিয়ে উঠল। রাইফেল থেকে গুলি ছোঁড়ার ধাক্কা, নাকি অন্য কোন ধাক্কা খেল সে? বিভ্রান্ত চোখে নিজের গুলিটাকে দুজনের মাঝখানে একটা পাথরের গায়ে ধুলো উড়িয়ে ধাক্কা খেতে দেখল সে। হায় খোদা, কিছুই বুঝতে পারছে না, পড়ে যাচ্ছে সে…ঠাণ্ডা পাথরের উপর মুখ রেখে পড়ল বার্ট। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে তার, মুখের কাছ থেকে তুষার সরে গেছে শ্বাসের তোড়ে। হাঁটু ভাঁজ করে বসে ওঠার চেষ্টা করল সে।

মেসার উপর এত রক্ত দেখে অবাক হচ্ছে বার্ট। কেউ একজন সাংঘাতিক রকম জখম হয়েছে তা বোঝাই যাচ্ছে রক্ত দেখে। সে যেখানে পড়েছিল ঠিক সেখানেই দেখা যাচ্ছে রক্ত। গুলিটা তা হলে তারই পেটে লেগেছে!

পেটে গুলি করে মেরেছিল সে একজন লোককে; অনেক সময় লেগেছিল তার মরতে।

রাইফেলটাকে লাঠির মত করে তাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল বার্ট। পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে জাভেদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে জেনি, দেখতে পেল সে। ঠিক স্বর্গের অপ্সরীর মতই লাগছে ওকে ওর ধবধবে সাদা পোশাকে।

মরে যাচ্ছে সে। দুই পায়ে দাঁড়িয়ে রীতিমত টলছে। জাভেদ আর ওই মেয়েটাকে গুলি করতে খুব ইচ্ছে করছে তার, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ইচ্ছে করছে নিজের মাথায় একটা গুলি করতে। মনের অনেক জোর আছে তার, কিন্তু পেটে গুলি খেয়ে অসহায় বাচ্চার মত কেঁদে ভাসিয়ে তিলে তিলে মরার মত মনের জোর তার নেই।

রাইফেল তুলল সে। গলার পাশটা হঠাৎ অবশ হয়ে গেল তার। গলা বেয়ে

একটা ভিজে গরম স্রোত নামছে নীচের দিকে। গলায় গুলি লেগেছে–জিতেছে সে! আর তাকে ধুঁকে ধুঁকে কষ্ট পেয়ে মরতে হবে না।

তার মনে আছে মায়ের অনুরোধে বাবার মৃত্যুর পরে সে নিজের হাতে বাবার দাড়ি কামিয়ে দিয়েছিল। মা তার প্রশ্নের জবাবে বলেছিল, 'তোমার বাবা স্বর্গের দরজায় মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে হাজির হোক এ আমি চাই না। সবারই সেখানে ফিটফাট হয়ে পৌঁছানো উচিত।'

তার তো কোন ছেলে নেই, তাকে কে দাড়ি কামিয়ে দেবে? কে তাকে কবরের জন্য উপযুক্ত ভাবে সাজাবে?

সবারই একটা অন্তত ছেলে থাকা উচিত।

চোখের কয়েক ইঞ্চি দূরেই নিজের রক্তাক্ত হাতটা দেখতে পাচ্ছে সে। ঠাণ্ডা বাতাসে রক্ত শুকিয়ে জমে গেছে এর মধ্যেই। কী যেন বলার চেষ্টা করল সে, কিন্তু স্বর বেরুল না।

দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল জেনি জাভেদের কাছে।

'কী হয়েছিল, তুমি ঠিক আছ তো?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল জাভেদ।

'ঠিকই আছি আমি,' জবাব দিল জেনি। 'আমি মনে মনে জানতাম তুমি আসবে।'

'আসতে একটু দেরিই হয়ে গেল আমার।'

'না, তুমি ঠিক সময় মতই এসেছ।'

ভোর বেলা রাত থাকতেই কেবিনের দরজায় এসে হাজির হলো ম্যাট। মাটিতে পা ঠুকে জুতো থেকে তুষার ঝরিয়ে নিয়ে নীনার ডাকে কেবিনে ঢুকল সে।

'মিস পেজ,' বলল ম্যাট। 'আমার কথা যদি শোনেন, তবে বলব আমাদের আজই সকালে এখান থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে ভেগে যাওয়া উচিত।'

কথাটা শুনে নীনার ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। 'কেন, কী হয়েছে?'

'এখনও কিছু হয়নি, অর্থাৎ আমার জানা মতে কিছু হয়নি–তবে বার্ট গতরাতে আর ফিরে আসেনি। ওর ফিরে না আসার একটাই মানে হতে পারে, সেটা হচ্ছে আর বেঁচে নেই লোকটা।'

'এইটুকুতেই ঘাবড়ে গেছ তুমি?'

'না,' সরাসরি জবাব দিল ম্যাট। 'সব কিছুতেই শালার প্যাঁচ লেগে যাচ্ছে এখন।'

ম্যাটের আগের কথাগুলোকে কোন গুরুত্ব না দিলেও এবার একটু চকিত হলো নীনা। এর আগে কোনদিন নীনার সামনে গাল বকেনি ম্যাট।

'এটুকুই সব নয়। খবর পাওয়া গেছে বাইরের কিছু লোকজন এসে হাজির হয়েছে এই এলাকায়। তিন চারজন লোককে দেখে এসেছে বাড়্। সব কয়জনই ভীষণ লোক। বাডের সাথে কোন কথাই বলেনি ওরা। ঘোড়ার ওপর থেকে ওরা কেবল নীরবে তাকিয়ে ছিল ওর দিকে। বাডও ওদের ভাল করে চেয়ে দেখে ফিরে এসে কাজে ইস্তফা দিয়েছে।'

'আর কিছু?' জিজ্ঞেস করল নীনা।

'হ্যাঁ, অ্যালেকের প্ল্যানে আমি কিছুতেই মত দিতে পারিনি। ওকে আমি বিশ্বাসও করি না, পছন্দও করি না, আমি বুঝি না আপনি বা বড় কর্তা কী দেখেছিলেন ওর মধ্যে। আজ পর্যন্ত এই দলের জন্যে কেবল একের পর এক বিপদই ডেকে এনেছে সে।

'আমার মনে হয় ওই লোকগুলো অ্যালেকের জন্যেই অপেক্ষা করছে ওই জঙ্গলে। ফেরার পথে ঘোড়ার পিঠেই ওকে শেষ করবে তারা।

'শুধু তাই না, স্যান সিদ্রোয় পৌছেচে শেরিফ। ববের বস্ হাজির হয়েছে শহরে, তার সাথে আছে আরও তিনজন ডেপুটি। ওদের একজন ডেপুটির ঘোড়ায় আবার টেক্সাসের মার্কা দেখা গেছে। অনেক ধরনের প্রশ্ন নাকি জিজ্ঞেস করছে ওরা।'

আগুনের ধারে গিয়ে কফির পটটা হাতে তুলে নিল নীনা। মেয়েদের স্বভাবই এই, বিপদের দেখা পেলেই খাবারের আয়োজন করে ওরা।

'পালাবার কি উপায় নেই আমাদের?'

এই প্রথমবারের মত ম্যাটের চোখে নিরাপত্তার আভাস লক্ষ করল নীনা। 'মনে হয় সম্ভব। সাথে হয়তো কিছু নিতে পারব না, তবে আমার মনে হয় আমরা চলে গেলে আপত্তি করবে না ওরা—বরং আপদ বিদায় হলো দেখে খুশিই হবে, মিস পেজ।'

'"মিস পেজ, মিস পেজ" করো না আমাকে,' বিরক্ত হয়ে বলে উঠল সে, 'আমার নাম নীনা।'

নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা শিশি বের করে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল সে।

ভাচে ক্রীক ধরে ফিরে আসছে ওরা ছয়জন। একজনের মাথায় রক্তাক্ত পট্টি বাঁধা, আর একজনের হাত ফিতে দিয়ে গলার সাথে ঝুলানো। ঘোড়াগুলো ক্লান্ত পায়ে চলছে। আরোহীরাও সবাই ক্লান্ত, অবসন্ন।

সারা পথই ঠাণ্ডায় কষ্ট পেয়েছে ওরা। দলবল নিয়ে সোনা ছিনিয়ে আনতে গেছিল অ্যালেক। স্টেজ কোচটাও ঠিক সময় মতই দেখা দিয়েছিল। পুরো আত্মবিশ্বাস নিয়ে ওরা এগিয়ে গিয়ে থামিয়েছিল গাড়ি।

কিন্তু স্টেজ ড্রাইভারটাই বেয়াড়ার মত অ্যালেকের প্ল্যান অনুযায়ী হাত তুলে আত্মসমর্পণ না করে গুলি ছুঁড়ে বসল। ওর শটগানের প্রথম গুলিতে একজনের মুখ ছিঁড়ে উড়ে গেল, দ্বিতীয় গুলিতে আর একজন চিৎকার করে ধরাশায়ী হলো। ঘোড়ার লাফালাফি আর এলোপাতাড়ি গোলাগুলির মাঝে লোকটা ঠাণ্ডা ভাবেই তার রাইফেলটা বের করে গুলি ছোঁড়া আরম্ভ করল। গাড়ির ভিতর থেকেও কয়েকজন গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল। ধপাধপ ঘোড়া আর মানুষ পড়তে আরম্ভ করল। অ্যালেকই সবচেয়ে প্রথম ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে পিঠটান দিল। মাইলখানেক দূরে সবাই মিলিত হয়ে নীরবেই ফিরতি পথে রওনা হলো।

বাকি সবার ভাগ্যে যে কী ঘটেছে তা কোনদিন জানতে পারবে না অ্যালেক। এমন ঘটার কোন কথা ছিল না। অ্যালেক আশা করেছিল স্টেজের সবাই ওদের

বন্দুক দেখেই ভয় পাবে, কিন্তু বাস্তবে তা হলো না। গুলি খেয়ে প্রথম লোকটার মাথা রক্তের আড়ালে মিলিয়ে যেতে দেখেই সব সাহস হারিয়ে ফেলেছিল সে।

র‍্যাঞ্চের উঠানে উঠে এল ওরা। কেউ একজন ওর নাম ধরে ডেকে উঠল।

'অ্যালেক!' লোকটা তার দলের কেউ নয়।

ডাক শুনে সে মুখ তুলে চেয়ে দেখল উঠানের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে জাভেদ। খালি হাতেই দাঁড়িয়ে আছে সে। লুইস রয়েছে গুদাম ঘরের দরজার কাছে। আস্তাবলের কোণায় চার্লি, কেবিনের দরজায় হেলান দিয়ে রয়েছে জিম, তার একটু দূরেই দেখা যাচ্ছে জিকোকে। সবার হাতেই একটা করে রাইফেল রয়েছে। কেবিনের জানালা দিয়েও দেখা যাচ্ছে একটা রাইফেলের নল। জেনি রয়েছে জানালায়। ওদের দাঁড়ানোর ভঙ্গি আর তৈরি হাবভাব দেখে উদ্দেশ্য বুঝতে অ্যালেকের দলের কারও আর বাকি রইল না।

অ্যালেকের পিছনের লোকটা বলে উঠল, 'মারপিট যথেষ্ট হয়েছে, আমি আর এর মধ্যে নেই।' তার রাইফেল আর পিস্তল মাটিতে পড়ার আওয়াজ পেল অ্যালেক। পিছনে আরও রাইফেল মাটিতে পড়ার শব্দ উঠল।

জাভেদের দিকে চেয়ে অ্যালেকের ভিতরটা রাগে আর হিংসায় একেবারে জ্বলে উঠল। স্টেজ কোচের ধারে কাছেও ছিল না সে, কিন্তু অ্যালেকের মনে হচ্ছে তার সব ব্যর্থতার মূলে রয়েছে ওই লোকটাই।

হেরে গেছে অ্যালেক। সব দিক দিয়েই হেরেছে সে, কিন্তু হেরেও সে এখন জয়ী হতে পারে জাভেদকে হত্যা করে। মৃত জাভেদ তার জয়ের ফল ভোগ করতে পারবে না—কিছুই পাবে না সে।

'নীনা কোথায়?' প্রশ্ন করল অ্যালেক।

'চলে গেছে,' জবাব দিল জাভেদ। 'আজ সকালেই একটা গাধার পিঠে তার নিজস্ব কিছু মাল নিয়ে ম্যাটের সাথে চলে গেছে সে ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে।'

তা হলে ওই পর্বও শেষ।

তার পিছন থেকে তাকে একা ফেলে তার সঙ্গীরা একে একে সবাই ঘোড়া নিয়ে সরে যাচ্ছে। ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে আসছে তার। সামনে জাভেদ অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরেই ওর সঙ্গীরা সবাই ওর পিছন থেকে সরে গেছে। কেউ অস্ত্র ত্যাগ করতে বলেনি, আত্মসমর্পণ করতেও বলেনি।

কয়েকদিনের মধ্যেই কলোরাডোতে কী ঘটেছিল তা জানাজানি হয়ে যাবে সবখানে। লোকজন তাকে খুঁজবে—ফেরারী আসামী সে এখন! আশ্চর্য, প্ল্যান করার সময়ে কেবল সাফল্যের দিকটাই ভেবেছে সে, এদিকটা কখনও ভেবে দেখেনি।

ইচ্ছা করলে লোকগুলো তাকে ফাঁসি দিতে পারে। হয়তো করবেও তাই।

পা দুটো কিছুটা ফাঁক করে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জাভেদ। অ্যালেক পিস্তল বের করার চেষ্টা করলেই নিজের পিস্তল বের করে গুলি করবে সে।

'তোমরা সবাই আমার পিস্তল বের করার অপেক্ষায় আছ,' রাগে চিৎকার করে বলল অ্যালেক। 'সেটা করলেই আমাকে মারবে! কিন্তু ভুল ধারণা করেছ তোমরা। সে-সুযোগ আমি তোমাদের দেব না। আত্মসমর্পণ করব আমি। ভেবেছ ওরা

ফাঁসিতে ঝুলাবে আমাকে। কিন্তু দেখে নিয়ো ফাঁসির দড়ি ঠিকই এড়িয়ে যাব আমি। আমার জিত হবেই। এই দেখো আমি আত্মসমর্পণ করছি।' হাতের রাইফেলটা মাটিতে ফেলে দিয়ে কোমর থেকে পিস্তলটাও মাটিতে ফেলার জন্য হাত বাড়াল সে।

কিন্তু পিস্তলটা বের করে মাটিতে না ফেলে ঝট করে সেটা উঁচিয়ে ধরল জাভেদের দিকে। সে নিজে মরবে এটা নিশ্চিত, তবে জাভেদকেও সেই সাথে নিয়ে যাবে সে।

বিদ্যুৎবেগে নিজের পিস্তল বের করে নিয়েই ডান দিকে ঝাঁপ দিল জাভেদ। অ্যালেকের গুলিটা একমুহূর্ত আগে সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেই জায়গাটা ভেদ করে চলে গেল।

মাটি ছোঁয়ার আগেই উড়ন্ত অবস্থায় গুলি করল জাভেদ। মাটিতে পড়ে একটা গড়ান দিয়েই আবার গুলি করল সে। অ্যালেকের দ্বিতীয় গুলিটা জাভেদ প্রথমে যেখানে পড়েছিল সেখানে মাটিতে গিয়ে ঢুকল।

জাভেদের দুটো গুলিই অব্যর্থ ভাবে অ্যালেকের বুকে গিয়ে বিঁধেছে। হাত থেকে ওর পিস্তলটা খসে পড়ল মাটিতে। গোলাগুলির শব্দে ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে ঘোড়াটা পিছন দিকে ছুটল। অ্যালেকের অসাড় দেহটা ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ল নীচে।

সেই দিনই দুপুর বেলায় জাভেদ, জেনি আর জিকো বসে গল্প করছে কেবিনে। লরেন্স, চার্লি আর জিম ফিরে গেছে লোমা কয়োটিতে—অন্যান্যরা যে যার পথে যাবার জন্য স্যান সিদ্রোর দিকে গেছে।

আবার সেই আগের মত করে ফিরে পেয়েছে ওরা কেবিনটা। খাওয়া শেষ করে কফিতে চুমুক দিতে দিতে গল্প করছে ওরা। হঠাৎ কী মনে পড়তেই জেনি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। একটু পরেই তিনটে প্লেটে করে পাই নিয়ে ফিরল।

'এগুলো আবার কখন তৈরি করলে?' প্রশ্ন করল জাভেদ।

'আমি করিনি, এগুলো তৈরি করাই ছিল।'

জিকো অনেকক্ষণ কোন কথা বলেনি। অনেক ধকল গেছে ওর উপর দিয়ে। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পরে ঠাণ্ডার মধ্যে বেচারা পায়ে হেঁটে জ্বর নিয়ে ফিরেছে ক্যাম্পে।

জেনি মাত্র কামড় দিতে যাচ্ছিল ওর পাই-এ। সবাইকে অবাক করে লাফিয়ে উঠে জাভেদ ওর হাত থেকে পাইটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে।

'নিশ্চয়ই নীনা রেখে গেছে ওগুলো? তুমিও ওটা খেয়ো না, জিকো। ওই পাতকীকে বিশ্বাস নেই।'

বাইরে এতক্ষণ বার্টের কুকুর মন্টি ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করছিল। ওর চিৎকার থেমে গেল। বার্ট আর ফিরে আসেনি, কেউ ওকে মনে করে খেতেও দেয়নি আর। কাল থেকেই ভুখা আছে মন্টি।

জানালার কাছে এসে দাঁড়াল জাভেদ। কুকুরটা পাই মুখে করে নিয়ে গিয়ে একটু দূরে গিয়ে বসেছে। দুই থাবার মাঝখানে রয়েছে পাইটা। জাভেদকে

জানালায় দাঁড়াতে দেখে মন্টি একবার মুখ তুলে চাইল। জাভেদ ওর মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে না বুঝতে পেরে নিশ্চিন্ত হয়ে গোগ্রাসে গিলতে আরম্ভ করল সে।

জানালার ধারে জাভেদের পাশে এসে দাঁড়াল জেনি।

'মিছেই তুমি সন্দেহ করেছ নীনাকে।'

কোন জবাব না দিয়ে কুকুরটার দিকে চেয়ে রইল জাভেদ।

খাওয়া শেষ করে একটু অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়াল মন্টি। আধপাক ঘুরে তিড়িং করে লাফিয়ে শূন্যে উঠে ডিগবাজি খেয়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে। ঘেউ ঘেউ-এর বদলে কুকুরটার গলা দিয়ে করুণ কেঁউ কেঁউ শব্দ বেরুল। মাটিতে শুয়ে অস্থির ভাবে দাপাচ্ছে ও। আবার উঠে দাঁড়াল মন্টি। ছুটে দশ গজ এগিয়ে গেল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েই তেরছা ভাবে লাফ দিল। কাত অবস্থায় ধপাস করে মাটিতে পড়ল কুকুরটা। শোওয়া অবস্থাতেই পা ছুঁড়ে কয়েক পাক ঘুরল সে, তারপর দুবার পা খিঁচুনি দিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল। দেহ বাঁকিয়ে লেজের দিকে মুখ নিয়ে বনবন করে পাক খেতে লাগল মন্টি, যেন দ্রুত ছুটে লেজটাকে ধরার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু যতই এগুচ্ছে সে লেজটা ততই সরে যাচ্ছে। একটু পরে পরিশ্রান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল আবার। সমস্ত শরীর ঝাঁকিয়ে দুবার কাশি দিল, তারপর পিছনের বাম পায়ে একবার শেষ একটা খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল।

বড় বড় চোখ করে এতক্ষণ দেখছিল জেনি।

'পাইটা খেলে আমারও ওই অবস্থা হত!'

'ঠিক।' মৃদু হাসল জাভেদ।

কিন্তু হাসির ছিটেফোঁটাও নেই জেনির মুখে আয়ত দুই চোখে দু'ফোটা টলটলে জল।

'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, জাভেদ।'

'এ ছাড়া আমার উপায় ছিল না, জেনি।' হাসছে এখনও জাভেদ।

'মানে?'

'মানে, তা নইলে আমার মস্ত ক্ষতি হয়ে যেত!'

অবাক চোখে কয়েক সেকেন্ড জাভেদের মুখের দিকে চেয়ে রইল জেনি। তারপর মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি?'

'সত্যি।'

কাছে সরে এসে জাভেদের প্রশস্ত বুকে মাথা রাখল জেনি।

সস্নেহ চোখে ওদের এতক্ষণ দেখছিল জিকো। ঝক করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে। মনে মনে বলল, 'দুটোকে মানিয়েছে বেশ।'

***

জ্বলন্ত পাহাড়

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৩

এক

সামনে বিশাল বিজন প্রান্তর, পিছনে একদল সশস্ত্র লোক। প্রত্যেককেই ফাঁস তৈরি করা দড়ি নিয়ে তাড়া করে আসছে। উদ্দেশ্য একটাই–'শক্ত-পাল্লা'কে ফাঁসিতে ঝুলাবে। যুবককে পরিচিতেরা ওই নামেই ডাকে। দাঁড়ি-পাল্লা মার্কা ঘোড়ায় চড়ে বলেই তার ওই নামকরণ। 'দাঁড়ি-পাল্লা'র জায়গায় 'শক্ত-পাল্লা' কেন ডাকা হয়, তা ওকে কিছুটা চিনলে বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না।

একা বলে ভয় পাবার মানুষ সে নয়। প্রচুর শক্তি, ধৈর্য আর একটা আত্মবিশ্বাসী শক্ত মন আছে তার। তা ছাড়া সামনের জনহীন এলাকা সম্বন্ধে কিছুটা জানা আছে বলেই যেন ওর আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গেছে।

যারা ওর পিছনে ধাওয়া করেছে তারা খারাপ লোক না। রুক্ষ দেশের কট্টর রীতিনীতি ওদের কঠিন করেছে। প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি পেতেই হবে। কোন ক্ষমা বা দয়া দেখানো হবে না। মরু-এলাকার মানুষ–এই একটা ক্ষেত্রে ওরা মরুভূমির মতই নির্মম আর নিষ্ঠুর।

অ্যারিজোনা সীমান্তের কাছে চলে এসেছে 'শক্ত-পাল্লা'। উত্তর দিকে দিগন্তে ওপাশে রয়েছে ইউটাহ্ অঞ্চল। সীমান্ত পেরুতে হলে খটখটে শুকনো একটা মরুভূমি পাড়ি দিতে হবে। যদি সে পালানোর সিদ্ধান্তই নেয়, তবে আজ পর্যন্ত মরুভূমিতে বেঁচে থাকার যত কৌশল সে রপ্ত করেছে, সবই কাজে লাগবে এবার।

'শক্ত-পাল্লা'কে যারা ধাওয়া করেছে তাদের কেউ ওই সীমান্তের কথা জানে না। ওদের কাছে সীমান্ত হচ্ছে ম্যাপের উপর অর্থহীন একটা দাগ। আইনের সাথে বেআইনের, ন্যায়ের সাথে অন্যায়ের আর সত্যের সাথে মিথ্যার সীমারেখাই কেবল চেনে ওরা। ওদের মতে সেই সীমা লঙ্ঘন করেছে 'শক্ত-পাল্লা'। মুখ বুজে যা সহ্য করা যায় না, তাই করেছে সে।

সামনাসামনি মোকাবিলায় কেউ কাউকে গুলি করে হত্যা করাটা ওদের চোখে কোন অপরাধ নয়। ইউরোপেও আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য ডুয়েলের চল ছিল।

কিন্তু পিছন থেকে গুলি করে কাউকে হত্যা করা অবশ্যই কঠিন অপরাধ। ওদের বিশ্বাস 'শক্ত-পাল্লা' তাই করেছে। শাস্তি: ফাঁসিতে ঝুলতে হবে তাকে।

'শক্ত-পাল্লা' ওদের এই ধারণার কথা ভাল করেই জানে–বোঝেও। যারা ওর পিছু নিয়েছে তাদের কাউকেই সে ব্যক্তিগত ভাবে চেনে না। ওদের মধ্যে ভাল লোকও নিশ্চয়ই আছে, জানে সে–ভিন্ন পরিস্থিতিতে সে নিজেও ওদের একজন হতে পারত। ওদের মত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে হাতে হাত মিলিয়ে বহুবার বহু কাজ সে করেছে। একসাথে লড়েছে। পরিশ্রমী খেটে খাওয়া মানুষ ওরা। তাদের যা বিশ্বাস সেই অনুযায়ী উচিত কাজই করছে তারা।

এখন হয় তাকে পালাতে হবে নতুবা রুখে দাঁড়িয়ে মোকাবিলা করে ওদের

ঠেকাতে হবে। যুদ্ধে নামলে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে–অথচ ওদের কারও সাথে তার শত্রুতা নেই। ওদের চেনেই না সে।

'লোকটা যাচ্ছে কোথায়?'

'কোথায় আর যাবে–সম্ভবত বাড়ি ফিরছে। তবে বেশিদূর যাবার মত রসদ ওর সাথে নেই। শিগ্গিরই ওকে ধরে ফেলব।'

'ব্যাটা কোথাকার লোক?'

'জানি না। এদিককার কেউ চেনে না ওকে। দোকানে জানা গেল পালাবার আগে ব্যাটা মেয়েদের একটা মাথার ক্লিপ ছাড়া আর কিছুই সাথে নেয়নি।'

'চুলের ক্লিপ?'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করো, স্প্যানিশ মেয়েরা মাথার চুলের কারুকাজ করা চিরুনির মত যেসব ক্লিপ ব্যবহার করে, সেইরকম একটা ক্লিপই কেবল নিয়েছে।'

সূর্যের প্রখর আলোয় চোখ ছোট করে দূরে দিগন্তের দিকে চাইল কীথ। 'লোকটার ঘোড়াটা খুব ভাল। চমৎকার মাইলের পর মাইল পাড়ি দিয়ে চলেছে।'

'ঘোড়াটাকে দেখেছি আমি–বড় বাকস্কিন। ঘোড়ার মার্কা হচ্ছে দাঁড়ি-পাল্লা। এই মার্কা আগে কখনও দেখিনি।'

কয়েক মিনিট কেউ আর কথা বলল না। কেবল ঘোড়ার খুর আর চামড়ার জিন মোচড় খাওয়ার শব্দ হচ্ছে।

'মনে হচ্ছে অনেকখানি পথ এগিয়ে গেছে লোকটা,' দলের সবচেয়ে কমবয়সী সদস্য ইউজিন মন্তব্য করল। শুধু সর্বকনিষ্ঠই নয়, এই এলাকায় মাত্র চার বৎসর হলো এসেছে সে।

ওদের মধ্যে গিবনই ছাপ আর চিহ্ন দেখে অনুসরণ করায় সবচেয়ে অভিজ্ঞ। প্রথম থেকেই একটা ব্যাপার খেয়াল করে বেশ বিচলিত হয়ে উঠেছে সে–সামনের আরোহী একবারও তার ঘোড়াটাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটায়নি। ঘোড়ার পায়ের ছাপ থেকে সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে লোকটা, একটুও তাড়াহুড়ো করছে না। তার মানেই অনেক পথ পাড়ি দেওয়ার মতলব আছে ওর। অস্বস্তিভরে ভাবছে সে, অনেকটা সেধেই ঝামেলা কাঁধে নিয়েছে ওরা।

'ঘাগু লোক,' গিবনের মনের কথাটাই যেন ব্যক্ত করল লী। 'ঘোড়াকে অযথা বেশি হয়রান না করে পথ চলতে জানে। তা ছাড়া এসব এলাকাও ওর অপরিচিত নয়।'

খুর থেকে ধুলো উড়ছে। উত্তপ্ত রোদে ওদের পিঠ পুড়ে যাচ্ছে। তেতে উঠছে বিস্তীর্ণ পাথুরে প্রান্তর। খটখটে শুকনো জমির উপর তাপের ঢেউ দূর থেকে ঠিক পানির মত দেখাচ্ছে। আরও দূরে পাহাড়ের নীল মিছেই প্রাণ-জুড়ানো শীতলতার আশ্বাস দিচ্ছে।

বালির উপর দিয়ে ঘোড়ার পায়ের ছাপ ট্রেন-লাইনের মত সোজা সামনে এগিয়ে গেছে। পথে বড় পাথরের চাঁই বা কাঁটা ঝোপ এড়াতে দু'একবার একটু বাঁক নিয়ে সামান্য ঘুরে গেছে। ছয়জনের অনুসরণকারী দলটা কিছুটা অনিশ্চিত ভাবেই সামনের লোকটার মনে কী আছে ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছে।

চিহ্ন দেখে দেখে কাউকে অনেকক্ষণ অনুসরণ করলে লোকটা সম্পর্কে অনেক কিছু আপনাআপনি জানা হয়ে যায়। মাটির উপরকার দাগ দেখেই লোকটার কোমলতা, নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞতা, চাতুরী, শক্তি, সাহস আর দুর্বলতার অনেক আভাস পাওয়া যায়। ছাপার অক্ষর পড়তে না জানলেও কেউ কেউ চিহ্ন দেখেই একজনের নাড়িনক্ষত্র বলে দিতে পারে।

ফ্রীডম শহর ছেড়ে বেরিয়ে 'শক্ত-পাল্লা'র পিছু নিয়ে এখন পর্যন্ত অনেক কিছুই জেনেছে ওরা—তবু জানার এখনও প্রচুর বাকি।

'ব্যাপারটা কীভাবে শুরু হলো?' প্রশ্ন করল ওদের একজন।

হাতের ঘাম মুছতে অন্য হাতে রাইফেলটা ধরল গিবন। বাতাসে পিছনের লোকটা যেন শুনতে পায় এমন ভাবে একটু ঘাড় ফিরিয়ে সে জবাব দিল, 'লোকটা দোকান থেকে খাবার কিনছিল, এইসময়ে ডেরিক কিছু একটা মন্তব্য করলে লোকটা খেপে যায়। ডেরিকের কোমরে পিস্তল থাকলেও লোকটা ছিল নিরস্ত্র। তাই ডেরিক ওকে পিস্তল সহ তৈরি হয়ে আসতে বলেছিল। শাসিয়েছিল ফিরে না এলে তাকে খুঁজে বের করে কুকুরের মত গুলি করে মারবে সে।

'ও যখন ফিরে আসে ডেরিক তখন বারে দাঁড়িয়ে। ঠেলা দিয়ে বারের দরজা খুলেই ডেরিকের পিঠে পরপর দু'বার গুলি করে সে। বারে মদ খাচ্ছিল ডেরিক। তৃতীয় গুলিতে একটা হুইস্কির বোতল ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।'

এক মুহূর্ত নীরব থেকে ইউজিন জানতে চাইল, 'আমরা ওকে ফাঁসি দেব ডেরিককে মারার, নাকি হুইস্কির ভরা বোতল ভাঙার অপরাধে?'

প্রশ্নটা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ওর প্রশ্নের জবাব দিয়ে নিজেদের খেলো করল না কেউ।

সামনে সাদা আর তামাটে রঙের প্রান্তরে বিক্ষিপ্ত ভাবে একবার চোখ বুলাল ইউজিন। কোথাও গভীর ফাটল, কোথাও বা পুরোনো লাভা স্রোতের কালো ধারা জমিতে ছেদ ঘটিয়েছে।

কাউকে ধরে বেঁধে হত্যা করা সমর্থন করে না ইউজিন। তা ছাড়া যার পিছনে ধাওয়া করা হচ্ছে তাকে চেনা তো দূরের কথা কোনদিন চোখেও দেখেনি সে। মিলেমিশে থাকতে হলে প্রতিবেশীদের সুখে দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়ানো উচিত, তাই নেহায়েত কর্তব্য পালন করতে এসেছে ও।

ফ্রীডম শহরে কোন আইন-আদালত নেই। জনমতই ওখানকার আইন। প্রত্যেকে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শিখে নেয় ছেলে বেলাতেই। দরকার পড়লেই অস্ত্র ব্যবহার করে ওরা। পশ্চিমের এই ধরনের শহরেই সাধারণত বেআইনী ডাকাত আর বন্দুকবাজ লোকেদের আস্তানা গড়ে ওঠে—কিন্তু ফ্রীডমের বেলায় তা ঘটেনি।

'গোলাগুলিটা কে দেখেছে?' হঠাৎ প্রশ্ন করল ইউজিন।

'আসলে এত দ্রুত ঘটে গেছে যে কেউই ঠিক দেখেনি কেমন করে কী ঘটল। বারের অন্যদিকে কাজে ব্যস্ত ছিল ফ্রেড। তবে এটা ধরেই নেয়া যায় লোকটা ডেরিককে কোন সুযোগই দেয়নি—পিস্তলে ডেরিকের খুব ভাল হাত ছিল।'

কথাটা ইউজিনকে মনে মনে স্বীকার করতেই হলো। পিস্তল চালনায় রীতিমত ওস্তাদ ছিল ডেরিক। এ নিয়ে বেশ গর্বও ছিল তার। তবে নতুন লোকের সাথে

ডেরিকের একটু বেয়াড়া ব্যবহার করার অভ্যাস ছিল।

বাতাসে ধুলোর পরিমাণ বেড়েই চলেছে। অন্যদের দেখাদেখি ইউজিনও মুখে রুমাল বেঁধে নাক মুখ ঢেকে নিল। ঘোড়ার সাথে বাঁধা পানির বোতলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দে পানির পিপাসা প্রবল হয়ে উঠছে তার। কিন্তু দলের প্রবীণ কেউ এখনও পানি ছোঁয়নি—তা ছাড়া পানির স্বাদও এখন ঝাঁঝাল আর গরম হবে ভেবে ওই চিন্তা বাদ দিল সে।

'কীথ, লোকটাকে দেখলে চিনতে পারবে তুমি?' প্রশ্ন করল লী।

'মনে হয় পারব। তিরিশের কাছাকাছি বয়স—শক্ত-সমর্থ মাঝারি গড়ন। দোকানের লোকজনের ধারণা লোকটা খুব শক্তিশালী। সেইজন্যেই ওকে "শক্ত-পাল্লা" নাম দিয়েছে ওরা।'

লী নিজেও দড়ির মত পেশীওয়ালা শক্তিধর পুরুষ। অত্যন্ত পরিশ্রমী লোক সে। ফ্রীডম শহরে এসে প্রথম বছরেই অমানুষিক পরিশ্রম করে নিজের পশু-খামারটাকে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে ও। প্রতিবেশী হিসাবেও সে খুব ভাল। ইউজিনের বাসার কাছে যখন বনে আগুন লেগেছিল তখন লী-ই প্রথম ছুটে এসেছিল সাহায্য করতে।

লী পৌঁছানোর প্রায় সাথে সাথেই কীথও ওয়্যাগন ভর্তি ভিজে ছালা আর কোদাল নিয়ে হাজির হয়েছিল। গত বছর গিবন ভাঙা পা নিয়ে যখন বিছানায় পড়ল তখনও কীথই কঠিন শীতের মাসগুলোতে নিজের পশুর জন্য তুলে রাখা খাবার খাইয়ে গিবনের গরু-মহিষগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এজন্য ওকে প্রচুর বাড়তি পরিশ্রমও করতে হয়েছিল।

লী-র বন্ধু ছিল ডেরিক। লী-কে ওর পশু তাড়িয়ে আনতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই এসেছিল সে। এদিকে একটা পছন্দসই জায়গা পেয়ে শেষ পর্যন্ত এখানেই থেকে যায়।

ডেরিক ছিল যেমন দুঃসাহসী তেমনি বখাটে। তামাশার খাতিরে অন্যের ক্ষতি করতেও দ্বিধা করত না। তবু লোকটা খুব ফুর্তিবাজ ছিল বলে সবাই বেশ পছন্দ করত ওকে। কারও বুনো ঘোড়া পোষ মানানোর দরকার পড়লে নিজে থেকেই এগিয়ে যেত সে। নিছক উত্তেজনা আর চ্যালেঞ্জের টানেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিনে পয়সায় অন্যের ঘোড়া বশ করে দিত। চতুর পিস্তলবাজ ছিল সে। সামনাসামনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ওর সাথে কারও পারার উপায় ছিল না।

ফ্রীডমে এসে ইউজিন তার মিষ্টি স্বভাব দিয়ে সবার সাথে বন্ধুত্ব গড়ে নিতে দেরি করেনি। ওহাইওতেও খামারের কাজই করত। পশ্চিমের আচার আর রীতির সাথে নিজেকে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিয়েছে সে। পশ্চিমী নিয়মে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যখন তাকেও দলের একজন হিসাবে নির্বাচন করা হলো, গর্বে ওর বুকটা ফুলে উঠেছিল। ওরা যে তাকে নিজেদের একজন করে নিয়েছে, এ বিষয়ে এখন সে নিঃসন্দেহ।

কিন্তু ইউজিনের মনে পড়ে সে এই এলাকায় যখন নতুন, ডেরিক কিছুতেই তাকে সহ্য করতে পারত না। লী আর অন্যান্য সবাই ওকে মেনে নেওয়ায় বাধ্য হয়েই শেষে চুপ হয়ে গেছিল ডেরিক। অবশ্য, ওর যত দোষই থাকুক না কেন,

পিঠে গুলি করে ওকে মারা খুবই অন্যায় হয়েছে আগন্তুকের।

'ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে চলছে লোকটা।' হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল লী।

'লোকটা খুব চালাক,' মন্তব্য করল গিবন। 'বেশ ভোগাবে বলেই মনে হচ্ছে।'

'হয়তো ওর ঘোড়াটা খোঁড়া হয়ে গেছে,' বলল ক্লাইভ।

'না, খুঁড়িয়ে চলার কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু একটা মতলব আছে ওর।'

ধীরে ধীরে আরও মাইল দু'য়েক পথ এগিয়ে গেল ওরা। বালির বদলে এদিকটায় পুরু ধুলো। একটা জায়গায় ধুলোর উপর পাশাপাশি দু'টো চাপড়া দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কিছু যেন ছলকে পড়েছে। ওদিকে এগিয়ে গিয়েছিল বার্ট। 'পানি,' জানাল সে।

'সাবধানে খরচ না করলে পানির টান পড়বে ওর,' বলল ইউজিন।

'বাজি রেখে বলতে পারি পানি দিয়ে ঘোড়ার নাক মুছিয়েছে লোকটা,' বলল লী। 'এই ধুলো ঘোড়ার শ্বাসের খুব ব্যাঘাত ঘটায়। এর মধ্যে দিয়ে কেউ ঘোড়া ছুটিয়ে চললে ঘোড়া মারা পড়তে পারে।'

ওরা যাকে অনুসরণ করছে সে তার ঘোড়াকে স্বাভাবিক গতিতেই এতক্ষণ চালিয়ে এসেছে। কিন্তু তাকে যদি ওরা ধরে ফেলার উপক্রম করে তবে সে উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাবে, সন্দেহ নেই। মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে ঘাম মুছল ইউজিন। বিশেষ করে ওর জন্যই পাথরের জগে দুধ রাখে ওর বৌ-ঠাণ্ডা থাকে। বাড়ি ফেরার জন্য ওর মনটা কেমন যেন ছটফট করে উঠল।

সূর্যের দিকে চাইল সে। এতক্ষণ ওটা ডাইনে ছিল-হঠাৎ করে কী করে যেন সেটা তাদের বাঁয়ে চলে এসেছে। খেয়াল করে দেখল ট্রেইলটা এখানে এসে দ্রুত চক্রাকারে ঘুরে গেছে। গিবন নেতৃত্ব দিচ্ছিল-একটা গালি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

সবাই ওর পাশে পৌঁছে দেখল অল্প কিছু দূরে শুকিয়ে যাওয়া খালের মত একটা জায়গা। যেখানে ঘোড়া বাঁধার চিহ্ন রয়েছে। তার পাশেই পাথর চাপা দেওয়া একটা কাগজ বাতাসে শব্দ তুলে উড়ছে।

ঘোড়া চালিয়ে নীচে নেমে কাগজটা তুলে নিয়ে এল লী। কাগজের উপর চোখ বুলিয়ে মুখে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে ওটা গিবনের দিকে এগিয়ে দিল সে। চিরকুটটা ওদের উদ্দেশেই লেখা হয়েছে।

'গোলাগুলিতে আমার দিক থেকে কোন অন্যায় হয়নি-তবু আমার পিছনে লেগেছ কেন? আর লাগতেই যদি চাও মোটে ছয়জন এলে কেন? ফিরে যাও, আরও লোকজন নিয়ে এসো। ছাইয়ে রঙের ঘোড়াটার জিনের পেটি এখনই শক্ত করে বাঁধা না হলে ওর পিঠের দশা খুব খারাপ হবে।'

লেখাটার নীচে কোন সই নেই।

'আস্পর্ধা!' বিড়বিড় করে বলল বার্ট। 'কিন্তু ওর রাইফেলের মুখে মাত্র চল্লিশ গজের মধ্যে আমাদের সবাইকে পেয়েছিল লোকটা!'

লজ্জায় লাল হয়ে ঘোড়ার জিনের পেটি শক্ত করে বেঁধে নিল ইউজিন। কিন্তু ওকে লক্ষ করছে না কেউ। সবাই তার মতই অপ্রস্তুত হয়েছে ওই চিরকুটটা ওদের সবার জন্যই অপমানজনক। ওতে কিছু ভাল উপদেশ থাকলেও চটেছে সবাই। কিন্তু চটলে কী হবে–সেই সাথে একটা অজানা ভীতিও ওদের মনে ঢুকছে। এত কাছে থেকে ইচ্ছা করলে লোকটা সহজেই ওদের কয়েকজনকে ঘায়েল করতে পারত!

'শক্ত-পাল্লা' ওদের খেলাচ্ছে! আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে ওদের। ওরা ধরেই নিয়েছিল যে লোকটা ওদের সামনে রয়েছে–প্রাণভয়ে পালাচ্ছে সে। ওরা যে কতটা অসতর্ক তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ায় ওরা মনে মনে খেপেছে।

'অন্যায় হয়নি! বললেই হলো?' ফুঁসে উঠল ক্লাইভ। 'পেছন থেকে পিঠে গুলি করে এখন সাফাই গাইছে ব্যাটা!

অত্যন্ত সাবধানে আবার এগোল ওরা। একবার ওদের হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলেও পরেরবার লোকটা কী করবে বলা যায় না।

অনুসরণ করা এখন কঠিন হয়ে উঠছে। নানা রকম ফন্দি খাটিয়ে লোকটা ধোঁকার সৃষ্টি করছে। চিরকুটটা পাওয়ার পর থেকেই আরও সাবধানী হয়েছে ওরা। ফাঁদ পাতা যায় এমন প্রতিটি জায়গায় ওরা খুব সতর্কতার সাথে নিশ্চিত হয়ে তবে এগোচ্ছে। বারবার দেখা যাচ্ছে মিছেই ভয় পেয়েছে ওরা–কিন্তু বেশি সাহস দেখাতে গিয়ে মরতে রাজি নয় কেউ।

একটা উপত্যকার ভিতর দিয়ে চলেছে ওরা। একটু আগে মাঝে-মধ্যে দমকা হাওয়া বইছিল–এখন তাও নেই। দু'পাশের দেয়াল আর মাটি থেকে আভেনের মত ভাপ বেরুচ্ছে। তাপে গা ঝলসে যাচ্ছে–ঘামের লবণে জ্বলছে চোখ। শরীরের ভাঁজে ধুলো জমে ঘামের সাথে মিশে লেই-এর মতো চাপড়া বেঁধেছে–চুলকাচ্ছে। তবু এগিয়েই চলল ওরা।

আর একটু সামনে দেখা গেল উপত্যকাটা চওড়া হয়ে বিস্তৃত একটা গামলার আকার নিয়েছে। বৃষ্টির পানি জমে মাঝখানে একটা লেকের সৃষ্টি হয়েছে। বদ্ধ পানি, ক্ষারে ভরা।

'শক্ত-পাল্লার' পায়ের ছাপ লেকের পানিতে নেমে মিলিয়ে গেছে। বোকার মত সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা।

'এর ভিতর দিয়ে কিছুতেই পাড়ি দেয়নি লোকটা,' বলে উঠল গিবন। 'মাঝখানে অনেক পানি–তা ছাড়া কাদায় ঘোড়া ফেঁসে যাবার সম্ভাবনাও আছে।'

দু'টো দলে ভাগ হয়ে লেকের পাড় দিয়ে দু'দিকে রওনা হলো ওরা। পাঁচশো গজ যেতে না যেতেই পিছন থেকে ডাক শুনে ইউজিন ঘাড় ফিরিয়ে চাইল। লী ওদের হাতের ইশারায় ফিরে যেতে বলছে। লোকটা ঘোড়া নিয়ে কোথায় পানি থেকে উঠে এসেছে তা খুঁজে পেয়েছে লী।

খুব সহজ সাধারণ একটা চালাকি। কিন্তু ওদের এতে বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হলো। ভিতরে ভিতরে রেগে উঠছে ইউজিন। ছিপে মাছ খেলানোর মতই ওদের খেলাচ্ছে লোকটা!

রওনা হবার সময়ে ভেবেছিল কাজ শেষ করে আজ রাতেই নিজের র‍্যাঞ্চে

ফিরতে পারবে সে কিন্তু যতই সময় যাচ্ছে ওর কাছে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছে যে কাজটা মোটেই সহজ হবে না। ওরা রাতে কোথায় কখন ক্যাম্প করে একটু বিশ্রাম নেবে সেটা পর্যন্ত ওই লোকটার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে এখন। ওরা না জানলেও শক্ত পাল্লা ঠিকই জানে সে কোথায় চলেছে। ইচ্ছা করেই সবচেয়ে কঠিন আর দুর্গম পথ সে বেছে নিয়েছে। হয়তো আশা করছে অতিষ্ঠ হয়ে ফিরে যাবে ওরা।

খুরের ছাপগুলো দ্রুত বাঁ-দিকে ঘুরে পাহাড়ের ঘন ঝোপগুলোর দিকে এগিয়ে গেছে।

'ব্যাটা যাচ্ছে কোন্ চুলোয়?' অসহিষ্ণু স্বরে বলে উঠল লী। 'আমি তো এর মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝছি না।'

ওর কথার জবাব দিল না কেউ। লম্বা সার বেঁধে ক্লান্ত দেহে আবার এগিয়ে চলল ওরা। সবার আগে কীথ। চলতে চলতে হঠাৎ রাশ টেনে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। পাহাড়ের ফাটল থেকে ছোট্ট একটা পানির ধারা ফোঁটায় ফোঁটায় নীচে পড়ে পাথরের বাটির মত একটা জায়গায় জমা হচ্ছে।

'কী আশ্চর্য!' বলে উঠল গিবন। 'আমি ভাবতেও পারিনি এখানে পানি আছে।'

ঘোড়া থেকে নামল কীথ। ওর দেখাদেখি অন্যেরাও। 'খুব তেষ্টা পেয়েছে আমার–সাধ মিটিয়ে পানি খেয়ে নিই।' পাথরে ঘেরা পরিষ্কার পানি দেখিয়ে সে বলল, 'মনে হচ্ছে এটা যেন নতুন তৈরি করেছে কেউ।'

আশপাশটা ঘুরে দেখছিল গিবন। নতুন পুরোনো সব রকম পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে দেখে সে মন্তব্য করল, 'এটা ওরই কাজ। কিন্তু অবাক লাগছে ভাবতে যে ব্যাটা এই জায়গাটা খুঁজে পেল কীভাবে?'

'আমার মনে হচ্ছে এই এলাকা লোকটার চেনা,' বলল বার্ট।

শব্দ করে হেসে উঠল গিবন। 'সত্যি শক্ত-পাল্লায়ই পড়েছি আমরা। পথ দেখিয়ে আমাদের এমন জায়গায় নিয়ে এসেছে যে বাধ্য হয়ে দেরি করতেই হবে। দু'টো ঘোড়াকে খাওয়াতেই পানি শেষ হয়ে যাবে। অন্য ঘোড়াগুলোকে খাওয়ানোর জন্যে কতক্ষণে আবার পানি ভরবে সেই আশায় আমাদের বসে থাকতে হবে।'

'চালাকি সবই জানা আছে ব্যাটার–ধড়িবাজ লোক,' নিজের মতামত প্রকাশ করল ক্লাইভ।

'তোমার কি মনে হয় লোকটা রুখে দাঁড়িয়ে ফাইট করবে?' প্রশ্ন করল বার্ট।

'সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী,' মুরুব্বিয়ানা চালে জবাব দিল লী। 'আমিও তাই চাই–দেখতে চাই কত বড় বাহাদুর সে।'

ওর রাগে লাল হওয়া চেহারাটা চট করে একবার দেখে নিয়ে নিচু স্বরে গিবন বলল, 'তোমার মত না পারলেও কারও রেখে যাওয়া চিহ্ন দেখে মানুষটাকে আমিও মোটামুটি চিনতে পারি। পুরোপুরি বুঝে কথাটা বলছ তো?'

জিভ দিয়ে নিজের শুকনো ঠোঁট চেটে একেএকে সবার মুখের দিকে চাইল ইউজিন। কেউ যেন একটা কঠিন শীতল স্রোত বইয়ে দিয়েছে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে। স্পষ্ট ভয়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে ওদের প্রত্যেকের চেহারায়।

নিজের উপর লোকটার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। সে জানিয়ে দিয়েছে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই মরেছে ডেরিক। ওদের সবাইকে হাতের মুঠোয় পেয়েও কেবল চিঠি দিয়ে সাবধান করেই ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ইচ্ছা করলে সে সবাইকে ওখানে গুলি করে হত্যা করতে পারত। বোঝাই যাচ্ছে যদি রুখে দাঁড়াতেই হয়, তবে নিজের সুবিধা মত, আর ওদের জন্য সবচেয়ে বেকায়দা জায়গা বেছে নিয়েই সে তা করবে।

কাপুরুষ নয় ইউজিন। কিন্তু জেনেফারের কথা ভেবে মনে মনে খুব দমে গেছে সে। র‍্যাঞ্চে তার স্ত্রী একা। আজ যদি সে এখানে মারা যায় তবে জেনেফার চলবে কী করে? তাকে ছাড়া যে কিছুই বোঝে না সে-ওই ছোট খামারটাকে ঘিরে ওদের দু'জনের এত আশা, এত পরিকল্পনা সব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। সবকিছু বেচে দিয়ে তাকে বাপ-মার কাছে ফিরে যেতে হবে।

সূর্যের প্রচণ্ড তাপ কিছুটা কমে এসেছে। অস্ত যাবার আগে সূর্যটা যেন একটু নরম আর রঙীন শুভেচ্ছার প্রলেপ মাখিয়ে দিচ্ছে উত্তপ্ত মরুভূমির উপর। দূরে কোথাও একটা তিতির পাখি ডেকে উঠল। ওদের ডান দিক থেকে আর একটা তিতির তার জবাব দিল।

ক্ষান্ত দিলেই তো হয়-ভাবল ইউজিন। উপায় থাকতে থাকতেই তাদের ফেরা উচিত।

মনে মনে ভাবলেও কথাটা কাউকে জানাল না সে। হয়তো কথাটা অন্যদের মনেও উদয় হয়েছে, কিন্তু মুখে কেউ তা বলল না। একটা কাজ নিয়ে বেরিয়েছে ওরা, এর শেষও ওদেরই দেখতে হবে। অন্যায়কারীকে শাস্তি দিয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

'লোকটা আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে,' বলল লী।

যাকে অনুসরণ করা হচ্ছে সে-ই যেন শুরু থেকেই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। পালাবার সময়ে বেশির ভাগ লোকই কোনমতে প্রাণ নিয়ে বাঁচার চিন্তায় থাকে, পিছনে যারা ধাওয়া করছে তারা কী ফন্দি আঁটছে, এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু এই লোকটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। কোন তাড়াই যেন নেই ওর। নিশ্চিত মনে নিজের খুশি মত ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, দেরি করাচ্ছে, খেলাচ্ছে।

অস্বস্তির মধ্যে সবার মনে ঘুরে ফিরে বারবার একই ভাবনা হচ্ছে-এর শেষ কোথায়? লোকটা যখন আবারও নিজের ইচ্ছামত ওদের মুঠোর মধ্যে পাবে, তখন কী ঘটবে? ওদের কয়জন মারা পড়বে?

ন্যায়নিষ্ঠাই ওদের ফিরে যেতে বাধা দিচ্ছে। ডেরিকের জীবনের বিনিময়ে নিজের জীবন দিয়েই দেনা শোধ করতে হবে লোকটাকে।

আবার জেনেফারের কথা ইউজিনের মনে পড়ে গেল। এখন নিশ্চয়ই বাচ্চাটাকে খাওয়াচ্ছে সে, আর মনে মনে তার কথা ভাবছে। কখন সে ফিরবে এই আশায় আভেনে তার খাবার গরম রাখছে। এমন ঘটবে তা কেউই আশা করতে পারেনি। সবাই মনে করেছিল সামান্য গোলাগুলির পরে সহজেই কাজ উদ্ধার করে ফিরতে পারবে ওরা।

চিন্তিত হলো ইউজিন। শেষ পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে ফিরতে যদি পারেও, অন্তত সপ্তাহখানেক বাইরেই কাটাতে হবে তাকে।

দুই

আবার এগিয়ে চলল ওরা। ঘোড়ার পায়ের ছাপ পাহাড় ঘেঁষে সীডার আর স্প্যানিশ বেরোনেটের ছোট ঝোপগুলোর দিকে গেছে। ঝড় বাদলে ক্ষয়ে যাওয়া ফাটল আর প্রান্তরের উপর দিয়ে আগ্নেয়লাভার কালো স্রোত সরু আঙুরের মত দেখাচ্ছে—মনে হচ্ছে কেউ যেন একটা বিশাল কালো হাত বাড়িয়েছে নীচের লোকটাকে ধরার জন্য।

'শক্ত-পাল্লা'র কোন তাড়া নেই। রেড ইন্ডিয়ানদের মত দক্ষতার সাথে এগিয়ে চলেছে সে। ঘোড়ার চলতে সুবিধা হবে জেনেও সোজা পথ না ধরে কঠিন পথে চলছে লোকটা। নিজের অজান্তেই ওদের মনে একটা অজানা ভয় ঢুকেছে—সবাই ভাবছে, ওই প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী লোকটার সামনাসামনি দাঁড়ালে কী ঘটবে?

ছোট মেসাটার (mesa—মালভূমির মত জায়গা) মাথায় উঠে ঘোড়াটাকে একটু বিশ্রাম দেওয়ার জন্য থামল লী। অল্পক্ষণের মধ্যেই দলের বাকি সবাই ওকে ঘিরে দাঁড়াল। প্রত্যেকেই ওরা পরিশ্রমী লোক, কিন্তু নিজের র‍্যাঞ্চ ছেড়ে এর আগে আর এতদূর উত্তরে আসেনি কেউ।

'লোকটার মতলবটা কী বলো তো, গিবন?' প্রশ্ন করল লী। 'আমি যতদূর জানি ওদিকে কিছুই নেই—একেবারে ফাঁকা।'

'পশ্চিমে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না—ওদিকটায় গভীর খাড়া খাদ। ওদিক দিয়ে যেতে হলে বন্ধুকে পাখা গজিয়ে উঠে যেতে হবে।' সামান্য একটু পানি মুখে নিয়ে কুলি করল গিবন। তারপর আবার বলল, 'ওদিকটায় কিছু নেই বলেই জানি আমরা—কিন্তু কে জানে? একমাত্র শক্ত-পাল্লাই বলতে পারবে ওখানকার খবর।' পানির বোতলটা আবার সাবধানে ঘোড়ার পিঠে ঝুলিয়ে রাখল সে। মাথা নাড়ল এপাশ-ওপাশ। 'কঠিন লোকের পাল্লায় পড়েছি—সহজে ধরা যাবে না ওকে।'

'যত কঠিনই হোক, ওকে ফাঁসিতে না ঝুলিয়ে কোনমতেই ফ্রীডমে ফিরছি না আমি,' মনের ক্ষোভ প্রকাশ পেল লী-র কথায়।

কোন স্থির সিদ্ধান্ত এখনও নিতে পারেনি ইউজিন। সে জানে শহরের অধিবাসী হিসাবে তারা নিজেরাই সেখানকার আইন-শৃঙ্খলার জন্য দায়ী। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারলে স্বেচ্ছাচার আর বিশৃঙ্খলার মাঝে বাস করতে হবে তাদের। এগিয়ে যাওয়ার পিছনে জোরাল যুক্তি অবশ্যই আছে—তবু মন থেকে উৎসাহ বা সায় পাচ্ছে না সে। অন্যান্য শান্তি-প্রিয় লোকের মত সেও চায় নির্ঝঞ্ঝাটে স্ত্রীকে নিয়ে জীবনটা উপভোগ করতে। পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার স্বাদ গ্রহণ করতে চায় সে।

লী-র দিকে চেয়ে ইউজিনের নিজেকে খুব ছোট মনে হলো। অন্যান্য সবার মত নিষ্ঠা কেন নেই তার? এটা তো সত্যি কথাই যে কঠিন হাতে আইন রক্ষা

করতে না পারলে কারোই জানমালের কোন নিরাপত্তা থাকবে না। তবু তার মনে হচ্ছে এই কাজে তাকে নিজে উপস্থিত থাকতে না হলেই যেন ভাল হত। এই ভীরু মনোভাবের জন্য মনে মনে লজ্জা পাচ্ছে সে—কিন্তু শহরে সবাই ভোট দিয়ে একজন মার্শাল নিযুক্ত করে তার উপরই এসব কাজের দায়িত্ব দিলেই তো পারে?

মেসাটা প্রায় বর্গাকার। দৈর্ঘ্য আর প্রস্থে দু'দিকেই প্রায় সিকি মাইল হবে। ঘোড়ার খুরের চিহ্ন মাঝে মধ্যে দেখা যায়। একটা অস্পষ্ট সাদা আঁচড়ের দাগ রয়ে গেছে পাথরের উপর। লোকটা মেসা থেকে কোন্ পথে নেমেছে তা খুঁজে বের করতেই ওদের প্রায় আধঘণ্টা সময় লেগে গেল।

নীচে নামার পথে বিজ্ঞের হাসি হেসে গিবন বলল, 'ওর মাত্র কয়েক মিনিট লেগেছে—কিন্তু আমাদের অনেক বেশি সময় লাগল। ঘনঘন এরকম চাল চালতে পারলে ওর আর ছুটে পালাবার দরকার পড়বে না।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। নিচু জায়গাগুলোতে অন্ধকার ছায়া নেমেছে। আকাশে চলেছে বিচিত্র রঙের খেলা। ওদের সামনে যতদূর দেখা যায় ছোট বড় সারি সারি অগুনতি বালির ঢিবি। তারপরই প্রায় হাজার ফুট উঁচু একটা মেসা।

'আমাদের ভাগ্য ভাল লোকটা ওঁৎ পেতে বসে নেই,' বলল গিবন। 'থাকলে নিজের খুশি মত এক এক করে সাবাড় করতে পারত আমাদের।'

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বিকট শব্দের সাথে একটা গুলি ছুটে এসে পাথরে বাড়ি খেয়ে আর এক দফা গর্জে উঠল। ছুটাছুটি করে ওরা যে যেখানে পারল আশ্রয় নিল।

বার্ট তার ঘোড়া থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ে হামাগড়ি দিয়ে একটা বালির স্তূপের আড়ালে লুকাল। ঘোড়াটা হতভম্ব হয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। জিনের পিছনে পানির পাত্রটা উঁচু হয়ে রয়েছে। আবার গুলি হলো। ঘট্ করে একটা বুলেট গাঁথার শব্দ হতেই ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠল।

অশ্রাব্য গালি বেরিয়ে এল বার্টের মুখ দিয়ে। 'ঘোড়াটাকে যদি মেরে ফেলে তা হলে...'

একটু অস্থিরভাবে নড়ে উঠে অক্ষত অবস্থায় সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল ঘোড়াটা। ফুটো পাত্র থেকে দ্রুত ধারায় পানি গড়িয়ে পড়ছে।

কাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বে ওরা? চারদিক খুঁটিয়ে চেয়ে দেখেও কাউকেই ওদের নজরে পড়ল না। ট্রেইল অনুসরণ করে একটা বালির ঢিবির আড়ালে চলে এসেছে ওরা। ঢিবির ওপাশ থেকেই এসেছে গুলি।

পানির বেগ কমে গিয়ে এখন কেবল ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে। গুলিটা পাত্রে না লেগে কারও মাথায় লাগলে মাথাটারও ওই অবস্থা হত।

সবাই বেশ বুঝতে পারছে ওদের পানির পাত্র খালি হবার পরিণাম কী হতে পারে। ঝর্ণা থেকে সবাই নিজেদের পাত্র ভরে নিয়েছে সত্যি, পানির টান পড়ার কথা নয়—কিন্তু যার পিছু ওরা নিয়েছে সে ছাড়া, কত পথ ওদের চলতে হবে তা কারোই জানা নেই। নিশ্চয়ই অকারণে লোকটা ওটা ফুটো করেনি।

কেউ নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ছে না। ঢিবির আড়ালে ছায়ায় এখন কিছুটা কম হলেও যথেষ্ট গরম। সবাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে।

'অনেক আগেই কেটে পড়েছে লোকটা,' আর চুপ করে থাকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করল ক্লাইভ। কিন্তু ওর কথাটা সত্যি কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার আগ্রহ কেউ প্রকাশ করল না। মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে একটা পাথরের পিছন থেকে সামান্য উঁচু করে তুলে ধরল সে। কিছুই ঘটল না। অনেকক্ষণ হ্যাটটা শূন্যে ধরে থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে ওটা নামিয়ে নেওয়ার সাথে সাথেই একটা গুলি এসে ওর খুব কাছেই বালি ছিটিয়ে মাটিতে ঢুকল। নিজের উপস্থিতি বুঝিয়ে দিল 'শক্ত-পাল্লা'—সেই সাথে আরও একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল, এসব ফালতু ছেলে ভুলানো চালাকিতে কাজ হবে না।

ওদের ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বিশ্রাম নিচ্ছে। উত্তপ্ত বালির উপর শুয়ে ওদের আরও গরম বোধ হচ্ছে। অত্যন্ত ক্লান্ত ইউজিন। একটু একটু করে ছায়ার দিকে সরে গিয়ে বিশ্রামের চেষ্টায় দেহটাকে শিথিল করে ছেড়ে দিয়েছে সে।

আধঘণ্টা পেরিয়ে গেল। কিছুই ঘটল না দেখে গিবন সাহস করে ধীরে ধীরে ক্রল করে ঘুরে টিলার পিছন দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আরও অনেকক্ষণ সময় পার হলো। দূর থেকে একটা ডাক শুনে ইউজিনের ঝিমুনি ছুটে গেল। যেখান থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে গিবন হাতের ইশারায় ওদের ডাকছে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে গিবনের দিকে এগিয়ে গেল সবাই।

বালুর উপর পাশাপাশি তিনটে ব্যবহৃত পিতলের কার্তুজ পড়ে আছে। আঁচড় কেটে মাটিতে একটা তীর চিহ্ন আঁকা। নীচে লেখা—চিহ্ন দেখে এগোও।

রাগে মাথা থেকে হ্যাট খুলে লেখাটার উপর ছুঁড়ে মারল লী। 'স্পর্ধা দেখে গা জ্বলে যায়। শালা হারামীর বাচ্চা!' পা দিয়ে ঘষে লেখাটা মুছে ফেলল সে।

'লোকটা টিটকারি মেরে খেলো করতে চাইছে আমাদের,' তিক্ত ভাবে বলে উঠল বার্ট। 'ব্যাটার উচিত শাস্তি হওয়া দরকার!'

আবার রওনা হলো ওরা। পরিষ্কার চিহ্ন রেখে গেছে সামনের লোকটা। জায়গায় জায়গায় আবার ভাঙা ডালপালা বা পাথর দিয়ে তীর চিহ্ন এঁকে রেখে গেছে!

প্রত্যেকেই ওরা দায়িত্বশীল লোক—গুরুত্বপূর্ণ কাজে বেরিয়েছে। এই ধরনের ইয়ার্কি ফাজলামি ওদের অক্ষমতার জ্বালা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। লোকটা শুধু ওদের বোকা বানিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে, সেটা আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েও দিচ্ছে। কিন্তু কথা হচ্ছে ওর সাথে যে জাতের ঘোড়া রয়েছে তাতে চলতে জানলে কয়েকদিন কেন, কয়েক সপ্তাহও একটানা চলতে পারবে সে।

বিশাল ঢালের মাঝখানে ছোট লেকটাকে পিছনে ফেলে অনেকদূর এগিয়ে এসেছে ওরা। পড়ন্ত বিকেলের নিস্তেজ সূর্যের আলোয় একটা ঝাপসা বেগুনী পর্দার আড়ালে হারিয়ে গেছে ওটা। সামনেই একটা ছোট পাহাড়ের গায়ে একটা বড় পাথরের উপর খড়িমাটি দিয়ে লেখা রয়েছে—ছায়া, এখানে বিশ্রাম নিলে সর্দিগরমির ভয় নেই।

ক্লান্ত অবসন্ন অবস্থায় নির্বাক হয়ে লেখাটার দিকে চেয়ে রইল ওরা। ঘোড়াগুলোও ক্লান্ত, এগোতে চাইছে না আর। ঘুরে পিছন দিকে চাইল ইউজিন।

বিস্তীর্ণ মরু এলাকা পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। পাহাড় আর ঢিবিগুলোর

চূড়ায় সোনালী ছোঁয়া লেগেছে। পশ্চিম দিক থেকে গাঢ় লাল রেখা বেরিয়ে আসছে আকাশ চিরে। অনেক দূরে ইউজিনের র‍্যাঞ্চের দরজায় ফ্রীডম শহর থেকে ফেরার পথে তারই অপেক্ষায় চেয়ে রয়েছে জেনেফার। নিরাশ হয়ে শেষে আস্তাবলের ঘোড়াগুলোকে খাইয়ে বাচ্চাটাকে খাওয়াবে সে। আজ রাতের খাবার একাই খেতে হবে ওকে। খেতে বসেও বার বার বুকভরা আশা নিয়ে পথের দিকে চাইবে বেচারী।

কতদিন যে তাকে এমনি বাইরে বাইরে কাটাতে হবে তার কোন ঠিক নেই। কোনদিনই যদি ওরা আর ফিরতে না পারে? হঠাৎ এই অশুভ চিন্তায় ইউজিনের বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

কেমন লোক ওই সামনের মানুষটা? বারবার ওদের বোকা বানিয়ে চলেছে কিন্তু একবারও কাউকে মারার চেষ্টা করেনি। লোকটা যদি পিঠে গুলি করার মত দুর্নীতিবাজই হবে, তবে এত সুযোগ পেয়েও ওদের ছেড়ে দিচ্ছে কেন?

ক্লাইভ আর কীথ সবার আগে পাশাপাশি চলছিল; হঠাৎ ওরা দু'জনেই থেমে দাঁড়াল। অন্যান্য সবাই এগিয়ে এসে ওদের ঘিরে দাঁড়াল। দু'পাশের পাহাড় ওদের সামনে খুব কাছাকাছি ঘেঁষে এসেছে। পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে একটা খুব সরু পথ সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। মাটির উপর পাথর দিয়ে তৈরি একটা তীর চিহ্ন ওই পথটাই নির্দেশ করছে। ওরই ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ওখান দিয়ে এগোতে হলে পাশাপাশি দু'জনের যাবার উপায় নেই—এক এক করে এগোতে হবে।

পকেট থেকে তামাক বের করে একটা সিগারেট বানিয়ে চোখ দু'টো ছোট ছোট করে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চারপাশটা জরিপ করে দেখল কীথ।

'তুমি কী বলো, গিবন?' প্রশ্ন করল সে।

'লোকটা এখনও সেই চেষ্টা করেনি বটে, কিন্তু যদি রুখে দাঁড়াবার মতলব থেকে থাকে তবে আমার মনে হয় উপযুক্ত জায়গাই বেছে নিয়েছে সে। আমরা যদি ওর ভিতরে একবার ঢুকি তা হলে রাইফেল চালাতে জানা যে কোন লোক মুঠোর মধ্যে পেয়ে যাবে আমাদের।'

'আমার মনে হয় না সে তা চায়,' কোন কিছু না ভেবেই কথাটা বলে ফেলল ইউজিন।

'কী বলতে চাও তুমি?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল লী। ওর গলাটা খুব রুক্ষ শোনাল।

'না, মানে…,' কথাটা যে কারণেই সে বলে থাকুক, লী-র কঠিন দৃষ্টির সামনে মিইয়ে গেল ইউজিন। 'আমি বলছিলাম যে সুযোগ তো সে আগেও পেয়েছিল কিন্তু কাউকে মারেনি।'

কেউ ওর কথায় আমল দিল না। কিন্তু মন্তব্য যখন একটা করেই ফেলেছে, ওদের শুনিয়ে আর কিছু না বললেও নিজের মনে মনে সে তার স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করল।…হ্যাঁ, তাই তো। প্রথমবার যখন লোকটা ওদের চিঠি দিয়ে সাবধান করেছিল তখন সে চাইলে অন্তত কয়েকজনকে অবশ্যই শেষ করতে পারত।

পানির বোতলটা গুলি করে ফুটো করার সময়ে সে অন্তত তিনশো গজ দূরে ছিল। অতদূর থেকে সে কী করে জানল ওটা পানিরই বোতল? তবে কি ওর কাছে বিনকিউলার আছে? হতে পারে এই মুহূর্তে সে ওটা দিয়ে সবার চেহারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে—ঠোঁট নড়া দেখে আন্দাজ করে নিচ্ছে কে কী বলছে?

'যা হবার হবে,' বলেই রাইফেল বাগিয়ে ধরে সরু পথটার দিকে এগিয়ে গেল গিবন। অগত্যা অন্যান্য সবাই একে একে ওর পিছু নিল।

ভিতরটা বেশ অন্ধকার। পথটা অপ্রশস্ত। চলতে গিয়ে ইউজিনের রেকার ঘষা খাচ্ছে পাহাড়ের খাড়া দেয়ালের সাথে। উপরে সরু এক চিলতে আকাশ দেখা যাচ্ছে। আরও অনেক উপরে একটা-দু'টো তারা দেখা যাচ্ছে।

প্রতি মুহূর্তেই তার ভয় হচ্ছে এই বুঝি প্রচণ্ড শব্দ করে একটা গুলি ছুটে এল—কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। এঁকেবেঁকে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর সামনে আলো দেখা গেল। গিরিপথের শেষে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে ওরা। একটা উজ্জ্বল তারা দেখা যাচ্ছে—তারা নয়, ওটা ক্যাম্পের আগুন।

ছড়িয়ে পড়ে ধীর গতিতে অত্যন্ত সাবধানে এগিয়ে চলেছে ওরা। প্রত্যেকেরই রাইফেল কক করা—তৈরি।

ইতস্তত কয়েকটা বড় গাছ, কিছু ছোট ছোট ঝোপও রয়েছে। কাঁটা ঝোপে বাধা পাচ্ছে ওদের দৃষ্টি—সবটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। গালির তুবড়ি ছুটেছে লী-র মুখ থেকে—সে-ই প্রথম আগুনের কাছে পৌঁছেছে।

ছোট্ট পানির ধারার পাশে আগুন জ্বালা হয়েছে, কাছেই আগুনে দেওয়ার জন্য কিছু কাঠও মজুদ রাখা আছে। দু'টো পাথর চাপা দিয়ে বিছানো একটুকরো কাগজের উপর দু'টো ছোট স্তূপে রাখা রয়েছে কফি আর চিনি।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ওরা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটাকে হজম করার চেষ্টা করছে। লোকটা তাদের ছেলেমানুষ ঠাউরেছে! কয়েকজন নাবালকের দেখাশোনা করছে যেন!

'ওই কফি আমি কক্ষনো খাব না!' রাগে ফেটে পড়ল বার্ট।

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গিবন বলল, 'ক্ষতি কী? সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করাই ভাল। তা ছাড়া এই রাতের অন্ধকারে তো আর ওকে অনুসরণ করা যাবে না।'

নীরবে ঘোড়ার পিঠ থেকে কেতলি নামিয়ে ঝর্না থেকে পানি ভরে আগুনে চাপিয়ে দিল কীথ। বাস্তব চিন্তাধারা ওর—কফির প্রতি আসক্তিও তার খুব বেশি।

জিন নামিয়ে ঝর্ণার ধারে সামান্য একটু যা ঘাস জন্মেছে তার উপরই চরার জন্য ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হলো। কারও থলেতেই বেশি খাবার নেই—ওরা লম্বা সময়ের জন্য তৈরি হয়ে বেরোয়নি। বুঝেশুনে চলতে হবে।

বার্টের রাগ পড়ে গেছে। এখন সে অদ্ভুত বিস্মিত দৃষ্টিতে ঝর্নার পানি যেখানটায় পড়ে জমা হচ্ছে সেদিকে চেয়ে রয়েছে। 'এবার মনে পড়েছে,' অভিভূতের মত বলল সে। 'এই জায়গার গল্প অনেক শুনেছি আমি—এটাই সেই কিংবদন্তীর "মরমন কুয়া"।'

আগুনে কাঠ দিচ্ছিল গিবন। বার্টের কথা শুনে সিধে হয়ে দাঁড়াল সে। খুঁটিয়ে

চারদিক ভাল করে লক্ষ করে দেখল। শহরে, ক্যাম্পে যে-সব গল্প সে শুনেছে তার সাথে মনে মনে মিলিয়ে নিয়ে সে বলল, 'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে ঠিকই ধরেছ তুমি–সবই মিলছে।'

'আচ্ছা, লোকটা আমাদের এখানে কেন নিয়ে এল বলতে পারো?' জিজ্ঞেস করল ক্লাইভ।

ইউজিন বোকার মত সবার মুখের দিকে একবার করে চেয়ে দেখে শেষে প্রশ্ন করল, 'মরমনের কুয়া আবার কী? আগে শুনিনি তো?'

কেউ ওর কথার জবাব দিল না। বার্ট কুয়ার পাশটা ভাল করে ঘুরে দেখে এসে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'বোকা লোকটা সত্যিই আমাদের পথ দেখিয়ে মরমনের কুয়ার কাছে নিয়ে এসেছে! আমি বাজি রেখে বলতে পারি ব্যাটা এই ঘটনার কথা কিছুই শোনেনি।'

গিবনের চোখে ঈষৎ কৌতুকের আভাস দেখা দিল। ক্লাইভের প্রশ্নেরই পুনরুত্থাপন করল সে। 'তা হলে লোকটা আমাদের এখানে কেন এনেছে?'

লী তিক্ত স্বরে বলল, 'ওসব মরমন কুয়া-টুয়া গাঁজার আসরের গল্প।'

'তুমি কী জানো?' খেপে উঠল বার্ট। 'তুমি বললেই হলো? ওই গুপ্তধনের বাক্স থেকে আনা এক খণ্ড সোনা আমি নিজের চোখে দেখেছি!' নিজের হাতের তালু চিৎ করে খুলে আবার বন্ধ করল সে। 'এই হাতের মুঠোয় আমি ধরেছি তা। আমি বিশ্বাস করি এখান থেকে কয়েক মাইলের মধ্যেই সোনা রয়েছে। এত সোনা, যা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।'

'সোনা?' বিস্মিত ইউজিনের গলা দিয়ে মাত্র একটা শব্দই বেরুল।

'গল্পটা তোমারই সবচেয়ে ভাল জানা আছে, গিবন,' বলল ক্লাইভ। 'তুমিই শোনাও ওকে।'

'গল্পের সময় এটা নয়। তোমরা কি বুঝতে পারছ না জেকব ব্যাটার মতলব? আমরা যদি এখন সোনা খোঁজায় মন দিই তবে ওর কথা ভুলে যাব–এটাই সে চাইছে। সুন্দর কেটে পড়তে পারবে তা হলে।'

'গোপনে এই কুয়া খুঁজে বের করার লোভে এ-পর্যন্ত অন্তত ডজনখানেক লোক প্রাণ হারিয়েছে–আর ভাগ্যের ফেরে আমরা কিনা আজ খোদ জায়গা মত হাজির!'

নিজের নিজের চিন্তায় সবাই ব্যস্ত। কেউ কথা বলছে না। নীরবতা ভঙ্গ করে বার্টই প্রথম কথা বলল। 'ঠিক আছে, আমরা পরেও আবার এখানে ফিরে আসতে পারব। জেকবকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ফিরে আসব আমরা।' ওর গলায় উৎসাহের অভাব সুস্পষ্ট।

ক্লাইভ একটু নড়েচড়ে উঠল। 'একবার এই জায়গায় ছেড়ে গিয়ে কেউ আবার এটা খুঁজে পেয়েছে বলে শুনিনি আমি। যারা সোনা লুকিয়ে রেখে গেছিল স্বয়ং তারাও পায়নি। মরমনের কুয়া আজ পর্যন্ত আলেয়াই রয়ে গেছে।'

'একটু বুদ্ধি কেন খাটাও না?' অস্থির উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল লী। 'সত্যিই যদি সোনা এখানে লুকানো থাকত তবে কি লোকটা সেটা নিজে না নিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে আসত?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না,' বলল ইউজিন। 'এখানে কি কোথাও সোনা পুঁতে রাখা আছে?'

বিজ্ঞের হাসি হেসে গিবন বলল, 'বোঝা যাচ্ছে জেকবের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এবার অনায়াসে পালাতে পারবে শয়তানটা।'

'তোমরা মানুষ, না আর কিছু?' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে লী। 'কল্পনার রঙীন ফানুসের পিছনে ছোটার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছ। ভুলেই গেছ যে জেকবকে ফাঁসিতে ঝুলাবার উদ্দেশ্যেই আমরা বেরিয়েছিলাম!'

'ভুলিনি,' প্রতিবাদ করল ইউজিন। 'কিন্তু গল্পটা শুনতে দোষ কোথায়?'

'লী, কেলভিনের কথা তোমার মনে আছে?' প্রশ্ন করল গিবন।

'হঠাৎ ওর কথা তোমার মনে পড়ল কেন এখন?'

'এই এলাকাটা চিনত কেলভিন। অনেক বছর ধরে সে হারানো ওয়্যাগনগুলো খুঁজেছে এখানে। নাভাজো ইন্ডিয়ানদের চেয়েও ভাল করে চেনে সে এদিককার এলাকা। এটা মরমন কুয়া হলে ঠিক এইখানটায় হচ্ছে মার্শ-পাস।' একটা গাছের চিকন ডাল দিয়ে বালিতে আঁচড় কেটে এঁকে দেখাল গিবন। 'শক্ত-পাল্লা জেকব পুবে কিংবা উত্তর-পুবে যেতে চাইলে তাকে এই মার্শ-পাস দিয়েই যেতে হবে। তা না হলে ওকে নদীটা পার হতে হবে—আর নদী পার হওয়া এখানে মাত্র দু'টো জায়গাতেই সম্ভব। দু'টোই এখান থেকে আরও পশ্চিমে।'

'আমার মনে হয় দুই ফেরির মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে আমাদের ফাঁকি দিয়ে ঘুরে এসে কাছের ফেরি অর্থাৎ ফাদার্স ফেরিতেই নদী পার হবে সে,' মন্তব্য করল লী।

লী-র কথায় বাধা দিতে গিয়েও চুপ করে গেল ইউজিন। লক্ষ করল গভীর মনোযোগের সাথে বালির উপর আঁকা ম্যাপটা দেখছে লী। যাই হোক, তাদের শিকার অত্যন্ত দুর্গম এলাকার দিকেই এগিয়ে চলেছে। অবশ্য কলোরাডো আর স্যান জুয়ান ক্যানিয়ন ওর পথ অনেকাংশে রোধ করবে।

'সামনে এগিয়ে গিয়ে ওর পথ আটকালে কেমন হয়?' প্রস্তাব দিল ক্লাইভ।

'এই এলাকায়? অসম্ভব!' বলল গিবন। 'এখানে একবার ওর ট্রেইল হারালে সারা জীবনেও তা আর খুঁজে পাব না আমরা।'

'বলা যায় না,' এবার মুখ খুলল ইউজিন। 'আমি ওই মাথার ক্লিপটার কথা ভাবছি।'

'ক্লিপ?'

'হ্যাঁ, বেছে বেছে যে ক্লিপটা সাথে এনেছে জেকব। বোঝাই যাচ্ছে পৃথিবী উল্টে গেলেও ক্লিপটা যার জন্যে আনা, তার সাথে দেখা করবেই ও।'

চোখ তুলে ইউজিনের দিকে চাইল গিবন। 'ঠিকই বলেছ। বুদ্ধিমানের মত বেশ চমৎকার একটা নতুন লাইন বের করেছ তুমি!'

সবার সামনে একটু বিব্রত বোধ করলেও মনে মনে খুশিই হলো সে। নতুন উদ্যম নিয়ে লী আর গিবন ঝুঁকে পড়ল ম্যাপটার উপর। 'মেয়েটাকে যদি এদিকে কোথাও লুকিয়ে রেখে থাকে তবে অবশ্যই সে তার কাছেই যাবে প্রথমে। কিন্তু মাথা খারাপ না হলে কেউ নিজের প্রিয়তমাকে এই এলাকায় বেশিদিন একা ছেড়ে

যাবার সাহস পাবে না।'

'আর কী করতে পারত সে?'

সবাই চিন্তা করছে। মেয়েমানুষকে একা র‍্যাঞ্চে রেখে যাওয়ার অসুবিধাগুলো ওদের সবার ভাল করেই জানা আছে। তবে সুবিধা এই যে ওদের বন্ধু-বান্ধব আছে। কারও যদি বাধ্য হয়ে বৌকে একা রেখে কোথাও যেতে হয় তার প্রতিবেশী খোঁজ-খবর নেয়, দেখাশোনা করে। কিন্তু এই লোকের বেলায় মেয়েটাকে কে দেখবে? কে তার সাহায্যে পাশে এসে দাঁড়াবে?

শেষ পর্যন্ত ওরা স্বীকার করে নিল যে শক্ত-পাল্লার মত তার প্রেমিকা বা স্ত্রীরও অসাধারণ আর স্বাবলম্বী হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

'আমরা যখন ওর নাগাল পাব তখন সে একা নাও থাকতে পারে। হয়তো এই কারণেই সে মোটেও চিন্তিত নয়। হয়তো সে আমাদের একটা ফাঁদের দিকেই নিয়ে চলেছে। কে বলতে পারে?'

গিবনের দিকে চাইল বার্ট। ওর মুখের ভাব বিমূঢ়। সবার মনেই একই চিন্তা—জেকবকে ফাঁসিতে ঝুলাতে বেরিয়েছে ওরা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেরাই প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে কী? জেনেফারের কথা ইউজিনের মনে পড়ল আবার। এ কোন্ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল সে?

কিছুক্ষণ পরে লী বলল, 'শোনো, আমাদের অন্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করতে হবে। দেশে আইন আমাদেরই বজায় রাখতে হবে। তা যদি আমরা না পারি তবে শেষ পর্যন্ত কেউই রেহাই পাব না। অন্যায় আর অবিচার পায়ের নীচে পিষে মারবে আমাদের এক এক করে।'

ইউজিন ভাবছে অন্য কথা। লোকটাকে তাড়িয়ে ধরায় আর তার মন নেই। সে ভাবছে অসংখ্য ওয়্যাগন ভর্তি তাল তাল সোনার কথা। ভাগ্যে যা আছে তা তো ঘটবেই—একটু কল্পনা বিলাসে ক্ষতি কী? অন্তত স্বপ্নে রসগোল্লা খাওয়ার মত, স্বপ্ন না ভাঙা পর্যন্ত তো ভাল লাগবে? তার নিজের ভাগের সোনা দিয়ে সে নতুন একটা বাড়ি বানাবে খুব সুন্দর করে—নতুন আসবাবপত্র থাকবে তাতে। কোন কিছুরই আর অভাব থাকবে না তাদের। জেনেফারের বাপ-দাদারা কত করিৎকর্মা লোক ছিল, এসব কথাও আর মুখ বুজে শুনতে হবে না তাকে।

সুখ-স্বপ্ন দেখা শেষ করে ইউজিন বলল, 'ভাবছি আসলে জেকব লোকটা কেমন।'

'তাতে আর কিছু আসে যায় না এখন,' জবাব দিল লী। 'আমার একমাত্র চিন্তা ওকে ফাঁসিতে ঝুলাব কী করে!'

তিন

পানি থেকে উঠে পাড়ে দাঁড়িয়ে দু'হাতে লম্বা সোনালী চুল পেঁচিয়ে চিপে পানি ঝরাচ্ছে মেয়েটি। ওর প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালন অপূর্ব ছন্দময়। গায়ে কাপড় নেই বলে

মোটেই সঙ্কোচ বোধ করছে না। তার শুভ্র সুঠাম দেহ সকালের তাজা পরিবেশে অপূর্ব দেখাচ্ছে।

এমন সুস্থিরতার সাথে আগে তার পরিচয় ছিল না। জলপ্রপাতটাও যেন শব্দ না তুলে সন্তর্পণে জলাশয়ে পড়ে ছোট ছোট ঢেউ তুলে মিলিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গীত; হ্যাঁ, সঙ্গীতকেই সবচেয়ে বেশি করে মনে পড়ে তার। এখানে একমাত্র ওটারই অভাব। বহুদূরে তার আগেকার জীবনের সাথে সঙ্গীত বিসর্জন দিয়ে এসেছে সে। কিন্তু এখন নতুন করে আবার শুনতে শিখেছে সে তার মনের মানুষের কাছে।

'শোনো, ডালিয়া,' বলেছিল সে। 'শোনার মত মন থাকলে বাতাসই তোমার জন্যে বাজাবে, গাইবে।'

সবচেয়ে ভাল শোনা যায় কোন মালভূমির ওপর—স্কেলিটন মেসা বা টল মাউন্টেনের ধারে। ক্যানিয়নে আছে আর এক ধরনের গীত। বাতাস বইলে সাথে বয়ে নিয়ে আসে সীডার বা সেজ-এর হালকা সুগন্ধ—আবার কখনও বা শুধু একটা গরম ভাপ।

ওর মনে হয় এখানকার প্রতিটি আনাচ-কানাচের সাথে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। না, তার স্মৃতি নয়—সে তো মাত্র ইদানীং এসেছে এই নগ্ন নির্জন পাথুরে এলাকায়। তার প্রিয়তমের স্মৃতিও নয়। বহুকাল আগে এখানে যারা বাস করত তাদেরই স্মৃতি যেন লুকিয়ে আছে ক্যানিয়নের খাড়া দুর্গম দেয়ালগুলোর খাঁজে খাঁজে। কেমন যেন একটা অজানা টান অনুভব করে সে। আচ্ছা, তার এই অদ্ভুত অনুভূতির কথা জানলে ও কী বলত?

একটা নিছক পাগলামির বশে সে সম্পূর্ণ অচেনা অজানা একজন লোকের হাত ধরে চলে এসেছে এই বিজন মরু এলাকায়। ঝড়ের রাতে ঝড়ের মতই সে এসেছিল তার জীবনে। কামরায় ঢুকে একবার তার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে তাকে নিজের বলে দাবি করেছিল।

'কে তুমি?' সেই রাতে প্রশ্ন করেছিল ডালিয়া।

বিন্দুমাত্র কাঁপেনি তার চোখ। ডালিয়ার চোখে চোখ রেখে সে জবাব দিয়েছিল, 'বোকার মত প্রশ্ন হলো—দু'মিনিট আগেই তুমি জেনেছে আমি কে। আমি কী করব তাও তুমি জানো।'

'আর আমি?'

'আগামীকাল সকালেই বেরিয়ে পড়ব আমরা।' বলেছিল সে, 'প্রথম সুযোগেই ধর্মীয় মতে গির্জায় বিয়ে হবে আমাদের।'

ডালিয়ার খুব কাছ ঘেঁষে আগুনটার দিকে এগিয়ে গেল জেকব। ওর বাকস্কিনের জামা থেকে সীডার, পাইন আর ঘোড়ার গায়ের মিশ্র একটা গন্ধ অজানা ডাক দিয়ে এল ডালিয়ার কাছে।

আগুনে শক্তিশালী তামাটে রঙের হাত দু'টো গরম করছে জেকব। নিকোলাস লক্ষ করছে ওকে খুদে খুদে সাপের মত ঠাণ্ডা চোখে। ভয়ে ডালিয়ার বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করছে।

দুশ্চিন্তা তার নিজের জন্য নয়। আগন্তুক নিকোলাসের স্বরূপ দেখিনি বলেই তার এই ভীতি। পশ্চিমে এসে পৌঁছবার আগে সে-ও নিকোলাসকে ঠিক চিনতে

পারেনি।

এগিয়ে গিয়ে নিকোলাসের সাথে বসল ডালিয়া। এই লোকটাকে বিয়ে করবে বলেই সে পশ্চিমে এসেছে। কিন্তু বারবারই তার চোখ ঘুরে ফিরে গিয়ে পড়ছে আগুনের পাশে দাঁড়ানো অপরিচিত আকর্ষণীয় পুরুষটার উপর। দু'চোখ ভরে কেবল ওকেই দেখছে ডালিয়া।

পিছন থেকে কে যেন কাকে নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কে?'

'আগে দেখিনি কোনদিন। ওর ঘোড়ায় দাঁড়িপাল্লার মার্কা রয়েছে। সেটাও এখানে অপরিচিত।'

আবার চোখ তুলে লোকটার দিকে চাইল ডালিয়া। মেয়েটির চোখে দম আটকানো পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার আকুল মিনতি দেখতে পেল জেকব।

বলিষ্ঠ শক্তি-প্রাচুর্যে ভরা জেকবের গড়ন। নিজের দেশে অনেক সমর্থ পুরুষ দেখেছে ডালিয়া। চিনতে ভুল করেনি সে। নিকোলাসের মত বিশাল না হলেও লোকটার যে পেটা শরীর তাতে সন্দেহ নেই।

কামরায় মোট নয়জন মানুষ। ডালিয়াকে নিয়ে তিনজন মহিলা, আর বাকি সবাই পুরুষ। কিন্তু সবার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে ডালিয়া। অত্যন্ত আকর্ষণীয় চেহারা ও দৈহিক কাঠামোর অধিকারিণী সে। নিজের দেশ হাঙ্গেরিতে ঘোড়া চালিয়ে আর স্কি করে স্বাস্থ্য অটুট রেখেছে মেয়েটা।

নিজেকে সে ভাল করেই জানে; চেনেও। কিন্তু ভাগ্যে যে কী আছে জানা নেই তার। নিজ দেশের সাথে এদেশের রীতি-নীতির আকাশ পাতাল তফাৎ। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে ডালিয়া–অথচ এখানে সেটা কত অবান্তর!

তার বাবা ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ। পারিবারিক মর্যাদা ছাড়াও নিজের যোগ্যতায় তিনি ছিলেন সম্মানীয়। অথচ আজ ডালিয়ার কারণেই তিনি মৃত।

লোকটার সাথে প্রথম তার দেখা হয় ভিয়েনায়। এবং পরে আবার প্যারিসে। প্রেমে পড়ে যায় ডালিয়া। মানে ক্ষণিকের মোহকেই সে প্রেম বলে ভুল করেছিল। লোকটা যে বিবাহিত তা জানত না সে। ওর সম্পর্কে একটা অপমানকর উক্তি লোকটা করেছিল। সেটা বাবার কানে যেতেই তিনি তাকে ডুয়েলে আহ্বান করেন এবং ওই লোকটার হাতেই নিহত হন।

এরপরেই ডালিয়া ইউরোপ ছাড়ে। আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, সমাজ সবকিছু ছেড়েই পালিয়ে এসেছিল সে। কিন্তু পালিয়ে আসার আগে শেষবারের মত একবার তার প্রেমিকের সাথে দেখা করেছিল।

খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে তাকে ঘরে একাই পেয়েছিল ডালিয়া। কাবার্ড থেকে গ্লাসে মদ ঢালছিল সে। ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক বিস্ময়ে বলে উঠেছিল, 'ডালিয়া!' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু ডালিয়া হাত তুলে তাকে থামিয়ে দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল।

তার চোখে চোখ রেখে ডালিয়া বলেছিল, 'তোমার ভাগ্য ভাল। আমার কোন ভাই থাকলে সে তোমাকে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে পিটিয়ে শায়েস্তা করত। বাবার বয়স হয়েছিল হাত কাঁপত তাঁর।'

'ডালিয়া!' বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি তার।

'কিন্তু আমার হাত কাঁপবে না,' বলে সে ধীরে ধীরে হাতের পিস্তলটা তুলে তাক করে গুলি করল। তারপর তার মৃতদেহের পাশে পিস্তলটা ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এল।

পরিচিত এক জেলের নৌকায় ডেনমার্কে পৌঁছে ডালিয়া–সেখান থেকে সোজা আমেরিকায়।

পুবের একটা শহরে নিকোলাসের সাথে পরিচয় হয় তার। হাঙ্গেরিয়ান ভাষা জানে নিকোলাস। অল্প আলাপেই ডালিয়া কেমন ঘরের মেয়ে বুঝতে পেরে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল সে। টাকা পয়সা ফুরিয়ে আসছিল ডালিয়ার, তাই বিয়ের প্রস্তাবে সে আপত্তি করেনি। কথা ছিল নিকোলাস পশ্চিমে এসে একটু গুছিয়ে নিয়েই তাকে ডেকে পাঠাবে। সে এলেই ওদের বিয়ে হবে। জেকবের আকস্মিক উপস্থিতি ওদের সব পরিকল্পনা বানচাল করে দিল।

নিচু আর লম্বা ঘরের শেষ মাথায় ফায়ার-প্লেস। মাঝখানে ছোট একটা বার। সাথেই লাগানো দু'টো কামরায় বিছানা পাতা। একটা মেয়েদের অন্যটা পুরুষের।

জেকবের পিঠের উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিকোলাসের সাথে চোখাচোখি হলো ডালিয়ার। ওর চোখে এই দৃষ্টি সে আজ দুপুরেই দেখেছে–এখানে সে পৌঁছবার অল্পক্ষণ পরেই। দুপুরে সে মুঠোয় লোহার আংটা পরে নিজের ঘোড়াটাকে বেঁধে নির্দয় ভাবে পিটিয়েছে। তখনও তার চোখে এই ভাবটাই ফুটে উঠেছিল।

আগুনের পাশ থেকে সরে বারে গিয়ে দাঁড়াল জেকব। ডালিয়ার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে জেকবের দিকে চাইল নিকোলাস। ডালিয়ার মনে হলো যে সে আগন্তুকের সাথে কথা বলবে।

'হুঁ, লোকটাকে তা হলে তোমার মনে ধরেছে?' ভেঙচি কেটে বলল নিকোলাস। 'ঠুনকো লোক, কোন চাল-চুলো নেই।'

চুপ করে রইল ডালিয়া। ওর নীরবতায় নিকের রাগ আরও বেড়ে গেল।

'তোমাকে ঘরে তোলার পর একটু দুরস্ত করে নিতে হবে দেখছি! যাক, আমার কিছুটা আনন্দের খোরাকই হবে সেটা।'

'তোমার সাথে আমি নাও যেতে পারি!'

হেসে উঠল সে। 'ঠিকই যাবে। আমাকে বিয়ে করতেই এসেছ তুমি। এখানে এমন কোন লোক নেই যে আমাকে বাধা দেবে। কারও সাধ্যি নেই ঠেকায়।'

বড় বড় নীল চোখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নিকোলাসের দিকে চেয়ে থেকে শান্ত গলায় সে বলল, 'সাহায্যের দরকার হবে না আমার। নিজেরটা নিজেই সামলাতে জানি আমি।'

'তুমি?' হো হো করে হেসে উঠল নিক। ভাবটা এমন যে ডালিয়া রসিকতা করছে তার সাথে।

নীরবে ওর দিকে একটু চেয়ে থেকে উঠে ফায়ার-প্লেসের দিকে রওনা হলো সে। আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পিছন থেকে ডালিয়াকে ধরে ফেলল নিক। ওকে জোর করে নিজের দিকে ঘুরিয়ে চড় তুলল সে।

'ছেড়ে দাও ওকে।'

শূন্যেই থেমে গেল হাত–ধীরে ধীরে হাতটা নামিয়ে নিল নিক। চোখ দু'টো খুনের নেশায় জ্বলছে। জেকব ওর দিকে ফিরে দাঁড়াল। এতক্ষণে নিকোলাস টের পেল কথাটা জেকব বলেনি–বলেছে স্টেজ স্টেশনের ম্যানেজার।

শুকনো পাতলা চেহারা। বয়স হয়েছে লোকটার। সারা মুখে ওর চোখ দু'টোই কেবল জীবন্ত। বারে রাখা শটগানের উপর রয়েছে ওর একটা হাত।

'তুমি আমাকে অর্ডার দিচ্ছ!'

'হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি আমি–এই ঘরে কেউ কোনদিন কোন মহিলার সাথে দুর্ব্যবহার করেনি–তোমাকেও অভদ্র হতে মানা করছি।'

অবজ্ঞার সাথে কাঁধ ঝাঁকাল নিক। 'এখানে সারা রাত থাকবে না মেয়েটা। এখনই ওকে সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি আমি।'

নিকের উপর সতর্ক নজর রেখেই ডালিয়ার উদ্দেশে ম্যানেজার বলল, 'স্বেচ্ছায় যেতে না চাইলে জোর করে কেউ তোমাকে কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না–ভয় নেই। লোকটা কি তোমার স্বামী?'

'না।'

'ওকেই জিজ্ঞেস করো সে এখানে কেন এসেছে,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল নিক।

'ওকেই বিয়ে করতে এসেছিলাম আমি। তখন জানতাম না সে কেমন। আজ দুপুরে ওকে নির্দয় ভাবে নিজের ঘোড়াকে পেটাতে দেখে বুঝলাম ভবিষ্যতে হয়তো আমার গায়েও হাত তোলার চেষ্টা করতে পারে।'

'চেষ্টা!'

'হ্যাঁ, চেষ্টা তুমি করবে জানি। কিন্তু তার আগেই আমার হাতে খুন হয়ে যাবে!'

ঘরের সবাই নীরব। কথাটা ডালিয়া যেভাবে বলল তাতে উপস্থিত কারও মনে সন্দেহ রইল না কথাটা অক্ষরে অক্ষরেই পালন করবে সে।

পরের কথাগুলো নিকোলাসের দিকে চেয়ে বললেও আসলে কথাটা বাকস্কিনের জ্যাকেট পরা লোকটার উদ্দেশেই বলা। 'তোমাদের দেশে আমি নতুন; জীবনে কোনদিন আমাকে দুঃখ কষ্ট পেতে হয়নি, কিন্তু কেউ যদি আমাকে ভালবাসে, আমার সাথে মার্জিত নম্র ব্যবহার করে–তার জন্যে আমি সব রকম কষ্ট সহ্য করতে রাজি আছি। কিন্তু তুমি সেই লোক নও, নিকোলাস।'

বারে দাঁড়ানো লোকটা নড়ে উঠল। মাথা থেকে হ্যাটটা নামিয়ে সে শান্ত স্বরে বলল, 'তুমি আমার সাথে এলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব আমি। এখান থেকে ষাট মাইল পশ্চিমে গির্জায় ধর্মীয় মতে আমদের বিয়ে হতে পারে।'

পরস্পরের দিকে চেয়ে দু'জনে নীরবে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল, তারপর জবাব দিল ডালিয়া, 'আমি যাব তোমার সাথে। সকালেই তোমার সঙ্গে রওনা হব আমি।'

মুখ খুলতে গিয়েও আবার চুপ করে গেল নিকোলাস। তারপর হঠাৎ ঘুরে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সে।

স্টেশন ম্যানেজার বন্দুকটা চোখের আড়ালে যথাস্থানে রেখে দিয়ে জেকবকে

বলল, 'যোগ্য সাথী পেয়েছ তুমি। তবে ওকে দেশটাকে জানার কিছু সুযোগ দিয়ো।'

একটু অপ্রস্তুত হয়েই তাড়াতাড়ি ডালিয়ার দিকে এগিয়ে গেল জেকব। ঘরের সবাই মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চেয়ে ওদের জন্য যথাসম্ভব নির্জনতার সুযোগ করে দিল।

'অন্য এলাকায় জমির খোঁজে চলেছি আমি,' বলল সে। 'আমার কোন র‍্যাঞ্চ নেই, বাড়িও নেই। অনেক দূরে একটা জায়গা দেখেছি, একজনের পক্ষে ওখানে নতুন করে ঘর বাঁধা সম্ভব।'

'ঠিক আছে।'

'জিনিসপত্র সব সাথে আছে তোমার?'

'হ্যা,' হাতের ইশারায় ঘরের কোণে রাখা মালপত্র দেখাল ডালিয়া। 'অনেক জিনিস। অসুবিধা হবে?' স্বভাবজাত কৌতূহলবশেই ঘরে উপস্থিত মেয়ে দু'টো ওদিকে চাইল। ঘরের এক কোণে রাখা রয়েছে অত্যন্ত দামী ছোট একটা ট্রাঙ্ক, সাথে আরও জিনিসপত্র রয়েছে—প্রত্যেকটাই মূল্যবান।

'ব্যবস্থা হয়ে যাবে,' জবাব দিল জেকব।

'স্টেশন ম্যানেজার এই দেশটাকে ভালমত বুঝে দেখার জন্যে তোমাকে কিছুটা সময় দিতে বলেছিল—উপদেশটা খারাপ নয়।'

সময় সে দিয়েছে। অবশ্য এতটা অপরিচিত নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সময়ের দরকারও ছিল ডালিয়ার। এখানকার সবকিছুই নতুন। এমনকী এখানকার নগ্ন পাহাড়গুলোও তার দেশের পাহাড়ের মত নয়।

'ওদেরও কিছুটা সময় দাও,' বলেছিল জেকব। 'দেখবে ধীরে ধীরে ওরাও তোমারই একটা অংশ হয়ে উঠেছে।'

কেবল ওর জিনিসপত্র বইবার জন্যই জেকবকে তিনটে গাধা কিনতে হয়েছে, তবে এজন্য তার মধ্যে কোন বিরক্তি দেখা যায়নি। বরং খুব সাবধানতার সাথেই এক এক করে গাধার পিঠে সব মাল তুলেছে সে।

'ইচ্ছা করলে ওগুলো ফেলে দিতে পারো তুমি,' বলেছিল ডালিয়া। 'ওর প্রতি আমার কোন মোহ নেই। ওই জীবনটা পিছনে ফেলে এসেছি আমি।'

'ওগুলো তোমারই,' নরম কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল জেকব। 'কিছু কিছু স্মৃতি সাথে থাকা ভাল।'

কোন বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই একটা ছোট শহরে বিয়ে হলো ওদের। একজন স্বল্পভাষী নিষ্ঠাবান ধর্মযাজক তাদের বিয়ে পড়ালেন। একত্রে নয়, পাশাপাশি শুয়ে রাতটা কাটাল ওরা।

পরদিন সকালে ওরা আবার রওনা হলো। ডালিয়া খেয়াল করল জেকব বারবার পিছন ফিরে চাইছে।

'কাউকে আশা করছ নাকি তুমি?' প্রশ্ন করল সে।

'এই দেশে যে-কোন সময়েই অপ্রত্যাশিত অতিথি কেউ আসতে পারে বা কোন ঘটনা ঘটতে পারে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

লম্বা যাত্রা ক্লান্তিকর হলেও ডালিয়ার উদ্যম কমেনি। তৃতীয় দিনের পর ক্লান্তিও আর অনুভব করছে না সে।

ক্যাম্পিং সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে ওর। তবু জেকবের প্রতিটি কাজে সে বুঝতে পারছে ক্যাম্পিং-এ কীরকম অসাধারণ পটু সে। সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রকাশ পাচ্ছে ওর প্রতিটি কাজে—অথচ যেন দৈনন্দিন রুটিন, এমনি সহজভাবে সে তা করে চলেছে।

চতুর্থ দিন আগুন জ্বেলে ওপাশে ডালিয়ার দিকে চেয়ে সে বলল, 'একদিন আমাদের খোঁজে কেউ আসবে বলে আশা করছি আমি।'

অপেক্ষা করে রইল ডালিয়া। বাড়তি কথা বলার শিক্ষা সে পায়নি।

'নিকোলাস আসবে,' বলল সে।

নিকোলাসের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল ডালিয়া। হঠাৎ বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর। ভয়টা মোটেও অহেতুক নয়। ইদানীং নতুন দেশ আর জেকবকে ঘিরেই কেবল চিন্তার জাল বুনেছে। লোকটাকে কিছুটা যেন বুঝতে পারে সে এখন—হয়তো কিছুটা ভালও বেসে ফেলেছে।

'তুমি জানতে চাইলে না কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'তোমার সাথেই তো যাচ্ছি আমি?'

কয়েকটা কাঠ আগুনে চাপিয়ে দিয়ে সে বলল, 'নাভাজোরা ছাড়া আর কেউ কখনও যায় না ওখানে।'

'ওরা ইন্ডিয়ান না?'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'অনেক আগে, হয়তো কয়েকশো বছর আগে ওখানে অন্যান্য আরও ইন্ডিয়ানদের বাস ছিল। ক্লিফের ওপর ওদের বাড়িঘর এখনও দেখা যায়। কিন্তু কেন জানি না—ওই এলাকা ছেড়ে সবাই ওরা চলেছে গেছে।'

'ওখানে তুমি কী করবে?'

'যখন সঙ্গতি হবে কিছু গরু-মহিষ পালব। একটা ঘর বানাব; আমাদের দু'জনের জন্যে।'

অনেক জ্ঞানীগুণী শিক্ষিত লোকের সাথে মেশার সুযোগ হয়েছে ডালিয়ার, কিন্তু জেকবের মত সহজে গুছিয়ে সুন্দর করে কথা বলতে আর কাউকে দেখেনি।

কী করে যেন সে বুঝে ফেলল ডালিয়া কী ভাবছে। কিন্তু নিজের মনোভাব বুঝতে না দিয়ে বলল, 'এই দেশে যাদের সাথে তোমার পরিচয় হবে, তাদের ভুল বুঝো না। তারা তোমার নিক্তিতে না হলেও এখানে বাঁচার জন্যে যে সব শিক্ষা দরকার তা তাদের আছে। কেউ কেউ আবার প্রচুর ঘুরে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। আমি একজন লোকের সাথে মহিষ শিকার করেছি—সে ছিল গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। একজন সোবোনের গ্র্যাজুয়েটের সাথে পাশাপাশি যুদ্ধও করেছি আমি—কিন্তু মজার কথা কি জানো? ওরা দু'জনেই পশ্চিমা লোকের মত কাউবয়দের ঢঙেই কথা বলত।'

ট্রেইল ছেড়ে আরও দুর্গম, নির্জন মরু এলাকা আর ক্যানিয়নের ভিতর দিয়ে যাবার পথে ডালিয়া জিজ্ঞেস করেছিল, 'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় সে আমাদের আর খোঁজ পাবে?'

'আজ হোক, কাল হোক, পাবেই,' জবাব দিয়েছিল ও।

কতদিন আগের কথা সেটা? বেশ কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে–সময়ের হিসাব আর রাখে না সে। এখানে সেটা যেন অর্থহীন।

পানির ধারে দাঁড়িয়ে গা মুছে এক এক করে জামা কাপড় পরে নিল ডালিয়া। জেকবের দেওয়া উইনচেস্টারটা তার পাশেই রাখা।

'তুমি গুলি ছুড়তে জানো?' প্রশ্ন করেছিল সে।

'হ্যাঁ,' জবাব দিয়েছিল ডালিয়া। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'ভয় কোরো না, কোথায় লাগাতে হবে না দেখে আমি গুলি করি না–যখন করি তখন সেটা জায়গা মতই লাগে।'

দু'দিন পরে সে ঘোড়ায় চেপে চলে গিয়েছিল।

যাবার আগের মুহূর্তে সে বলেছিল, 'যদি আমার কিছু হয়, ফিরতে না পারি, এখান থেকে বেরিয়ে সোজা পশ্চিমে চলে যেয়ো। অনেক পথ যেতে হবে, কিন্তু ট্রেইল ধরে গেলে প্রেসকটের সাইনপোস্ট দেখতে পাবে।'

'ঠিক আছে,' বলেছিল সে। তারপর তার বড় বড় নীল চোখ ওর চোখে রেখে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কতদিন অপেক্ষা করব?'

'অন্তত দুই সপ্তাহ। ওই সময়ের মধ্যে বেঁচে থাকলে আমি হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এসে হাজির হব।

আজ পনেরো দিন হলো সে গিয়েছে। দেখা যাচ্ছে মাঝেমাঝে এখানেও সময়ের হিসাব রাখার দরকার পড়ে।

চার

জায়গাটা ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে এসে রাশ টেনে ঘোড়াটাকে থামাল লী। গতরাতে যে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে ওরা এপাশে পৌঁছেছে, সেটা বিশাল দেয়ালের মতই দাঁড়িয়ে আছে ওদের পিছনে। অবিচ্ছিন্ন ভাবে মাথা উঁচু করে একটানা উত্তরে এগিয়ে গেছে ওটা। পুবের এবড়োখেবড়ো জমির ওপর বুটি-বুটি সীডারের ঝোপ দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণে যেখানে সীডারের ঝোপ শেষ হয়েছে, ঠিক সেখান থেকেই শুরু হয়েছে বালুর ঢিবির সারি।

'তোমার কী মনে হয়? লোকটা ক্লিফ ঘেঁষে উত্তর দিকে গিয়ে পাহাড় পেরিয়ে ফিরে যায়নি তো?' প্রশ্ন করল বার্ট।

'পাহাড় ফুঁড়ে যাবার উপায় ওর জানা থাকলে অবশ্য অন্য কথা,' বলল লী। 'তবে যে পথ দিয়ে আমরা এসেছি সেদিক দিয়ে যে সে যায়নি, আমি শিওর। ভোর না হতেই আমি ওদিকটা দেখে এসেছি। ওর ফেরার কোন চিহ্ন নেই ওখানে।'

ইউজিন এখনও কম্বল ছেড়ে ওঠেনি। গতরাতে ভাল ঘুম হয়নি তার–চোখ বুজলেই কেবল জেনেফারের চিন্তিত মুখটা বারবার ভেসে উঠেছে মনের পর্দায়।

এলাকাটা একেবারে শুকনো, বিজন। আজ সকাল থেকে আকাশে একটা শকুন ছাড়া আর কোন প্রাণের সাড়া ওদের নজরে পড়েনি। শকুনটা মাথার উপর একটা চক্কর দিয়ে হয়তো তার সম্ভাব্য ডিনার হিসাবেই চিহ্নিত করে গেল ওদের।

আজ সকালে বিভ্রান্ত বোধ করছে ওরা। যাকে তাড়া করে এতদূর এসেছে তার ট্রেইল এখানে হারিয়ে গেছে। এখন লী আর গিবনের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছে সবাই।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে গিবন তার মত প্রকাশ করল। 'একটা ভাগ্যের জুয়া খেলতে হবে আমাদের, লী। লোকটা রেড-ইন্ডিয়ানদের মতই চতুর আর সাবধানী। ও যদি দক্ষিণে গিয়ে থাকে তবে আর ওর চিহ্ন খুঁজে পাব না আমরা। ওই বালুর ঢিবিগুলো বাতাসে সর্বক্ষণ সরে সরে যাচ্ছে। ওখানে ঘোড়ার পায়ের ছাপ বাতাসে খুব অল্প সময়েই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

'জুয়ার কথা কী বলছ?'

'ও যে কোন্‌দিকে গেছে সেটা আন্দাজ করে নিয়ে ছুটে এগিয়ে গিয়ে ওর পথ রোধ করে দাঁড়াতে হবে।'

'আর আমাদের আন্দাজ ভুল হলে?'

'তা হলে উপায় নেই–ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে হবে।'

মনস্থির করে ফেলল লী। 'আমরা সোজা ফাদার্স ফেরির দিকে যাব। ওখানে যদি শিগ্‌গিরই ওর দেখা না পাই, তা হলে ভাটির দিকে অন্য ফেরিতে ওকে খুঁজতে যাব।'

লী পথ দেখিয়ে দেখিয়ে আগে আগে চলল। পথে জেকবের কোন চিহ্ন ওদের চোখে পড়ল না।

পরদিন ফেরি-ঘাটে পৌঁছেও জেকবের কোন পাত্তা মিলল না।

'ওকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না,' বলল ক্লাইভ। 'ব্যাটা আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে ভেগেছে।'

'অসম্ভব!' বলল লী, 'ওকে যেমন করে হোক ধরতেই হবে–পালাতে দেয়া চলবে না।'

'সে যা-ই হোক এখন ঝটপট অন্য ফেরিতে পৌঁছে কিছু খেয়ে না নিলে উপোস করেই আমাদের মরতে হবে,' মন্তব্য করল গিবন।

'আমিও এ-ব্যাপারে একমত,' কথাটা সমর্থন করে একসাথে বলে উঠল ইউজিন আর ক্লাইভ।

দক্ষিণে রওনা হলো ওরা। নদী থেকে বেশ একটু দূর দিয়েই এগোবে ওরা। তাতে নদীর বাঁকে বাঁকে ঘোরা পথে না চলে সোজা পথে এগোতে পারবে। গিবন মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখল কিছুটা দূরেই দেখা যাচ্ছে প্রকাণ্ড নাভাজো পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। 'ওই পাহাড়ের মাথা থেকে প্রায় গোটা দেশটাই দেখা যায়,' বলল সে।

নাভাজো পাহাড়ের চূড়ায় শুয়ে দূরবীন চোখে লাগিয়ে একে একে ছয়জনকে দেখল জেকব। অন্য ফেরির উদ্দেশে রওনা হলো ওরা। সন্দেহ নেই ওখানে ওরা খাবার

আর অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করবে। কিন্তু নিজের খামারের ক্ষতি করে কতদিন বাইরে কাটাতে পারবে ওরা?

ওদের উপর নজর রেখে আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। বোঝাই যাচ্ছে, তার ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছে ওরা। ডালিয়াকে সে যে ক'দিন সময় দিয়ে এসেছিল তা পেরিয়ে গেছে। এখান থেকে তিরিশ মাইল দূরে রয়েছে ডালিয়া। একা একা মেয়েটা কী করছে কে জানে? এই এলাকার কিছুই চেনে না সে, তবু তার কথামত একা একাই সে পথে বেরিয়ে পড়েছে কি?

খাড়া ঢাল বেয়ে নেমে 'ওয়ার গড' ঝর্ণায় নিজের বোতলে পানি ভরে ঘোড়াটাকে পানি খাইয়ে নিল জেকব। পাহাড় থেকে কিছুটা নেমে মালভূমি ধরে দক্ষিণ-পুবে এগোল সে। প্রথম বারো মাইল নির্বিঘ্নেই কাটল। পিউটে পাহাড়ে বিকেলের সূর্য যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

পুরোনো একটা ইন্ডিয়ান ট্রেইল ধরে এসেছে জেকব।

ঘোড়াটা অবসন্ন হয়ে পড়েছে, সে নিজেও খুব ক্লান্ত—তবু এগিয়েই চলল। খুরের চিহ্ন লুকাবার জন্য সোজা রাস্তায় না গিয়ে এবার বন্ধুর পাথুরে পথ বেছে নিল সে। আকাশে চাঁদ উঠতে উঠতে 'টল মাউনটেন'-এর ধারে পৌঁছে গেল জেকব।

ষোলো দিনের দিন ঘোড়ায় চড়ে দু'টো ক্যানিয়নের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়াল ডালিয়া। অন্ধকারে ঘোড়ার পিঠে বসেই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে সে। তার মাথার উপর একটা বাদুড় চক্কর দিচ্ছে। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে সে।

মনের গভীরে তার স্থির বিশ্বাস জেকব আসবেই। কখনোই সে ধোঁকা দেবে না তাকে। প্রথমে একটু সন্দেহ ছিল—অন্ধকার নেমে আসার পর সেটা দূর হয়ে গেছে—আর ভয় করছে না তার। এখন সে স্থির নিশ্চিত, যদি জেকব না ফেরে, তার মানে হয়তো নিকোলাস তাকে খুঁজে পেয়েছে। অথবা আর কিছু ঘটেছে।

নিকোলাস যে ওদের পিছু নেবেই এতে কোন সন্দেহ নেই তার। লোকটার শিরায় শিরায় রয়েছে হিংসা আর জিদ। সে আসবে। আর এলে লোক-লস্কর নিয়েই আসবে।

শেষ পর্যন্ত আজও নিরাশ হয়ে ফিরতে হলো তাকে। জিন নামিয়ে ঘোড়াকে খেতে দিল ডালিয়া।

কয়েক ঘণ্টা পরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠল সে। তার ঘোড়াটাই শব্দ করে ডেকে উঠেছে। তাড়াতাড়ি জেকবের দেওয়া রাইফেলটা হাতে তুলে নিল ডালিয়া। কিছুক্ষণ কান খাড়া করে থেকে খুরের শব্দ শুনতে পেল সে। রাইফেলটা উত্তেজিত ভাবে আঁকড়ে ধরে অপেক্ষা করছে ও। ঠোঁট শুকিয়ে আসছে—বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছে।

হঠাৎ লোকটার গলা কানে এল। ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে দিয়ে সে বলছে, 'শাবাশ বেটা, বাড়ি পৌঁছে গেছি আমরা।'

আনন্দের আতিশয্যে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে পড়ল ডালিয়া৷

পাঁচ

কালো একটা ঘোড়ায় চড়ে স্কেলিটন মেসার উপর উঠল জেকব। ক্লিফের পুব দিকের উঁচু জায়গায় পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল সে। এখানে কোন চূড়া নেই, কিন্তু জায়গাটা যথেষ্ট উঁচু। এখান থেকে ক্যাসেল বুটের উপত্যকা, মার্শ-পাস আর বালির ঢিবিগুলো অনেক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। দূরবীন বের করে নিয়ে অপেক্ষায় বসল সে।

দিনের আলো এখনও ফোটেনি। একটু ধোঁয়া, বা ধুলো ওড়া, কিংবা কোন ধাতুর উপর সকালের আলো পড়ে একটু ঝিলিক দিয়ে ওঠা—এই ধরনের কিছু একটা দেখার আশাতেই সে এখানে এসেছে আজ। কিন্তু আসলে ওসব কিছু দেখতে না পেলেই খুশি হবে—নির্ঝঞ্ঝাটেই থাকতে চায় সে।

একঘণ্টা ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে অনেক কিছুই তার চোখে পড়ল। অনেক দূরের ইকো ক্লিফ ধীরে ধীরে সোনালী রঙ নিল, থিফ রক এখনও আঁধারে—সূর্যের আলো যেন পৌঁছতে পারছে না ওখানে।

একটা চিল…একদল বুনো ঘোড়া…কয়েকটা তিতির পাখি। কিন্তু কোন ঘোড়সওয়ার বা মানুষ তার নজরে পড়ল না।

দূরবীন খাপে ভরে ডালিয়ার কথা ভাবতে ভাবতে ফিরে চলল জেকব। মেয়েটি তার নিজের সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলেনি ওকে। প্রথম দর্শনেই জেকবের মনে হয়েছিল ডালিয়ার জন্মই হয়েছে তার প্রেয়সী হবার জন্য।

'কেউ কোথাও নেই,' ডালিয়ার সপ্রশ্ন দৃষ্টির জবাবে বলল জেকব। 'মনে হয় ওরা বাড়ি ফিরে গেছে।'

'ওরা কি আবার আসবে?'

মনে মনে ভেবে দেখল সে। বালির ঢিবির পিছনে শুয়ে কাছে থেকে দেখা মুখগুলো ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। 'হ্যাঁ…ওদের মধ্যে অন্তত একজন আসবেই।'

অখণ্ড অবসর ওদের—চারদিকে নজর রাখার জন্য অবশ্য এর মাঝেও প্রত্যেকদিনই দুবেলা একবার করে জেকবকে মেসার উপর যেতে হয়। বাকি সময়টা দু'জনে কপোত-কপোতীর মত গল্প করে কাটায়। চাষ করা যাবে এমন একটা ছোট জায়গার কথা একদিন কথায় কথায় উল্লেখ করল ডালিয়া। শহর থেকে খাবারের সাপ্লাই আনতে পারেনি জেকব। জমানো খাবার কমে আসছে—কোমর বেঁধে লেগে গেল সে। এক সপ্তাহের মধ্যেই জমিটা পরিষ্কার করে কুপিয়ে তাতে বীজ বুনে ফেলল। বড় মাটির দলাগুলো ভেঙে গম, শিম, বরবটি, আর মটর বুনতে ওকে সাহায্য করল ডালিয়া।

অন্য কোনখান থেকে খাবার আনতে হলে আবার ডালিয়াকে একা রেখে বেরুতে হবে তাকে। উপায় থাকলে সে আর তা করতে চায় না।

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অনুসরণকারী দলটাকে ফ্রীডমে ফিরতে দেখল নিকোলাস। ক্লান্ত অবসন্ন দেহে একে একে ঘোড়া থেকে নেমে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেবার জন্য সেলুনে ঢুকল ওরা।

বারটেন্ডার ফ্রেড পিছনের ঘর থেকে বিশেষ উপলক্ষে তুলে রাখা একটা বোতল বের করে এনে ওদের সামনে রাখল। চেহারা দেখেই যাত্রার ফলাফল আঁচ করে নিয়েছে সে।

'পালিয়ে গেছে,' সবার পক্ষ থেকে লী জানাল। 'স্রেফ ফাঁকি দিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে লোকটা।'

'তবে রসদের জন্যে একদিন না একদিন ওকে আবার ফিরতেই হবে,' নিজেদের অক্ষমতা ঢাকার চেষ্টা করল কীথ।

ওদের পিছন পিছন নিকোলাসও বারে এসে ঢুকেছে। বারে হেলান দিয়ে অন্যদিকে চেয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছে। জেকবের পিছু নিয়ে ওকে অনুসরণ করেই এই শহরে পৌঁছেছে সে। এখানে গোলাগুলি, ডেরিকের মৃত্যু ইত্যাদি সব ঘটনাই শুনেছে।

'লোকটা কোথায় অদৃশ্য হয়েছে জানো?' উপস্থিত সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য একটু থামল ক্লাইভ। 'মরমন কুয়ার কাছে!'

বারের পিছনে একটা গ্লাস পালিশ করছিল ফ্রেড। কথাটা শুনে কাজের মাঝেই হাত থেমে গেল ওর। 'মরমন কুয়ায়?!'

'হ্যাঁ। আমাদের পথ দেখিয়ে ওই পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে হঠাৎ হাওয়া হয়েছে লোকটা।'

'বেশি ফটফট করা তোমার একটা বদ-অভ্যাস,' ওকে বকল বার্ট। ক্লাইভের এমন করে হাটে হাঁড়ি ভাঙাটা মোটেও পছন্দ হয়নি তার।

'মরমন কুয়া–ওটাই তো হারানো সোনার ওয়্যাগনগুলোর চাবিকাঠি।' কথা বলতে বলতে বারে কনুই রেখে ঝুঁকে দাঁড়াল ফ্রেড। 'তোমরা তো রাতারাতি বড়লোক হয়ে যেতে চলেছ। কবে ফেরত যাচ্ছ ওখানে?'

'সত্যি কথা বলতে কি,' নিজের গ্লাসটা বারের উপর নামিয়ে রাখল ক্লাইভ। 'আমরা এখনও...'

'তোমরা তা হলে লোকটাকে পালাবার সুযোগ দিচ্ছ?' ওকে বাধা দিয়ে বলে উঠল নিকোলাস।

এতক্ষণে অপরিচিত লোকটার দিকে চোখ পড়ল সবার। লী ছাড়া আর সবাই বোকা বনে গেছে এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে। কর্কশ স্বরে লী জবাব দিল, 'কক্ষনো না। দরকার হলে নরক পর্যন্ত ওকে ধাওয়া করে যাব–কিছুতেই ওকে ছাড়ব না আমি।'

'তোমাদের সবারই বাড়ি-ঘর আর খামার রয়েছে–সেখানে তোমাদের কাজও রয়েছে প্রচুর, আর আমি হচ্ছি একজন হাত-পা ঝাড়া লোক,' বলল নিকোলাস।

'তোমার এ-কথার মানে?' জানতে চাইল লী।

'তোমাদের ওই খুনীটাকে ধরে আনার জন্যে টাকা দিয়ে একজন লোক রাখাই

সবদিক দিয়ে যুক্তিসঙ্গত হবে। আমাকে কাজটা দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে তোমরা নিজেদের খামারের কাজ দেখতে পারবে। তা ছাড়া লোকটা যে কে তা জানি আমি।'

'তুমি চেনো ওকে?'

'হ্যাঁ, ওর নাম জেকব রাইট। দাঁড়ি পাল্লা মার্কা ঘোড়া ওর।'

'বাইরের কোন সাহায্য আমাদের দরকার নেই,' প্রতিবাদ করল গিবন। 'আমরা নিজেরাই ওকে খুঁজে বের করব।'

'আমার নাম নিকোলাস পামার। বসবাস করার মত কোন সুন্দর জায়গা পেলে থাকব বলে পশ্চিমে এসেছি। এই শহরটা আমাদের বেশ পছন্দ হয়েছে–আমাকে যদি কিছু অধিকার আর ক্ষমতা দেয়া হয় তবে তার বদলে তোমাদের এই কাজটা আমি করে দিতে রাজি আছি।'

'কী অধিকার আর ক্ষমতা চাও তুমি?'

'তোমাদের কথার ওপর একটা লোককে খুঁজে বের করে হত্যা করা ঠিক দেখায় না। কিন্তু তোমরা যদি আমাকে মার্শাল নিযুক্ত করো, তবে কথাটা অন্যরকম দাঁড়ায়।'

ওদের মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এই ধরনের প্রস্তাব ওদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন আর অপ্রত্যাশিত। লী কোন কথা বলছে না–গিবনও নীরব রয়েছে। বাকি সবাই ওই দু'জনের মতামতের অপেক্ষা করছে।

কয়েক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে গিবনই প্রথম কথা বলল। 'শান্তিপূর্ণ শহর এটা। এখানে আমাদের কোন মার্শালের দরকার নেই।'

ইউজিন কোন কথাই বলেনি। কতক্ষণে বাড়ি ফিরে যাবে এই চিন্তাই ওকে ব্যস্ত করে রেখেছে। জেকবের খোঁজে আবার বেরুবার দায়িত্ব থেকে রেহাই পেলেই সে বেঁচে যায়। তাই নিকোলাসের প্রস্তাবটা ওর কাছে ভালই মনে হচ্ছে। কিন্তু আবার এই বেয়াড়া রকম কঠিন চেহারার লোকটাকেও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না সে। তার মনে হচ্ছে গিবনও একই কারণে আপত্তি জানিয়েছে।

'একটা মিটিং ডেকে শহরের সবার মতামত নেয়া দরকার,' একটু ভেবে নিয়ে মন্তব্য করল লী। 'দু'একজনের মতামতের ওপর কোন সিদ্ধান্ত নেয়া আমাদের ঠিক হবে না।'

গ্লাসের বাকি মদটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে নিক বলল, 'নদীর ধারে তাঁবু ফেলেছি আমি–দরকার হলে খবর দিয়ো।' বারের উপর গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল সে।

সেলুনের ব্যাট-উইং দরজার কবাট দু'টো কয়েকবার এপাশ ওপাশ দুলে স্থির হয়ে গেল। কেউ কথা বলছে না দেখে ইউজিন মুখ খুলল 'এবার বাড়ি ফিরতে হয়–দেরি দেখে বউ খুব দুশ্চিন্তা করবে।'

'হ্যাঁ, চলো আমিও উঠছি,' বলল গিবন।

সোজা হয়ে দাঁড়াল লী। 'নিকোলাসকে কাজে লাগাতে আমাদের কী অসুবিধা? আমার তো মনে হয় এতে বরং আমাদের সুবিধাই হবে। আমরা নিজেদের কাজ দেখব–লোকটাকে খুঁজে বের করে নিকোলাস আমাদের খবর

দিলে তখন সবাই মিলে গিয়ে কাজটা শেষ করে আসব। এতে আপত্তি করার কী আছে?'

'ওকে আমরা কেউ চিনি না, লী,' যুক্তি দেখাল গিবন।

'তাতে কী?' বার্ট নিজের মত প্রকাশ করল। 'দরকার হলে আবার আর একটা মিটিং ডেকে ওকে বরখাস্ত করব। তা ছাড়া আমার মনে হয় না এদিকে থাকতে এসেছে সে।'

'ওই ধারণা তোমার কী করে হলো?'

'একটু ভেবে দেখলেই বুঝবে। জেকবকে আগে থেকেই চেনে লোকটা। আমরা কী নিয়ে আলোচনা করছি সবই জানত সে। আমার মনে হয় জেকবের সাথে কোন শত্রুতা আছে ওর–পিছন পিছন ওকেই অনুসরণ করে এখানে পৌঁছেছে সে।'

'তা হলে আর টাকা দিয়ে ওকে রাখার কী দরকার?' বলেই যাবার জন্য উঠল গিবন। 'চলো,' ইউজিনকে বলল সে, 'একসাথেই যাই। তোমার খামার পেরিয়েই যেতে হবে আমার।'

ওদের দু'জনকে দরজার দিকে এগোতে দেখে কঠিন চোখে চাইল লী। 'তার মানে তোমরা লোকটাকে কাজে নেয়ার বিপক্ষে?'

থেমে দাঁড়াল গিবন। মাথা নিচু করে পুরো এক মিনিট চিন্তা করে সে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ লী, লোকটাকে পছন্দ হয়নি আমার। ওকে বিশ্বাসও হয় না। আমার মতে নিজেদের সমস্যা নিজেরা মেটানোই ভাল।'

ক্ষুব্ধ হয়ে ঘুরে ওদের দিকে পিছন দিয়ে দাঁড়াল লী। একটু অপেক্ষা করে বেরিয়ে গেল ওরা।

বার থেকে বেরিয়ে কাঠের রেলের সাথে বাঁধা ঘোড়ার লাগাম খুলতে খুলতে ইউজিন বলল, 'লী-র যে কী হয়েছে জানি না, মনে হয় যেন অনেক বদলে গেছে সে।'

'ও কিছু নয়, ইউ, আমাদের অন্যান্য সবার মত সে-ও ক্লান্ত, তেতো বিরক্ত হয়ে উঠেছে ওর মন। ঠিকমত বিশ্রাম পেলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

গিবন তাকে নিশ্চিন্ত করতে চাইলেও ইউজিন স্পষ্ট বুঝতে পারছে গিবন নিজেও এ-ব্যাপারে চিন্তিত। লী সবসময়ই একটু কঠিন প্রকৃতির লোকই ছিল। কিন্তু ইদানীং সে যেন আরও কঠিন হয়ে উঠেছে! ওর কাছে কোন উনিশ-বিশ নেই–সব কিছুই ওর কাছে হয় হ্যাঁ কিংবা না। ওর ধারণা, সে যেটা ঠিক মনে করে সেটাই ঠিক। ওটা যে আর কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায় তা মানতে সে রাজি নয়।

ছয়

জেকব রাইটের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু তার মনে কোন আকাশ-

কুসুম কল্পনা স্থান পায়নি। সে কী চায় এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা তার আছে।

যেখানে ভাল ঘাস আর পানি আছে এমন র‍্যাঞ্চ চাই তার। তাতে বিক্রি করার জন্য কিছু গরু-মহিষ থাকবে। ঘোড়াও থাকবে, কিন্তু তা সে ঘোড়া ভালবাসে বলেই রাখবে। হঠাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে বিশাল সম্পত্তি পাওয়া, বৌ-এর টাকায় বড়লোক হওয়া অথবা লুট করে টাকা বানানোর মতলব নেই ওর। এর যে-কোন শর্টকাট বা সহজ পথ নেই তা সে জানে। নিজেরটা নিজেই গড়ে নিতে চায় জেকব, তাই নিজের সবকিছু নিজেই দেখাশোনা করে সে।

আত্মরক্ষা করার জন্য এবার লড়তে হবে তাকে। বিভিন্ন দিক থেকে তার উপর আক্রমণ আসতে পারে। নিজের বিপদ যদি ওরা ডেকে আনতে চায় তা হলে লড়তে আসুক–উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবে সে।

তার জীবনে ডালিয়ার আগমন নিতান্তই আকস্মিক। তার পাশে চলার জন্য, তার জীবন-সঙ্গিনী করার জন্য মনে মনে কল্পনায় যে মেয়ের ছবি সে এঁকেছিল, ডালিয়া যেন ঠিক সেই মেয়েটি। সে জানত যে জীবন সে কাটাতে চায়, কোন মেয়ের পক্ষে তার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া খুবই কঠিন। ডালিয়াকে দেখামাত্রই বুঝেছে একেই এতদিন খুঁজছিল সে।

কেমন বাড়িতে থাকবে ওরা তাও কল্পনায় ঠিক করে রেখেছে জেকব। কিন্তু বাড়ি এখনও তৈরি হয়নি, তার আগেই মনের মানসীকে পেয়ে গেছে সে বাড়ি বলতে এখন যা আছে তা হচ্ছে ঝর্ণার পাশে পাহাড় থেকে বেরিয়ে থাকা একটা পাথরের নীচে একটা ছোট্ট গুহা।

প্রত্যেকদিন পাহাড়ে উঠে চারদিকে নজর রাখার সময়ে একা বসে অনেক কথাই ভাবে সে। পরবর্তীতে কী করবে, কোথায় যাবে এসব নিয়েই বেশি ভাবে। তার বিশ্বাস সব মানুষেরই একটা নির্দিষ্ট কর্মপন্থা থাকা দরকার। মানুষ একটা জাহাজের মত। চলার পথে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে বহুবার তাকে দিক পরিবর্তন করতে হয়। স্রোতে অনিশ্চিতভাবে ভেসে না বেড়িয়ে পরিকল্পিত গতি নিয়ে তাকে এগিয়ে চলতে হয়।

শেষ পর্যন্ত নাভাজো এলাকায় বাস করার ইচ্ছা জেকবের নেই। তার ইচ্ছা দক্ষিণ-পশ্চিমে হোয়াইট মাউনটেনের কাছে গাছপালাবহুল সবুজ এলাকায় সরে যাবে। কিন্তু তার আগে কলোরাডোতে একটা বিশেষ বন্য ঘোড়ার দল থেকে কয়েকটা ঘোড়া তার চাই। বিশেষ করে ওই সোনালী রঙের বড় কোল্টটা ওর মন কেড়ে নিয়েছে।

নাভাজো বা ইউটে ইন্ডিয়ান কারও চোখে ওটা পড়ে থাকলে ওরা নিশ্চয়ই ঘোড়াটা ধরে নিয়ে যাবে। তবে ওরা এদিকটায় খুব কমই আসে, তাই জেকবের মনে এখনও আশা আছে। কপাল ভাল থাকলে এখান থেকে যাবার সময়ে ওই ঘোড়াটার সাথে আরও কয়েকটা ভাল ঘোড়া নিয়ে যেতে পারবে সে

ওদের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে খাবার। ফ্রীডমে রসদ আনতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে ওকে।

কিছু মাংসও ওদের দরকার। আগামীকাল দু'জনে মিলে কিছুটা ঘুরে আসার ইচ্ছা আছে ওর। পথে একটা বিগহর্ন বা হরিণ শিকার করতে পারলে ওদের

সমস্যা মিটবে কিছুটা।

ডালিয়া ছোট্ট ঝিলটার ধারে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। 'আমাদের রাতের খাবার তৈরি করে রেখেছি,' বলল সে। কিন্তু ওদের কারোই খেতে যাবার কোন তাড়া দেখা গেল না। দুই পাহাড়ের ফাঁকে লাল সূর্যটা অস্ত যাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে লালচে রোদ আগুনের শিখার মতই দেখাচ্ছে। একটা জ্বলন্ত পাহাড় যেন। নীরবে পাশাপাশি বসে আলোর রঙ বদলানোর খেলা দেখছে ওরা। দূরে বিষণ্ন স্বরে একটা তিতির ডেকে উঠল। ওদিক থেকে আর একটার জবাব শোনা গেল।

'এই স্তব্ধ পরিবেশ আমার খুব ভাল লাগে,' বলল ডালিয়া। 'মনে হয় যেন এই ব্যাপ্তি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে নিজের সাথে আমাকে একাকার করে নিচ্ছে। এই বিশালত্বের সাথে এক হয়ে পার্থিব জ্বালা-যন্ত্রণা, অসন্তোষ সব কিছুই তুচ্ছ মনে হয়।'

রাতে খাওয়ার পরে একা একা বসে দূরের উঁচু পাহাড়টার দিকে চেয়ে জেকব তাদের বর্তমান আস্তানাটার কথাই ভাবছিল। জায়গাটা সত্যিই খুব সুন্দর–এটা ছেড়ে চলে যেতে তার বেশ খারাপ লাগবে।

নীরবে ডালিয়া এসে বসল ওর পাশে।

'পরিচিত প্রিয় পরিবেশ ছেড়ে এখানে এসে দম আটকে আসে না তোমার?'

'সেটাই স্বাভাবিক হত,' জবাব দিল ডালিয়া, 'কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এখন আর আমার নিজেরই বিশ্বাস হতে চায় না অন্য কোন জগৎ আমি কোনকালে চিনতাম। পাহাড়ী অঞ্চলের মানুষ আমি–সেই কারণেই হয়তো এইসব বিজন এলাকা আমার কাছে আপন বলে মনে হয়।'

পরদিন সকালে ওরা ঝোপ আর পাহাড় থেকে খসে পড়া পাথরের আড়াল দিয়ে ঘোরা পথে নিজেদের আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। ক্লিফের পাশ ঘেঁষে উত্তর দিকে চলতে চলতে দু'বার দূরে হরিণ দেখতে পেল জেকব। ঘোড়ার পায়ের কাছ থেকে একটা খরগোশ লাফিয়ে উঠে পালিয়ে যাচ্ছিল, তৃতীয় লাফের সময়ে জেকবের গুলিতে মারা পড়ল ওটা।

'খরগোশের মাংস খেতে খেতে পেটে চর পড়ে গেছে,' বলল সে। 'কিন্তু মাংস তো বটে?'

দু'বার ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখতে পেল ওরা। দাগগুলো খুব মনোযোগের সাথে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল জেকব। একবার কয়েক মাইল পর্যন্ত ওই দাগ অনুসরণ করে এগিয়েছিল, কিন্তু সেগুলো ক্যানিয়নের আরও গভীরে চলে গেছে দেখে ফিরে এল।

'যে দলটাকে আমি খুঁজছি ওরা আরও উত্তরে চড়ে বেড়ায়, চলো এগিয়ে যাই।'

'বুট' মেসার বাঁক ঘোরার সময়ে ঘোড়াগুলো দেখতে পেল ওরা। মুনলাইট ক্রীকের দিক থেকে এসে সমতল জমিটার উপর ইতস্তত ছড়িয়ে ঘাস আর ছোট ছোট ঝোপের পাতা খাচ্ছে।

কয়েক মিনিট পরে সোনালী স্ট্যালিয়নটাকে দেখা গেল একটা ঢিবির উপর। নিশ্চল হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে–কান দু'টো সতর্ক ভাবে খাড়া।

দূরত্ব ওদের থেকে এক মাইলেরও বেশি হবে। দূরবীন চোখে লাগাল জেকব। 'ঠিক কাঁচা সোনার রঙ,' বলল সে। 'কোমরের ওপর একটা সাদা ছোপ। এই দলটাকেই খুঁজছি আমি।'

এবার অন্য ঘোড়াগুলোর দিকে মনোযোগ দিল জেকব। মোট পঁচিশ তিরিশটা হবে। কয়েকটারই কাঁধে ও পাছায় সাদা ছোপ রয়েছে।

দেখা শেষ করে ডালিয়ার দিকে দূরবীন বাড়িয়ে দিল জেকব। 'ওই স্ট্যালিয়নটাকে দেখো। ওটার সাথে আরও কয়েকটাকে ধরব আমি।'

ডালিয়া ঘোড়াগুলোকে দেখার ফাঁকে জেকব বলে চলল, 'বৎসর কয়েক আগে একজন মরমন এসেছিল এই এলাকায়, সাথে করে কয়েকটা উঁচু জাতের ঘোড়া এনেছিল সে। তার নাম ছিল এড লিনেট। ঘোড়াগুলো ওর বাবা স্বয়ং ভার্জিনিয়া আর কেনটাকি থেকে এনেছিল। তারপর এড আইডাহোর নেজ পেরেজ থেকে একটা চমৎকার স্ট্যালিয়ন আর কয়েকটা মেয়ার জোগাড় করে।

'এগুলো বুনো ঘোড়া না?'

'অবশ্যই। একেবারে জংলী। পোষা একটা ঘোড়া খুঁজতে এসে এডকে একটা ভালুকের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ভালুকটা তার ঘোড়াকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে দেখে ছুরি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল সে। ভালুকটা ওর হাতে মারা পড়েছিল বটে কিন্তু মরার আগে তাকেও শেষ করেছিল।'

'অসাধারণ লোক তো!'

'হ্যাঁ, ওজনে মাত্র একশো বিশ পাউন্ড হলে কী হবে, শক্ত লোক ছিল সে। ঘোড়ার কোনরকম ক্ষতি সে সহ্য করতে পারত না। ভালুকটা ওকে খামচে কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেললেও ওর চামড়ায় নয়-দশ জায়গায় ছুরির মারাত্মক জখমের চিহ্ন পাওয়া গেছিল।'

কথায় কথায় আবার এগিয়ে চলল ওরা একটা ওয়াশ ধরে। বর্ষার পানির তোড়ে পাথর কেটে তৈরি হয়েছে ওয়াশ। সাবধানে এগোতে হচ্ছে, ঘোড়াগুলোর অলক্ষ্যে ওদের কাছে যেতে চাইছে জেকব। এত কিছুর মাঝেও পিছন থেকে কেউ আসছে কিনা সেটা বারবার খেয়াল করে দেখছে সে। এদেশে বেঁচে থাকতে হলে বন্দুক হাতের কাছে রাখা, আর পিছন দিকে নজর রাখা সবচেয়ে দরকারী।

সোনালী ঘোড়াটাকে এখন ধরার ইচ্ছা নেই ওর। কোন্ এলাকায় ওটা চলাফেরা করে, কোথায় চলে, কোথায় পানি খায় এসব জানতে চায় সে। সবচেয়ে বেশি চায় দেখা দিয়ে ওর সাথে একটু পরিচিত হতে—জেকবের তরফ থেকে ওর কোন বিপদ আসবে না এই বিশ্বাস ওর মনে জন্মাতে পারলে কাজ অনেক এগোবে।

সূর্যাস্তের আগে দু'বার ঘোড়াগুলোর আধ মাইলের মধ্যে গেল ওরা। কিন্তু দু'বারই আরও কাছে যাবার চেষ্টা না করে আবার দূরে সরে এল। মাথা উঁচু করে, নাক ফুলিয়ে, কান খাড়া রেখে শেষবার মাথা কয়েকশো গজ দূর থেকে স্ট্যালিয়নটা ওদের ফিরে যেতে দেখল।

রাতে হস্‌কিনিনি মেসার একটা খাঁজে ওরা ক্যাম্প করল। ঝোপ আর পাথরের আড়ালে আগুন জ্বালাল যেন দূর থেকে দেখা না যায়। খাওয়া সেরে

কফির কাপে চুমুক দেওয়ার সময়ে টের পেল সেই ঘোড়াগুলোই বেশ কাছে দিয়ে ওদের পেরিয়ে যাচ্ছে। মাঝ পথে সম্ভবত ওদের গন্ধ পেয়েই একবার থমকে দাঁড়িয়েছিল–পরে গন্ধটা চিনতে পেরে আবার নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে গেল। যাবার আগে একটা ঘোড়া যেন একটু বেশি ইতস্তত করল।

'ওই ঘোড়াটা,' নিচু স্বরে বলল জেকব, 'আগুন আর মানুষের গন্ধ চেনে বলে মনে হচ্ছে। খুব সম্ভব অল্পদিন আগেই ওটা আবার জংলী জীবনে ফিরে গেছে।'

ডালিয়া ঘুমিয়ে পড়ার পরেও অনেকক্ষণ আকাশের তারাগুলোর দিকে চেয়ে দেখেই কাটাল জেকব। ফ্রীডম থেকে যারা তাড়া করে এসেছিল, তাদের কথাই ভাবছে সে। ওদের চেহারা মনে করার চেষ্টা করছে–প্রত্যেকেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক–সহজে হাল ছাড়বে না। ভাবতে ভাবতে একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ল জেকব।

ফ্রীডম বা তার আশেপাশের কেউ সহজে লী-কে চটাতে সাহস পায় না। তারা সবাই জানে লী খুব পরিশ্রমী, সৎ আর দুঃসাহসী। ওকে চটালে উপায় নেই। একটু কঠিন আর অধৈর্যও সে। কোন কাজের সিদ্ধান্ত একবার নিয়ে ফেললে সেটা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ওর স্বস্তি নেই।

পরদিন সকালে সেলুন খোলার সাথে সাথেই বারে হাজির হয়ে গেল লী। সাত-সকালে ওকে দেখে সাবধান হলো ফ্রেড। গতরাতেই আঁচ করেছে সে আজ গোলমাল বাধতে পারে।

'নিকোলাস এদিকে এসেছিল আজ?' প্রশ্ন করল লী।

'ওর সাথে জড়াতে চাচ্ছ কেন? লোকটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবটাই বিষাক্ত বলে মনে হয় আমার।'

কঠিন চোখে ফ্রেডের দিকে চাইল লী। 'বিপদ "শক্ত-পাল্লার" আমাদের কী?'

'হয়তো...আমাদের বিপদ আনতে পারে সে।'

মন্তব্যটা অগ্রাহ্য করল লী। মনস্থির করে ফেলেছে ও–কোন বাধাই আর মানবে না। বলল, 'ওকে পছন্দ করতেই হবে এমন কোন কথাই নেই- জনপ্রিয়তায় প্রতিযোগিতায় নামছে না সে।'

'তুমি কি টাউন মার্শাল পদের জন্যে ওর নাম প্রস্তাব করবে?'

'সে তাই চায়। জেকবকে ধরে আনতে পারলে ওকে কী পদ দেয়া হলো তাতে কিছু আসে যায় না আমার।'

'ব্যাপারটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না, লী।'

লী বিরক্তি ভরা চোখে ওর দিকে চাইল। 'পছন্দ না হলে তুমিই যাও না, শক্ত-পাল্লাকে ধরে নিয়ে এসো?'

ফ্রেডের চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল। জবাব না দিয়ে চট করে ঘুরে চলে গেল সে। মানুষকে কিছু কিছু ব্যাপারে একটু সহনশীল হতেই হয়। হাজার হোক ডেরিক ছিল লী-র বন্ধু। পশ্চিমের সবখানেই বন্ধুত্বের উপযুক্ত দাম দেওয়া হয়।

দরজা ঠেলে ডিক আর ডেভ সেলুনে ঢুকল। দু'জনে একই টেবিলে বসল ওরা। সচরাচর ওদের বারে ঢুকতে দেখা যায় না। ফ্রেড ওদের অর্ডার মত দুই

গ্লাস বিয়ার পৌঁছে দিয়ে এসে আবার শুকনো তোয়ালেটা তুলে নিয়ে গ্লাস পালিশ করতে লাগল। একটু পরেই অ্যালেন আসবে…টাউন মার্শালের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা শুরু করবে ওরা। খোলা জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে চাইল ফ্রেড। গিবন আর ইউজিনের র‍্যাঞ্চে যাবার পথ ওটা। গিবন এখনও আসছে না কেন? এই মুহূর্তেই গিবনের ঠাণ্ডা মাথা আর বিচক্ষণ মতামত ফ্রীডমের দরকার।

'একজন মার্শাল আমাদের নিশ্চয়ই দরকার,' ডিককে বলতে শুনল ফ্রেড। 'বখে যাওয়া বাউণ্ডুলে লোকজনের আনাগোনা আজকাল অনেক বেড়ে গেছে শহরে। এই সেদিনের গোলাগুলির ঘটনাই ধরো—লোকটা ছিল বাজে গোছের একটা অকম্মার ঢেঁকি।'

'নিঃসন্দেহে ওকথা বলতে পারো না তুমি,' ডেভ তার দাঁতে ধরা চুরুটটা নামিয়ে বলল। 'দোকানের ওরা তো বলছে বেশ বড় সাপ্লাই-এর অর্ডার দিয়েছিল লোকটা।'

হাসল ডিক। বলল, 'তুমিও ওই কথা বলছ? আমার তো মনে হয় আর দু'একটা কথার পরেই সে বাকি চেয়ে বসত। লোকটার এদিকে কোন জায়গা-জমি থাকত, তবু বুঝতাম—এসব ঢের দেখেছি।'

বারে ঢুকে ওদের টেবিলেই বসে একটা বিয়ারের অর্ডার দিয়ে অ্যালেন বলল, 'আচ্ছা, লী, তুমি যে লোকটার কথা বলছ এই কাজের জন্যে সে উপযুক্ত হবে বলে মনে হয় তোমার?'

আড়চোখে ওর দিকে চাইল লী। 'কাজটা সে নিজেই নিতে চেয়েছে, তা ছাড়া লোকটাকে দেখে তো শক্ত-সমর্থ বলেই মনে হয়।'

পালিশ করা শেষ করে গ্লাসটা পিছনের তাকে রেখে আবার জানালা দিয়ে বাইরে চাইল ফ্রেড। নাহ, এখনও গিবন বা ইউজিনের দেখা নেই। লোকগুলো একটা বোকামি করতে যাচ্ছে…ফ্রীডমে আজ পর্যন্ত নিজেরা সামলাতে পারে না এমন কিছু ঘটেনি।

আলোচনার টুকরো টুকরো অংশ ফ্রেডের কানে আসছে। নিকোলাস তো অবশ্যই তার চির শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, লী-ও ব্যাপারটা অপছন্দ করবে—কিন্তু যা হবার হবে, সে এর বিরুদ্ধেই ভোট দেবে। আসল মুশকিল হচ্ছে এই শহরের সংবিধান অনুযায়ী সংখ্যায় এক তৃতীয়াংশ জমির মালিক উপস্থিত থাকলেই ভোটের মাধ্যমে একটা স্থায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ মাত্র বারোজন উপস্থিত থাকলেই চলবে? এখন লী, ডিক, ডেভ, অ্যালেন এরা যদি নেতৃত্ব দেয় তবে বাকি কয়েকজনও সহজেই জুটে যাবে।

ক্লাইভ আর বার্ট বারে ঢুকে এক বোতল মদ কিনে নিয়ে একটা আলাদা টেবিলে গিয়ে বসল। একটু পরেই ফ্রেড লক্ষ করল, পেনসিল দিয়ে টেবিলের উপর একটা নক্সা এঁকেছে বার্ট। নক্সার উপর একটা কাটা চিহ্ন এঁকে সে বলল, 'ঠিক এইখানটায় হচ্ছে মরমন কুয়া। আমরা যদি…' গলার স্বর হঠাৎ নিচু করে ফেলায় আর শুনতে পেল না ফ্রেড। আর শোনার দরকারও নেই—হারানো ওয়্যাগনের আলাপই করছে ওরা।

লী উঠে এগিয়ে গেল ওদের টেবিলের দিকে। 'তোমার সাথে আমার জরুরী

আলাপ আছে, বার্ট,' বলল সে।

'নিকোলাসকে মার্শাল করার ব্যাপারে তো? সে যদি শক্ত-পাল্লাকে ধরে আনবে বলে অঙ্গীকার করে—আমি ওকেই ভোট দেব।'

'আমিও,' বলল ক্লাইভ।

নিজের টেবিলে ফিরে গেল লী। সবই ফ্রেডের কানে আসছে··· কিন্তু গিবন কী করছে? সে আসছে না কেন এখনও?

সাত

বিশদ পরিকল্পনা নিয়েছে জেকব। সোনালী স্ট্যালিয়ন, আর সেই সাথে ওই দলের আরও কয়েকটা ঘোড়া ওর চাই। একটু দূরে দূরে থেকে নিজের উপস্থিতি স্বাভাবিক বলে মানিয়ে নিতে চাইছে সে। এক সপ্তাহ পিছন পিছন ঘুরে ওদের স্বভাব-চরিত্র মোটামুটি জেনে নিয়েছে ও। এমনকী খুরের চিহ্নগুলোও ওর চেনা হয়ে গেছে। এই ক'দিনে দু'টো হরিণও মেরেছে সে।

এর মধ্যে ডালিয়াকে আর কাছছাড়া করেনি জেকব। সবসময়ে পাশেপাশে রেখেছে। রোদ আর বাতাসে ওর চামড়ার সাদাটে ভাবটা কেটে গিয়ে সুন্দর তামাটে রঙ ধরেছে। নির্জন জীবনযাত্রায় নিজেকে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে ডালিয়া। ইউরোপের জগৎটাকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে এখানে প্রতিটি দিন আলাদা করে বেঁচে থাকার সংগ্রামটাকেই এখন পুরোপুরি উপভোগ করছে সে।

দশম দিন কফি ফুরিয়ে যাওয়ায় ওরা আবার ফিরে এল পুরোনো আস্তানায়। ঢোকার আগে অত্যন্ত সতর্কভাবে আশপাশটা বারবার পরীক্ষা করে দেখল জেকব। ক্লিফের পাশ দিয়ে সবটা জায়গা ভাল করে খুঁজে দেখে কেউ ওদের জন্য লুকিয়ে ওত পেতে বসে নেই নিশ্চিত জেনেও কয়েক ঘণ্টা পরে একাই সে ক্যানিয়নে প্রবেশ করল।

সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে মাল বোঝাই গাধাগুলোকে ডালিয়ার জিম্মায় রেখে একাই সে আবার ক্যানিয়নের মুখটার কাছে ফিরে গেল। মার্শ-পাসের সাথে মিশেছে ওটা। ঘোড়া থেকে নেমে মোকাসিনের একজোড়া জুতো পরে নিয়ে পায়ে হেঁটে ট্রেইলের উপর গিয়ে নতুন চলাচলের চিহ্নগুলো পরীক্ষা করে দেখল।

তারা এই এলাকা ছেড়ে যাবার পর মাত্র অল্প কয়েকটা নতুন চিহ্ন হয়েছে দেখল জেকব। বেশির ভাগই ইন্ডিয়ান টাট্টু আর জংলী ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন। ফিরে আসবে, হঠাৎ একটা বুটের ছাপ তার চোখে পড়ল। ছাপটা বেশ বড়—ভারি মানুষের। অল্প খুঁজতেই নতুন নাল লাগানো ঘোড়ার পায়ের দাগ দেখতে পেল সে।

লোকটা এখানে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিল। সন্দেহ নেই কান খাড়া করে অপেক্ষা করছিল সে। তারপর আবার মার্শ-পাসের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেছে।

নিকোলাসের পায়ের ছাপ কখনও দেখেনি জেকব। কিন্তু ওর মনে হচ্ছে এগুলো তারই। ওজন আর আকারেও মিলছে—পদক্ষেপের দূরত্ব দেখে উচ্চতা অনুমান করছে সে। ফেরার সময়ে সাবধানে বেছে বেছে পাথরের উপর পা ফেলে কোনরকম ছাপ না রেখে ফিরল জেকব।

ডালিয়া দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। ওকে দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল।

'ওখানে কিছু চিহ্ন দেখলাম,' বলল জেকব। 'আমার মনে হয় ওগুলো নিকোলাসের পায়ের ছাপ।'

'ও কি আমাদের খুঁজে পাবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল জেকব। 'ক্যাম্পটা হয়তো খুঁজে পাবে, ওখানে আমাদের অসংখ্য চিহ্ন রয়ে গেছে। কিন্তু ওখান থেকে আমরা কোন্ পথে বেরিয়েছি তা সে খুঁজে পাবে না। বেরিয়ে আসার চিহ্নগুলো সব এমন ভাবে মুছে দিয়ে এসেছি যে দেখে মনে হবে ওখানে অন্তত কয়েক বৎসরের মধ্যে কারও আনাগোনা হয়নি।'

সোজা উত্তর দিকে এগিয়ে সোনালী স্ট্যালিয়নের এলাকায় পৌঁছে গেল। রাত কাটাবার জন্য মুনলাইট ক্রীকের ধারে পাথরের ফাঁকে ক্যাম্প করল ওরা। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পশ্চিম দিগন্তের দিকে ডালিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করল জেকব।

দিগন্ত রোধ করে প্রায় বারো মাইল দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা বিশাল প্রশস্ত স্তম্ভ। 'ওটা নো ম্যান্স্ মেসা,' বলল সে। 'ওর সবচেয়ে উঁচু জায়গাটা আশেপাশে চারদিকের জমি থেকে অন্তত হাজার ফুট উঁচু। ওটার প্রত্যেকটা ধারই উচ্চতায় কম পক্ষে পাঁচশো ফুট হবে। লম্বায় নয় মাইল আর পাশে সিকি মাইল থেকে দেড় মাইল চওড়া। মানুষের পক্ষে ওখানে ওঠা অসম্ভব মনে হয় বলেই ওটার ওই নাম হয়েছে। তবে আমার ধারণা উপরে ওঠার একটা পথ আছে। ওর পশ্চিম ধার ধরে অর্ধেকের কিছু বেশি গেলে একটা খাঁজ আছে, ওখান দিয়ে উপরে ওঠার একটা চেষ্টা করতে চাই আমি। যদি কোন কারণে আমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়, যেখানটায় ক্লিফটা বাঁক নিয়ে পুব দিকে ঘুরে গেছে, সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করো তুমি। ওখানেই আবার মিলিত হব আমরা।'

পরদিন ঘোড়াটার দেখা পাওয়া গেল। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে ওদের একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেল সোনালী স্ট্যালিয়ন।

পশ্চিমে অরগ্যান রকের দিকে এগোচ্ছিল ওরা; পাহাড়ের ভিতর একটা সরু পথ ধরে ছুটে বেরিয়ে এসেই থমকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল সে। ওদের মাঝের দূরত্ব মাত্র গজ পঞ্চাশেক। সামনের জমিটা মোটামুটি সমতল। ইচ্ছা করলে এখনই ওটাকে ধরার চেষ্টা করতে পারত জেকব। খুব বেগে ছুটে গিয়ে ল্যাসো ছুঁড়ে হয়তো ধরা সম্ভব হবে, কিন্তু অত ঢালু, আর নরম বালুর উপর দিয়ে জোরে ছুটতে গিয়ে ওর ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙে যেতে পারে। ব্যর্থ হলে এতদিন কাজ যতটা এগিয়ে ছিল সব পণ্ড হয়ে যাবে।

স্ট্যালিয়নটাকে দেখে সম্মোহিত হয়ে চেয়ে রইল জেকব। কাছে থেকে ওটাকে আরও সুশ্রী দেখাচ্ছে রঙটা ঠিক উজ্জ্বল সোনার মোহরের মত। পাছায় আর তিনটে পায়ে সাদা ছোপ, কিন্তু তার মধ্যেও আবার সোনালী বুটি রয়েছে।

গলাটা গর্বিত ভঙ্গিতে বাঁকানো।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে জেকব আর ডালিয়াকে দেখল সে। সাথের অন্য ঘোড়াগুলো দ্রুতবেগে বেরিয়ে এসে ওর পাশে থেমে দাঁড়াল।

ওদের চলার গতি মুহূর্তের জন্য থমকে যেতেই বন্ধুসুলভ স্বরে জেকব ডেকে উঠল, 'ও বেটা, বন্ধুত্ব করবি?'

সজোরে মাথা নেড়ে শব্দ করে নাক ঝাড়ল ঘোড়াটা, তারপর আঁকাবাঁকা পথ ধরে পাথরের ভিতর দিয়ে অন্যদের পথ দেখিয়ে ফাঁকা জায়গার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। দলে বাকি পুরুষ ঘোড়াগুলো ওর সাথে একটা সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে ওকে অনুসরণ করছে।

নীচের সমতল জমির উপর দিয়ে ঘোড়াগুলো ছুটতে ছুটতে চোখের আড়ালে চলে গেল। ডালিয়ার দিকে ফিরে জেকব জিজ্ঞেস করল, 'কেমন দেখলে?'

'সত্যি,' মৃদু গলায় জবাব দিল সে। 'সত্যিই অপূর্ব!'

ধীর গতিতে ঘোড়াগুলো যেদিকে গেছে সেদিকেই এগিয়ে চলল ওরা।

'এদিকে একটা গল্প চালু আছে–কিছু সোনাভর্তি ওয়্যাগন এদিকে হারিয়ে গেছে–অনেক সোনা নাকি ছিল ওতে। সোনা চাই না, ওই স্ট্যালিয়নটা আর ওই দলের কয়েকটা ঘোড়া পেলেই আমি খুশি।'

হঠাৎ চট করে নিজের ঘোড়া ঘুরিয়ে ডালিয়ার ঘোড়ার পথ রোধ করে থেমে দাঁড়াল জেকব। ট্রেইলের চিহ্ন দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ডালিয়ার চোখ। জেকবের দৃষ্টি অনুসরণ করে মাটির দিকে চাইল সে।

ওদের সামনেই তিনটে নাল পরানো ঘোড়ার পায়ের ছাপ। বুনো ঘোড়ার দলটা দাগগুলো মাড়িয়ে কিছুটা অস্পষ্ট করে গেলেও বেশ বোঝা যাচ্ছে দাগগুলো খুব পুরোনো নয়।

'গতরাতের ছাপ,' বলল জেকব। 'জলদি লুকিয়ে পড়তে হবে আমাদের।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বুনো ঘোড়াগুলো যেপথ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল দ্রুত সেদিকে চলল ওরা।

হসকিনিনি মেসার তলায় কপার ক্যানিয়নের মুখের কাছে থামল জেকব। ঘুরে চারদিকে চেয়ে দেখল সে–কোন দিকেই ধুলো ওড়ার কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

'নতুন নাল লাগানো ঘোড়ায় চড়া তিনজন লোক,' বলল জেকব।

'ওরা কি আমাদের খুঁজছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'কে জানে? হয়তো তাই?'

অনেকক্ষণ সমতল প্রান্তরের উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে, ধীরে ধীরে সঙ্গীকে নিয়ে কপার ক্যানিয়নে ঢুকল জেকব। পশ্চিমে এগিয়ে চলল ওরা। বিকেলের দিকে পিউটে মেসার নীচে ক্যাট্‌ল্ ক্যানিয়নে ক্যাম্প করল।

পাথরের আড়ালে ছোট্ট একটা আগুন জ্বেলে ডালিয়াকে খাবার তৈরি কাজে ব্যস্ত রেখে চারপাশটা একটু ঘুরে দেখতে বেরুল জেকব।

রাতে খাবার খেতে বসে ডালিয়া বলল, 'জে, তুমি কিন্তু সেই সোনার ওয়্যাগনের গল্পটা আমাকে এখনও বলোনি।'

'বলব,' জবাব দিল সে। 'শোনো, আসলে আমার মনে হচ্ছে এদেরই

একজনের পায়ের ছাপ আমি মার্শ-পাসে দেখেছি। ওরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের বেশ কয়েকদিন ঘাপটি মেরে লুকিয়ে বসে থাকতে হবে।'

'খাবার কিন্তু বিশেষ কিছুই নেই।'

'জানি...একটু কষ্ট করে থাকতে পারবে না?'

হাসল সে। 'নিশ্চয়ই, তুমি পারলে আমিও পারব।'

খাওয়া শেষ হতেই আগুনটা নিভিয়ে দিল জেকব। তারপর পাথরের মাঝে একটা ভাল আশ্রয় খুঁজে নিল। সহজে কারও ওখানে ঢোকার সাধ্য হবে না। একটা গর্ত মত জায়গায় ঘোড়া আর গাধাগুলোকে রাখা হলো—বাইরে থেকে কারও নজরে পড়বে না ওগুলো।

সব কাজ সেরে আবার ডালিয়ার পাশে এসে বসল জেকব। 'তুমি হারানো সোনার ওয়্যাগনগুলোর কথা জিজ্ঞেস করছিলে না? সে এক পুরোনো গল্প,' আরম্ভ করল সে। 'পশ্চিমে মাটিতে পোঁতা গুপ্তধনের কথা অনেক শোনা যায়—কিছু পাওয়া গেছে, বাকিগুলো গুপ্তই রয়ে গেছে। ইন্ডিয়ানদের ভয়ে বা আক্রমণের মুখে অনেক সময়ই সাথে নিলে বোঝা বাড়বে বলে সোনা-দানা মাটিতে পুঁতেছে মানুষ। কখনও মালিক প্রাণ হারিয়েছে, আবার কখনও বা ফিরে আসার সাহস হারিয়েছে। সোনা দেখতে যত সুন্দর আর জ্বলজ্বলে হোক না কেন, কয়েকশো মাইল ফোস্কাপড়া গরম আর অ্যাপাচি ভরা মরুভূমির কথা মনে পড়লে অনেকেই ফেলে আসা সোনার চাকচিক্যের আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে।

'সতেরোজন লোক ছয় গাধার দু'টো গাড়ি নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে রওনা হয়েছিল। ওদের প্রত্যেকের সাথেই ছিল নিজস্ব ঘোড়া আর প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র। গাড়ি দু'টোতে খাবার আর অন্য জিনিসপত্রের সাথে ছিল সোনা—অনেক সোনা।

'সোনা যে ঠিক কতখানি ছিল তা কেউ জানে না। খুবই ধনী ছিল ওরা। কয়েকটা চালায় ভরে সোনার তাল, বার আর মুদ্রা—অর্থাৎ ওদের যথাসর্বস্ব নিয়ে স্যান ফ্র্যানসিসকো গিয়ে বসবাস করবে ঠিক করেছিল ওরা।

'মোহেড ইন্ডিয়ানের সাথে যুদ্ধে একজন মারা পড়ে কলোরাডোয়। বীলি স্প্রিং-এর কাছে এসে আরও একজন অক্কা পেল। কলোরাডোর যুদ্ধে তীর খেয়ে জখম হয়েছিল লোকটা। বেশ দুর্বল হয়ে পড়লেও কেউ আশা করেনি লোকটা শেষ পর্যন্ত মারা যাবে।

'দূরে উত্তর-পুবে স্যান ফ্র্যানসিসকোর পাহাড়ের চূড়া দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হয়ে রাতের মত ওরা বিশ্রাম নেয়ার জোগাড় করছে, এমন সময়ে একদল কয়োটেরো অ্যাপাচি ওদের আক্রমণ করল। তিনদিন ধরে যুদ্ধ চলল—খুব একটা ক্ষতি হলো না ওদের—একজন মরল আর দু'জন আহত হলো। মারাত্মক জখম হয়নি কেউ।

'কিন্তু সেই রাতে আহতদের একজন মারা গেল। এবারও লোকটার মৃত্যু হবে কেউ আশা করতে পারেনি। সামনেই কিছু কঠিন পথ পার হতে হবে ওদের, সমর্থ সবকয়টা লোকের সাহায্য দরকার। পরপর দু'জন লোক অমন অপ্রত্যাশিত ভাবে মারা যাওয়ায় কেমন একটা ভয় ঢুকে গেছে ওদের মনে। কুসংস্কার বিশ্বাস

করতে আরম্ভ করেছে ওরা।

'মাত্র তেরোজন সমর্থ লোক আর দু'টো মন্থর গতি গাধার গাড়ি নিয়ে অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে জানে ওরা। আহত লোকটার হাত জখম হয়েছে–ঘোড়ায় চড়তে অসুবিধে নেই তার–কিন্তু দু'দুজন জখম লোককে পটল তুলতে দেখে অসম্ভব ভয় পেয়েছে লোকটা–স্বাভাবিক।

'পরবর্তী তিনদিন নির্বিঘ্নেই কাটল ওদের। কিন্তু তার পরেই সেই আহত লোকটাও হঠাৎ রাতের বেলা মারা গেল। দলের মধ্যে একজন স্প্যানিশ লোক প্রতিদিনের ঘটনা ডায়েরীতে লিখে রাখত। মৃতদেহটাকে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করতে গিয়ে রবার্তো খেয়াল করল লোকটার কানের কাছে এক ফোঁটা রক্ত দেখা যাচ্ছে। ভাল করে পরীক্ষা করে সে দেখল কানের ভিতর দিয়ে একটা স্টীলের তার মগজে ঢুকিয়ে লোকটাকে খুন করা হয়েছে। তারটা তখনও কানের ভিতরেই রয়েছে। রবার্তো ধরে নিল অন্য দু'জন আহত লোককেও একই উপায়ে মারা হয়েছে। যে-ই মেরে থাকুক, সে এই দলেরই কেউ।'

'কতদিন আগের ঘটনা এটা?'

'পনেরো-ষোলো বছর হবে। এখানকার জন্যে ওটা খুব দীর্ঘ সময়। সে যাক, রবার্তো ভয়ে কুঁকড়ে রইল। কাউকেই কথাটা জানাল না। খুনীর উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট–সোনা।

'রাতে আগুনের ধারে বসে সবার সামনে ঘটনা খুলে বলল রবার্তো–জানাল তাদের মধ্যেই রয়েছে খুনী। পরদিন সকালে সবাই আবার রওনা হলো বটে, কিন্তু এখন আর কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

'রবার্তো আর ওর সাথে দলের আর একজন লোক সামনে এগিয়ে চারদিকে খেয়াল রাখছিল, বহুদূরে কয়োটেরোর একটা বিরাট দল দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে সবাইকে সাবধান করল ওরা। ওই ইন্ডিয়ান লোকগুলো ওদের দেখেছে কিনা বলতে পারল না রবার্তো।

'ওরা ঠিক করল প্রায় অব্যবহৃত একটা ট্রেইল ধরে উত্তর-পুবে সরে গিয়ে ইন্ডিয়ানদের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে যাবে। যুদ্ধ ওরা এড়িয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু সেইসাথে সোনাগুলোও হারাল।

'বালুর ঝড়ের মধ্যে পড়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলল। একটা গাধা পাথরে হোঁচট খেয়ে পা ভেঙে বসল। ওটাকে মেরে ফেলতে বাধ্য হলো ওরা। অনেক সংগ্রাম করে পুব দিকে এগিয়ে শেষ পর্যন্ত মরমন কুয়ার কাছে পৌঁছল সবাই।

অবশ্য কুয়াটা তখন ওই নামে পরিচিত ছিল না···নাম থেকে থাকলে ওটার হয়তো ইন্ডিয়ান কোন নামই ছিল। এই মরু এলাকায় প্রচুর পানি পেয়ে খুশিতে সব ভুলে গেল ওরা। সেই রাতেই ওদের আর একজন মানুষ অদৃশ্য হলো। আগুনের জন্য ক্যাম্পের কাছেই কাঠ আনতে গেছিল লোকটা। অনেক পরে সবাই টের পেল কাঠ আনতে গিয়ে লোকটা আর ফেরেনি।

'ওর আর দেখা পাওয়া যায়নি। কিছু পায়ের ছাপ অবশ্য পাওয়া গেছিল, কিন্তু কতগুলো পাথরের কাছে এসে চিহ্ন মিলিয়ে গেছে।'

একটু চুপ করে কান পেতে শব্দ শোনার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে জেকব

আবার আরম্ভ করল, 'এগারোজন বাকি রইল আর। বিজন ক্যানিয়নে পথ হারিয়ে অসহায় বোধ করছে সবাই। কয়েকবার চেষ্টা করে প্রতিবারই শেষ পর্যন্ত কানা গলির মাথা থেকে ফিরে আসতে হয়েছে। ওয়্যাগনসহ চলা খুব কষ্টসাধ্য হচ্ছে। এই সময়ে ওদের আর একটা গাধা খোঁড়া হয়ে গেল।

'বদমেজাজী হয়ে উঠেছে সবাই। কয়েকবার নিজেদের মধ্যেই মারপিট হবার জোগাড় হলো। ওদের সাথে একজন চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সের ছেলে ছিল; ক্যালিফোর্নিয়া থেকে রওনা হবার সময়ে শেষ মুহূর্তে ওদের সাথে যোগ দিয়েছিল সে। এই ছেলেটাই ভাগ্যক্রমে ওখান থেকে বেরোবার একটা পথ খুঁজে পেয়ে যায়। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে খুব সরু একটা পথ। ওই পথ ধরেই খোলা মরুভূমিতে বেরিয়ে পাহাড় ঘেঁষে অস্পষ্ট পুরোনো ইন্ডিয়ান ট্রেইল ধরে দক্ষিণে রওনা হলো ওরা।

'কতদূর এগিয়েছিল তা কেউ বলতে পারে না। পথের মধ্যেই কয়োটেরোর আক্রমণ হলো। আক্রমণটা অপ্রত্যাশিত ভাবে এলেও চট করে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে গেল তারা। ইন্ডিয়ানরা ওদের বেশির ভাগ পশুই তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। যুদ্ধের শেষে দেখা গেল মাত্র চারজন বেঁচে আছে। আর সেই ছেলেটা।

'ওই চারজনের মধ্যে রবার্তো ছিল একজন। সে বেঁচে না থাকলে তার ডায়েরী থেকে এসব কথা আর জানা যেত না। যুদ্ধ শেষ হতেই ওদের ভিতরই আর একটা লড়াই বেধে যাবার উপক্রম হলো। মন্টি নামের ছেলেটাকে খুন করার জন্যে খেপে উঠল একজন। অন্যেরা অনেক কষ্টে তাকে থামাল।'

'ছেলেটাকে মারতে চাইল কেন?'

'কারণ যুদ্ধের সময়ে ছেলেটা একটা গর্তের ভিতর লুকিয়ে ছিল সারাক্ষণ—বিন্দুমাত্র সাহায্যও সে করেনি।'

'কিন্তু মন্টি যে ছেলেমানুষ!'

'পশ্চিমে ছেলেমানুষ বলে কিছু নেই। ওর চেয়েও অনেক কম বয়সের ছেলেদের এখানে বড়দের সাথে কাঁধ মিলিয়ে পাশাপাশি যুদ্ধ করতে হয়। অন্যান্য বিপদেও তাদের বড়দের সাথে সমান ঝুঁকি নিয়ে সবার দুঃখ-দুর্দশার সমান ভাগ নিতে হয়।

'পশুগুলো সব হারানোর পরে ওয়্যাগন দু'টো ওখানেই ফেলে যাওয়া ছাড়া আর উপায় রইল না। যে কয়টা বাড়তি ঘোড়া ছিল তাদের পিঠে সোনা বোঝাই করে কঠিন পাথুরে উঁচুনিচু পথ ধরে পাহাড়ের দিকে ফিরে গেল ওরা।

'বেশিদূর যাবার সাহস তারা পায়নি—কাছেই এক পাহাড়ের ভিতর একটা গর্তে সোনা লুকিয়ে রাখল। ওদের ভয় ছিল যে-কোন মুহূর্তেই আবার ইন্ডিয়ান আক্রমণ আসতে পারে, মোটে এই ক'জনে আর একটা আক্রমণ কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না ওরা।

'লোকালয়ে ফিরে কুলিমজুর ভাড়া করে ওখান থেকে সোনা উদ্ধার করে নিয়ে যেতে যা খরচ পড়বে তার জন্যে যথেষ্ট সোনা মজুদ রেখে, বাকিটা লুকিয়ে রাখা হলো। ওদের সবার চোদ্দ-পুরুষ হেসে খেলে রাজার হালে কাটিয়েও শেষ করতে

পারবে না এত সোনা। কিন্তু মন্টির কাপুরুষতার জন্যে ওকে বঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ওর হাত-পা আর চোখ বেঁধে সোনা লুকিয়ে রেখে এল ওরা।

'ওদেরই কেউ বাকি দু'জন বা তিনজনকে খুন করেছিল। ছেলেটা খুন হয়েছিল কি বেঁচে আছে জানা যায়নি।

'মাঝে মাঝে ঘোড়া বদল করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে শেষ পর্যন্ত ওরা সান্তা ফে পৌঁছল। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না বলে শহরে পৌঁছে আলাদা হয়ে গেল সবাই। পরদিন সকালে রবার্তো আর একজনকে সাথে নিয়ে সাথীর খোঁজে তার ঠিকানায় পৌঁছে দেখল বুকে ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় নিজের কামরায় মরে পড়ে আছে লোকটা।

'কথা ছিল শহরে পৌঁছেই লোকজন জুটিয়ে সোনা উদ্ধার করে নিয়ে আসবে ওরা। কিন্তু ভাব-গতিক দেখে বিকেলের আগেই সরে পড়ল রবার্তো—যথেষ্ট ধকল গেছে ওর উপর—সোনার ভাগ আর চায় না সে। ল্যাস ভেগাস হয়ে সেইন্ট লুই চলে গেল সে। আর ফেরেনি—অন্যদের কী হলো তাও আর খোঁজ করার চেষ্টা করেনি।'

'ওর সাথীরা নিশ্চয়ই সোনার জন্যে ফিরে এসেছিল?'

'হয়তো—কিন্তু গুপ্তধন-শিকারীদের ধারণা ভিন্ন। অবশ্য তার কারণও আছে। আসলে রবার্তোর ডায়েরীটা না থাকলে এসব কিছুই জানা যেত না। যতদূর জানা গেছে ওর সঙ্গীরা খুন হয়েছে।'

'সবাই?'

পকেট থেকে পাইপ বের করে তাতে তামাক ভরে সে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, কেবল সেই ছোট ছেলে মন্টি ছাড়া আর সবাই মৃত।'

'ওদের কে খুন করল তা জানা যায়নি?'

'না।'

'জে, আমরা একটু খুঁজে দেখলেই তো পারি? এই এলাকাটা তোমার ভালই চেনা আছে। ভাল করে খুঁজলে হয়তো পেয়েও যেতে পারি!'

'সুইটি, ওই সোনালী ঘোড়াটা আমার চোখে সোনার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর আর লোভনীয়। তা ছাড়া এই নির্জন এলাকায় ওটা সোনার চেয়ে অনেক বেশি কাজে আসবে। ওই সোনার কথা ভুলে যাওয়াই ভাল—ওর পিছনে ছুটে এ পর্যন্ত অনেক লোক মারা পড়েছে।'

'এই এলাকাতেই কোথাও লুকানো আছে সোনা, তাই না?'

অন্ধকারে কয়েক সেকেন্ড কান পেতে শুনল সে। ডালিয়াও জবাবের জন্য তাগাদা দিল না। সে জেনে ফেলেছে এটা ওর অভ্যাস। কথার ফাঁকেও বারবার জেকব ঘোড়াগুলোর প্রতিক্রিয়া খেয়াল করে দেখছে, লক্ষ করেছে ডালিয়া। বিপদ এলে ঘোড়াই মানুষের আগে তা টের পাবে।

'কেলভিন ওই সোনা অনেকদিন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—পায়নি। রবার্তোর মৃত্যুর পরে ওই ডায়েরীটা ওর ভাগনের হাতে পড়ে। সে সোনার খোঁজে এখানে এসেছিল, ওর সাথেই কেলভিন প্রথম এই এলাকায় আসে। এখন সম্ভবত এই এলাকা সম্বন্ধে ওর চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না।'

'ওরা তা হলে সোনা খুঁজে পায়নি?'

'না তবে একদল পিউটে ওদের খুঁজে পেয়েছিল। ইন্ডিয়ান যোদ্ধার একটা দল ডার্টি ডেভিল হয়ে কলোরাডোতে ঢোকে। আক্রমণ করে রবার্তোর ভাগনে আর কেলভিনকে জখম করে ওদের ঘোড়া তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেছিল ইন্ডিয়ানরা।

'একমাস আধপেটা খেয়ে পায়ে হেঁটে বহু কষ্ট সহ্য করে শেষ পর্যন্ত প্রাণে বেঁচে ফিরেছিল ওরা। রবার্তোর ভাগনের সোনার লোভ পুরোপুরি মিটে গেছিল ওই একমাসে। মামার ডায়েরীটা কেলভিনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে পুবে চলে যায় সে। মিসিসিপির পশ্চিমে কেলভিন ছাড়া সম্ভবত এক মাত্র আমিই ওই ডায়েরীটা নিজের চোখে দেখেছি।'

উঠে ঝোপের ভিতর দিয়ে ওপাশে চলে গেল জেকব। উৎকর্ণ হয়ে শব্দ শোনার চেষ্টা করছে সে। ডালিয়া কিছুতেই বুঝে পায় না লোকটা কী করে ঝোপের মধ্যে দিয়ে এমন নিঃশব্দে যাতায়াত করে।

ঝোপের ভিতর একা চুপচাপ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জেকব–শুনছে। মনের মধ্যে নিজেদের পরিস্থিতিটা পর্যালোচনা করে নিচ্ছে সে।

ফ্রীডমের লোকগুলো সহজে তার পিছু ছাড়বে না–ওদের চেহারা দেখে সে বুঝেছে ওরা সবাই দৃঢ়সংকল্পের অধিকারী। নিকোলাসের কথাও ভাবছে সে। ওই লোকটাও ছাড়বে না তাকে। হঠাৎ তার মনে হলো দু'টো দলের তো একই উদ্দেশ্য–তাকে খুঁজে বের করা, ওরা একত্র হয়ে কাজে নামেনি তো? চতুর লোক নিকোলাস। শক্তি বাড়াবার সুযোগ কোনমতেই ছাড়বে না সে।

ইচ্ছা করেই ফ্রীডমের লোকগুলোকে মরমন কুয়ার কাছে নিয়ে গিয়েছিল জেকব। সে ভেবেছিল সোনার লোভে পড়ে ওর কথা ভুলে লোকগুলো সোনা খুঁজতে লেগে যাবে। কিন্তু ঘটানচক্রে মনে হচ্ছে তার ফন্দিটা ঠিক কাজে লাগেনি।

এই এলাকাটা বিরাট, কিন্তু এতগুলো লোক যদি একসাথে তাকে খুঁজতে শুরু করে, তবে ঠিকই বের করে ফেলবে।

ওই স্ট্যালিয়নটার সাথে ওই দলের আরও কয়েকটা ঘোড়া ধরতে হলে জেকবের কিছু সময় দরকার। ওগুলো কোথায় পানি খায়, কোথায় ওদের ফাঁদে ফেলে ধরতে সবচেয়ে সুবিধা হবে, এসব সঠিক জেনে নিতে ওর অন্তত পক্ষে তিরিশ-চল্লিশ দিন সময় লাগবে–বেশিও লাগতে পারে।

বিকল্প একটা উপায় বের করতে হবে ওকে। যে করেই হোক ওদের ধোঁকা দিয়ে বোঝাতে হবে যে সে এই তল্লাট ছেড়ে চলে গেছে।

ভাবতে ভাবতেই সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠল জেকবের ঠোঁটে। একটা পথ বের করে ফেলেছে সে।

আট

ইচ্ছা করেই এতদিন টিউবা সিটির দিকে পা বাড়ায়নি জেকব। ওর পক্ষে ফ্রীডম

শহরের চেয়ে টিউবা যাওয়া অনেক সোজা হত–কাছেও পড়ত। তবু সে টিউবা যায়নি কারণ ওখান থেকে রসদ আনতে গেলে তার এই অঞ্চলে উপস্থিতির খবর অ্যারিজোনার শেষ মাথা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

কিন্তু এখন ঠিক তাই সে চাইছে।

'সব গুছিয়ে নাও,' ডালিয়াকে বলল জেকব। 'আমরা এদেশ থেকে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে প্রেসকটের দিকে রওনা হব।'

ডালিয়ার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে আবার সে বলল, 'অন্তত সেই রকমই ভাব দেখাব আমরা। প্রেসকটের দিকে রওনা হয়ে যেন সত্যি ওই দিকেই যাচ্ছি এমন ভান করব–পরে বালির পাহাড়গুলো ঘুরে আবার এদিকে ফিরে আসব। বালুর ওপর আমাদের সব ছাপ খুব জলদি মিলিয়ে যাবে।'

'তুমি ওদের বোঝাতে চাও যে আমরা চলে গেছি?'

'কিছু সময় খরচ হবে, কিন্তু অনেক ঝামেলা থেকে আমরা বেঁচে যাব।'

'কিন্তু ওরা যদি টিউবা সিটিতেই আস্তানা গেড়ে থাকে? ওদিক দিয়েই তো যেতে হবে আমাদের?'

'হতে পারে। সম্ভাবনাটাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেয়া যায় না। যদি তাই হয়, তবে ওখানেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। ভাগ্যে থাকলে তাই হবে।'

মানুষে মানুষে একটা অদৃশ্য নিয়তির যোগসূত্র থাকে। সেই টানেই হয়তো সেদিন রাতে হঠাৎ লী-র ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে শুয়ে থেকেই নিজের দুই হাতের উপর মাথা রেখে অন্ধকার রাত্রির দিকে চেয়ে রইল সে।

নিকোলাসের উপর নির্ভর করে আর বসে থাকা যায় না। আগামীকাল কীথ তার র‍্যাঞ্চের কাজ শেষ করে কিছুদিন ফুরসত পাবে–ইউজিনও আসবে ওর সাথে।

ইউজিনের কথা মনে পড়তেই একটু বিরক্তি বোধ করল লী। ওর গা জ্বালানো উদ্ভট মন্তব্য, আর শেষের দিকে এই মিশনের প্রতি আস্থার অভাবই লী-র এই বিরক্তির কারণ। চুলোয় যাক ওর কথা··· এমনিতে অবশ্য লোক হিসাবে ইউজিন খুব খারাপ নয়।

লী-র চিন্তাধারা উত্তরে মোড় নিল এবার। টিউবা সিটি···হ্যাঁ ওখানেই যাবে সে। নাভাজো এলাকায় কেউ থাকলে টিউবা সিটিতে ঠিকই তার খবর পাওয়া যাবে। আর তা ছাড়া রসদের দরকার হলে, ফ্রীডমে আসার পথ যখন বন্ধ, জেকবকে টিউবা সিটি থেকেই তা সংগ্রহ করতে হবে। ফ্রীডমে না ফিরে আগেই ওদের টিউবা গিয়ে জেকবের অপেক্ষায় বসে থাকা উচিত ছিল।

অন্ধকার কাটেনি, তবু বিছানা ছেড়ে উঠে জামাকাপড় পরে নিল লী। আগুনটাকে একটু উস্কে দিয়ে একটা মোমবাতি জ্বালাল সে। তারপর উইনচেস্টারটা নামিয়ে পরিষ্কার করতে বসল। ওর সামনে আগুনের শিখা যুদ্ধের নাচ নাচছে।

আরও উত্তরে পাহাড়ের একটা খাঁজের ভিতরে লকলকে ফণা তুলে নাচছে আর একটা আগুন। আগুনের পাশে কুঁজো হয়ে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন নিকোলাস। ওর সঙ্গী দু'জনের একজন এখনও ঘুমাচ্ছে, অন্যজন সজাগ রয়েছে।

একবার ওদিকে চেয়ে দেখল নিকোলাস।

'টিউবায় ফিরে যাব আমরা,' বলল নিক। 'সকালে সূর্য ওঠার সাথে সাথেই রওনা হব।'

'ঠিক আছে,' লম্বা চিকন মুখো লোকটা সাড়া দিল। যুবকের চোখ দু'টো অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল। 'ওদের দু'জনকে ধরার পর মেয়েটাকে কে পাচ্ছে?' প্রশ্ন করল সে।

নিকের প্রকাণ্ড মাথাটা ধীরে ধীরে ওর দিকে ঘুরল। চোখে-চোখে চেয়ে আছে লোকটার দিকে সে–ঠাণ্ডা আর স্থির ওর চোখ দু'টো। 'আমি,' শান্ত গলায় জবাব দিল নিকোলাস। 'আমার আশ মিটে গেলে ইচ্ছা করলে তুমি ওকে পেতে পারো। তবে একটা কথা, আমাদের কাছ থেকে কোন অবস্থাতেই ওকে জীবিত ফিরতে দেয়া চলবে না।'

অবজ্ঞাভরে কাঁধ ঝাঁকাল যুবক। 'তাতে আপত্তি নেই আমার,' বলে আগুনের কাছ থেকে একটু সরে স্থির দাঁড়িয়ে দূরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল সে। সেই চোখা চূড়াটা উত্তর দিকে দেখা যাচ্ছে। তা হলে...

ফিরে চাইল সে। আগুনটাকে একটু খুঁচিয়ে দিচ্ছে নিক। ওকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না যুবক। এতে ওই বিশাল লোকটার একটা মতলব নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেটা কী তা জানার কোন আগ্রহ তার নেই। সে-ও একটা নিজস্ব পরিকল্পনা আর উদ্দেশ্য নিয়েই হাজির হয়েছে এখানে।

উঠে দাঁড়াল নিকোলাস। 'ঘুমাতে যাচ্ছি আমি। তুমি আমাদের ঘোড়াগুলোর একটু দেখাশোনা ক'রো, মন্টি।'

যাযাবর নাভাজোদের তৈরি পরিত্যক্ত কাঁচা ঘরগুলো নিয়েই গড়ে উঠেছে টিউবা সিটি ব্যবসা কেন্দ্র। একজন হোপি চীফের নামেই এই শহরের নাম।

জেকব তার পিস্তলের ট্রিগার থেকে চামড়ার বেল্টটা সরিয়ে ফেলল। ঘোড়ার পিঠে খাপে ভরা উইনচেস্টার রাইফেলটাও সহজে বেরিয়ে আসে কিনা একবার পরখ করে দেখল সে।

টিউবা পোস্টের দিকে এগিয়ে উত্তর দিককার বালির ঢিবির মধ্যে দিয়ে ঘুরে পশ্চিমে গিয়ে ভাল করে পরিস্থিতিটা বুঝে নিল। মাত্র একটা ক্লান্ত দুর্বল ইন্ডিয়ান টাট্টু বাঁধা রয়েছে পোস্টের বাইরে। শান্ত পরিবেশ–সকালের স্তব্ধ বাতাসে চিমনির ধোঁয়া অলস গতিতে পাক খেয়ে উপরে উঠছে।

ঘরটা কাঁচা বলে ভিতরটা বাইরে থেকে অনেক ঠাণ্ডা। একটা লিকলিকে পাতলা লোক কাউন্টারে বসে চামড়ার ফিতে দিয়ে বেণী গেঁথে বেল্ট তৈরি করছে। আগুন নেভানো ফায়ার-প্লেসের কাছে আর একটা চেয়ারে পা তুলে দিয়ে বসে আছে একজন শক্তিশালী পেশীওয়ালা মানুষ। লোকটার কঠিন তামাটে মুখে দু'টো গভীর লম্বা ক্ষত চিহ্ন।

'দোকানদারির কাজ কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকে আমার,' অসন্তোষ প্রকাশ করল রোগা লোকটা। 'কিন্তু তবু কিছুটা স্বস্তি, নাভাজো ইন্ডিয়ানের দল ওদের ছাগল নিয়ে সরে গেছে আরও ভিতর দিকে পাহাড়ের উপর। গত দুই সপ্তাহের

মধ্যে আর কোন ইন্ডিয়ান দেখিনি আমি।'

ষণ্ডা-মার্কা লোকটা পাইপ হাতে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। সব সময়েই বাইরেটা পরিষ্কার দেখা যায় এমন জায়গায় ওর বসার অভ্যাস। বদ্ধ পরিবেশে দম আটকে আসে ওর।

'তুমি কি আবার সোনার খোঁজে বেরুবে, কেলভিন?' কথা বলার সঙ্গী পেয়ে পাতলা লোকটা খুব খুশি। চুপ করে থাকতে শেখেনি সে–বলার কিছু না থাকলেও বকবক করাই চাই।

'হুঁ,' জানালা দিয়ে দু'জন মানুষকে ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখে সেদিক থেকে চোখ না সরিয়েই জবাব দিল কেলভিন। উত্তর দিক থেকে পৌঁছেছে ওরা, অথচ এখন আসছে পশ্চিম থেকে। অর্থাৎ ঘরের বাইরে কয়টা ঘোড়া বাঁধা আছে দেখে নিয়ে তবেই আগে বেড়েছে। ওদের মধ্যে একজন মেয়ে। পাশ ফিরে জিনে বসার ভঙ্গি দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে। এদেশে মেয়েদের সচরাচর ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে দেখা যায় না।

এক মিনিট পরে পাইপ ধরিয়ে তাতে লম্বা একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কেলভিন বলল, 'দু'জন অতিথি আসছে। নিজেকে একটু দুরস্ত করে নাও–ওদের একজন আবার মহিলা।'

চমকে উঠে কাউন্টার থেকে নেমে তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে উঁকি দিল সে। 'তাই তো? এ যে দেখছি সত্যিই একজন জলজ্যান্ত ভদ্রমহিলা!'

ঘোড়া বাঁধার রেলের কাছে পৌঁছে নিচু গলায় মহিলাকে কিছু নির্দেশ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল পুরুষ লোকটা। মেয়েটি ঘোড়ার পিঠেই বসে রইল।

'ঝামেলা,' বলে উঠল কেলভিন।

'বুঝলাম না, কী বললে?'

'কিছু না। নিজের মনেই কথা বলছি। তুমি এদিকে কান দিয়ো না।'

রাইফেলের ব্যারেল দিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল জেকব। এতে ওর উইচেস্টারটা কাউন্টারের দিকে তাক করা থাকল। কিন্তু ওটা কোমরের কাছে ধরা রয়েছে বলে ভিতরে বসা লোকের কাছে আপত্তিজনক বা অশোভন দেখাল না।

কেলভিনের চোখ দু'টো চকচক করে উঠল। কিছু বলতে গিয়েও আবার পাইপ মুখে দিয়ে চুপ করে গেল সে। জেকব ওর দিকে এমনভাবে চাইল যেন ওকে চেনেই না সে।

এখানে মহিলাদের হাত-মুখ ধোয়ার কোন জায়গা আছে? আমার স্ত্রীর জন্য বলছি।'

'নিশ্চয়ই,' ব্যস্ত হয়ে উঠে হাত দিয়ে তার পিছনের দরজাটা দেখাল রোগা লোকটা। 'মালিকের থাকার ঘরটায় সব ব্যবস্থাই আছে–এটা ব্যবহার করতে পারে তোমার স্ত্রী।'

ঘাড়টা সামান্য ফিরিয়ে ডালিয়াকে ভিতরে আসতে বলে ঘরে ঢুকল জেকব। ওকে ঘোড়া থেকে নামাতে গেলে ভিতরের দিকে পিঠ ফেরাতে হবে–কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয় সে। কেলভিনের সাথে গত কয়েক বছরে তার আর দেখা হয়নি,

তবু ওর তরফ থেকে বিপদ আশা করছে না জেকব।

'আমাদের কিছু রসদ দরকার,' যত্ন করে লেখা একটা তালিকা কাউন্টারের উপর রাখল সে। 'এদিকে পশ্চিমে সবচেয়ে কাছে পড়বে প্রেসকট, তাই না?'

'হুঁ।' দরজার দিকে চেয়ে ছিল লোকটা, ডালিয়াকে ঢুকতে দেখে চোখ দু'টো ওর উপরই আটকে গেল। মেয়েটার উপস্থিতি এই সাদামাঠা ঘরটার চেহারাই পালটে দিয়েছে।

'ক্যালিফোর্নিয়ায় চলেছ?' ডালিয়ার দিক থেকে চোখ না সরিয়েই জেকবকে প্রশ্ন করল লোকটা।

'না,' প্রেসকটের আশেপাশেই কোথাও…হয়তো স্কাল ভ্যালিতে যাব।'

দরজার ওপাশে হাত-মুখ ধুতে গেল ডালিয়া। তালিকা অনুযায়ী মালপত্র জড়ো করায় ব্যস্ত হলো লোকটা। ফায়ার-প্লেসের কাছে গিয়ে দাঁড়াল জেকব।'

'এখান থেকে পশ্চিমের পথটা কেমন?' কেলভিনকে প্রশ্ন করল সে।

মাঝবয়সী কেলভিন কৌতুকপূর্ণ চোখে ওর দিকে চেয়ে জবাব দিল, 'দু'একবার ওদিকে গেছি আমি…রাস্তাটা মোটামুটি ভালই।'

নিচু গলায় সে প্রশ্ন করল, 'ফ্রীডমের লোকটাকে তুমিই মেরেছ?'

'হ্যাঁ।'

'চেহারার বর্ণনায় তোমার সাথে মিল আছে…কিন্তু ঘটনার বর্ণনায় নেই।'

'বারের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল সে। সামান্য ঘুরেই গুলি করে লোকটা। আমার প্রথম গুলি লাগে ওর বাম কাঁধের পিছনে, ঠিক মেরুদণ্ডে। দরজাটাকে বাঁ-দিকে রেখে দাঁড়িয়ে ছিল, চালাকি করে সামনের দিকে কোমরে গোঁজা পিস্তল বের করে বাম কনুইয়ের তলা দিয়ে গুলি চালিয়েছিল সে। অন্যায়ভাবে ওকে মারিনি।'

'সে বিষয়ে কখনোই সন্দেহ করিনি আমি।'

কাউন্টারের লোকটা মাপজোখ করে প্যাকেট গুছাচ্ছে।

'ওরা তোমাকে ধরার জন্যে একজন কঠিন চেহারার অপরিচিত লোককে মার্শাল নিযুক্ত করেছে।'

'নিকোলাস?'

চমকে মুখ তুলে চাইল কেলভিন। 'তুমি চেনো ওকে?'

'একটু আড়াআড়ি আছে আমাদের,' বন্ধ দরজাটা দেখিয়ে সে বলল, 'ওকে নিয়ে।'

কিছুটা সময় নীরবে কাটল। লিস্ট দেখে প্রত্যেকটা জিনিসই খুঁজে বের করতে হচ্ছে। বেচারী নতুন মানুষ। মালিক ওর উপর ভার দিয়ে ব্যবসার কাজে প্রেসকট গেছে। দেরি হচ্ছে, কিন্তু জেকবের তাড়া নেই।

'ওদিকে তিনজন লোক রয়েছে, ওদের চেনো তুমি?'

একটু ইতস্তত করে কেলভিন বলল, 'না,…ঠিক চিনি বলা যায় না। ওদের একজন সম্ভবত নিকোলাস।'

'আরও অনেক লোকই আসবে এখন। আমি ওদের মরমন কুয়ার কাছে নিয়ে গেছিলাম।'

'শুনেছি।' মেঝেতে পা নামিয়ে বসল কেলভিন। 'তাতে ওদের কোন কাজ

হবে না। বহু বছর আগে থেকেই জায়গাটা চিনি আমি–লাভ হয়নি।' হঠাৎ কী মনে করে সে আবার বলল, 'তুমিও কি সেই হারানো ওয়্যাগনগুলো খুঁজছ নাকি?'

'আমি? আরে না! আমিও সোনার আশাতেই ঘুরছি, তবে আমার সোনা চার-খুরের ওপর দাঁড়ানো একটা স্ট্যালিয়ন।'

'দু'একবার আমার চোখেও পড়েছে। সত্যি, ওটা একটা ঘোড়ার মত ঘোড়াই বটে!'

'কেউ জানতে চাইলে বোলো প্রেসকটে স্কাল ভ্যালিতে গেছি আমি। ওখানেই বাস করব।'

'সুন্দর জায়গা।'

অযাচিতভাবে প্রশ্ন করা বা কিছু বলা, কেলভিনের স্বভাববিরুদ্ধ। জেকব যে প্রেসকটে যাচ্ছে না তা আগেই আন্দাজ করেছে সে। নিজে যেমন নেশার ঘোরে সোনার পিছনে ঘুরছে, জেকবও তেমনি ঘুরছে ঘোড়ার পিছনে। ঘোড়া ছেড়ে নড়বে না ও।

ডালিয়া এঘরে ফিরে এল। ওর দিকে চেয়ে নতুন করে বিস্মিত হলো কেলভিন একেই বলে রূপ! ঈশ্বর, তুমি মহান!

ছালায় বাঁধা রসদ তুলে নিয়ে বাইরে মালবাহী গাধাগুলোর কাছে গেল জেকব। ট্রেইলের দিকে চেয়ে দেখল। পাহাড়ের ভিতর ঢোকার আগে পর্যন্ত স্বস্তি পাবে না সে। গাধার পিঠে বোঝাটা তুলে দিয়ে শক্ত করে বাঁধা শেষ হতেই ডালিয়া এগিয়ে গেল ওর দিকে। দোকানির সাথে কেলভিনও দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

ডালিয়াকে ধরে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিয়ে ওদের দিকে ফিরে জেকব বলল, 'স্কাল ভ্যালির ওদিকে যদি কখনও তোমরা যাও, আমার ওখানে অবশ্যই এসো–তোমাদের দু'জনেরই দাওয়াত রইল।'

'কেউ আসছে,' বলল কেলভিন। 'দু'জন ঘোড়সওয়ার।'

আতঙ্কিত কণ্ঠে ডালিয়া ডাকল, 'জে!'

'ভয় পেয়ো না।'

মাত্র দু'শো গজ দূরে, পশ্চিম দিক থেকে আসছে ওরা–অর্থাৎ ওরা ফ্রীডমের লোক হওয়াও বিচিত্র নয়। স্বাভাবিক নিশ্চিন্ত গতিতে এগিয়ে আসছে। একটু একটু করে কিছুটা সরে গেল জেকব। এখন গোলাগুলি হলে ডালিয়ার গায়ে লাগার ভয় নেই।

কাছে এসে ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিয়েছে ওরা। জিনের পেটি বাঁধার ছলে নিজের ঘোড়ার আড়ালে রইল জেকব।

এসে পড়ল ওরা। ওদের দু'জনকেই চিনতে পারল জেকব। তার পিছনে ধাওয়া করে যে দলটা গেছিল, এরা সেই দলে ছিল।

নিজের ঘোড়াটা কাঠের রেলের সাথে বেঁধে রেখে দরজার দিকে চাইল বার্ট। দেখল কেলভিন সন্ত্রস্তভাবে ওখান থেকে সরে দাঁড়াল। ওর হাবভাবে ঝট করে মাথা ঘোরাল বার্ট। তার ভয় হচ্ছে হয়তো এই সেই লোক।

এই অবস্থায় ওর পক্ষে দ্রুত পিস্তল বের করে গুলি করা অসম্ভব। লক্ষ্য ভেদ

করতে হলে তাকে সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়িয়ে তাক করে গুলি ছুঁড়তে হবে। ক্লাইভ যে ঠিক কোথায় আছে দেখতে পাচ্ছে না—সে তার পিছনেই বাম দিকে কোথাও আছে।

জেকব যেখানে রয়েছে সেখান থেকে ওদের দু'জনকেই গুলির আওতায় পাচ্ছে। এসব কিছুই না বুঝে নিশ্চিন্ত মনে জিনের পেটি খুলছে ক্লাইভ। বার্ট ঘামছে।

'বেশ, বেশ, এই তো চাই,' কর্কশ চড়া সুরে বলে উঠল বার্ট। 'ঘোড়ার খুব যত্ন নেয় এমন লোকই আমার পছন্দ!'

'তোমার আবার হঠাৎ কী হলো?' ক্লাইভের গলায় বিস্ময় প্রকাশ পেল। 'আমি...'

এতক্ষণে জেকবের দিকে চোখ পড়ল তার। একেবারে স্থির হয়ে জমে গেল ক্লাইভ। জেকব যে তৈরি হয়ে আছে তা বুঝিয়ে দেবার অপেক্ষা রাখে না।

'তোমরা দু'জন পিস্তলের বেল্ট দু'টো খুলে ফেলো,' শান্ত গলায় বলল জেকব। 'শান্তিপূর্ণ জায়গা এটা, একে গোলাগুলি করে রক্তাক্ত করা ঠিক হবে না। লক্ষ্মী ছেলের মত বেল্ট খুলে মাটিতে ফেলে দাও।'

'এই যে শোনো,' শুরু করল ক্লাইভ। 'আমি...'

'চুপ করো,' ধমকে উঠল বার্ট। 'যা বলা হচ্ছে, তাই করো!'

দু'টো বেল্টই মাটিতে পড়ল। দোকানির উদ্দেশে জেকব বলল, 'বেল্ট দু'টো তুলে নিয়ে যাও। কিন্তু সাবধান, আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ো না যেন—ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে।'

ওগুলো উঠিয়ে নেওয়া হতেই ঘোড়ার পিছন থেকে বেরিয়ে এল জেকব। 'এবার একটু পিছনে সরে স্থির হয়ে বসো। বাইবেলের বাণী শোনাব আমি।'

সংক্ষেপে ডেরিকের মৃত্যুর ঘটনাটা সে বর্ণনা করল। শেষে বলল, 'আমার পিছনে ধাওয়া করার জন্যে তোমাদের দোষ দিই না আমি, কারণ তোমরা আসল ঘটনা জানতে না। এখন জানলে।'

'অর্থাৎ কী বলতে চাও তুমি?' উদ্ধত কণ্ঠে প্রশ্ন করল বার্ট।

'মানে এর পরেও যদি আমার পিছনে তোমাদের ঘুরতে দেখি তা হলে ধরে নেব বন্ধুত্ব চাও না তোমরা।'

'তোমার পিছনে ঘুরছি কে বলল?' প্রতিবাদ করল ক্লাইভ। 'আমরা দু'জন তো সোনা খুঁজতে এসেছি!'

'সেটা তোমাদের খুশি। কিন্তু মনে রেখো আবার আমার পিছনে লাগতে আসলে চিরদিনের মত তোমাদের জন্যে ছয়ফুট মাটির ব্যবস্থা আমি করব।'

ইচ্ছা করেই ওদের দিকে পিছন ফিরে ঘুরে নিজের ঘোড়ার কাছে এগিয়ে গেল জেকব। ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখল দু'জনের কেউ বিন্দুমাত্র নড়েনি।

চুপ করে থাকার মানুষ নয় বার্ট। সে বলে উঠল, 'তুমি খুব বাহাদুর, কিন্তু তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। এটা জেনো, মরণ লেখা আছে তোমার কপালে। লী যদি তোমাকে শেষ করতে নাও পারে, নিকোলাস অবশ্যই করবে।'

ওর কথায় কান না দিয়ে ডালিয়াকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল জেকব। একবার পিছন ফিরে দেখল ওরা দু'জন তখনও বসেই আছে। ওরা ছোট পাহাড়টার ধারে পৌঁছানো পর্যন্তও দু'জনে বসেই রইল। যখন উঠল তখনও কোন তাড়াহুড়া দেখা গেল না ওদের মধ্যে।

'তোমাকে দেখে ভয়ে একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছিল ওরা,' বলল ডালিয়া।

'না, লিয়া, ভীতু নয় ওরা। ওদের বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিলাম আমি। ওই অবস্থায় নেহাত হাঁদারাম ছাড়া ঝুঁকি নেবে না কেউ। ভিন্ন পরিস্থিতিতে ওরা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করবে না।'

'তুমি যা করলে তাতে শক্ত নার্ভের দরকার।'

'নিজের কর্তব্য মানুষকে করতেই হয়।'

সোজা পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল ওরা। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে কেউ অনুসরণ করছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখছে জেকব। কিন্তু ধুলো ওড়ার কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

'ওই লোকটার সাথে তোমার আগের পরিচয় ছিল?'

'কেলভিনের সাথে? হ্যাঁ, ওকে আমি অনেকদিন থেকেই চিনি। হারানো ওয়্যাগনের সোনা যদি কেউ খুঁজে বের করতে পারে, তবে কেলভিনই পারবে।'

'নিশ্চিত হয়ে অমন কথা কেউ বলতে পারে না। যে কেউ পেতে পারে। অপ্রত্যাশিত ভাবেও বেরিয়ে পড়তে পারে ওগুলো।' বলেই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ডালিয়া। উদ্বিগ্ন স্বরে সে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় ওরা আমাদের কথা বিশ্বাস করবে? মনে করবে আমরা সত্যিই দেশ ছেড়ে চলে গেছি?'

'আশা করতে দোষ নেই। এবারে ওই ঘোড়াগুলোর জন্যে ফিরে যাব আমরা।'

'ঘোড়া নিয়ে প্রেসকটে ফিরলে তো ওরা ওখানেও হামলা করতে পারে?'

'হয়তো। কিন্তু আমার ধারণা ওরা প্রেসকটে আমাদের খোঁজ না পেয়ে হতাশ হয়ে ওই এলাকায় আর খুঁজতে যাবে না।'

ছায়া দেখে সময় অনুমান করার চেষ্টা করল জেকব। সামনে একটা জায়গা আছে যেখানে মুহূর্তের জন্যও বালু স্থির থাকে না। রাতের অন্ধকারে সে ওখানে পৌঁছতে চায়। তা হলে ওদের পায়ের ছাপ তো থাকবেই না, উপরন্তু অন্ধকারে ওরা যে কোনদিকে গেছে সেটা কারও দেখে ফেলারও ভয় থাকবে না।

নয়

ওয়ার গড স্প্রিং-এর পাহাড়ের উপর থেকে দক্ষিণ দিকের ভাঙা-ভাঙা জমিটা খুঁটিয়ে দেখছে জেকব। দূরবীন চোখে লাগিয়ে ঈষৎ অন্ধকার ছায়া থেকে শুরু করে ওই এলাকার প্রতিটি ফাটল আর খাঁজ এক এক করে খুঁটিয়ে দেখল সে। টিউবা সিটির দোকান থেকে বেরিয়ে আজ দশ দিনের মধ্যেও কারও অনুসরণ

করার আভাস পায়নি—স্ট্যালিয়নটারও দেখা মেলেনি।

বোঝাই যাচ্ছে কোন কারণে ভয় পেয়েই এই পথে যাতায়াত বন্ধ করেছে—কিন্তু ওরা গেল কোথায়? এদিককার তাজা ঘাস আর চমৎকার টলটলে পানির লোভে ঘোড়াগুলো প্রায়ই এদিকে আসে, জানে জেকব। আজ সকাল থেকেই সে অনুভব করছে কেউ যেন তাদের উপর নজর রাখছে। কেবলই মনে হচ্ছে তার অজান্তে যেন কিছু একটা ঘটছে। কিন্তু তার এই দুশ্চিন্তার যুক্তি-সঙ্গত কোন কারণ নেই—ধোঁয়া বা ধুলো কিছুই তার চোখে পড়েনি। শেষ পর্যন্ত যন্ত্রটা চোখ থেকে নামিয়ে ক্যাম্পে ফিরে গেল সে।

এতক্ষণ যেদিকটা খুঁটিয়ে দেখে ফিরল, সেদিকেই বহুদূরে বাতাসে সামান্য একটু ধুলো উড়ে হালকা হয়ে প্রায় মিলিয়ে গেল। তারপরে আবার ধুলো উড়তে উড়তে সেটা সরলরেখায় উত্তর-পুবে এগিয়ে চলল।

আগুনের পাশ থেকে ডালিয়া মুখ তুলে চাইল। বলল, 'জে, আমি অনেক ভেবে দেখলাম, অরগ্যান রকে ঘোড়াগুলোকে আমরা শেষ দেখেছি, ওখানেই আমাদের ফিরে যাওয়া দরকার।'

'ওখানে কেন?'

'আমার মনে হয় ওই দলের লীডার দলটাকে পথ দেখিয়ে বিশেষ কোন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিল—আমাদের দেখেই সে তখনকার মত ঘুরে অন্যদিকে চলে গেছিল। ওখানে গেলে এখনও হয়তো কিছু পায়ের চিহ্ন পাওয়া যাবে।'

চিন্তাধারাটা যুক্তিসঙ্গত, স্বীকার করল জেকব। জন্তুরা একটু একরোখা স্বভাবের হয়। একবার কোথাও যাবার ইচ্ছা জাগলে যতক্ষণ না যেতে পারবে ততক্ষণ চেষ্টা চালিয়েই যাবে।

মুশকিল হলো এখান থেকে অরগ্যান রকে পৌঁছানোর একটা সোজা পথ হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু জেকবের তা জানা নেই। চেনা পথে যেতে হলে আবার দক্ষিণ দিকে ফিরে যেতে হবে, অবাঞ্ছিত লোকের সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে। আর উত্তরে পড়বে স্যান জুয়ান নদী—নদীটা বেশ চওড়া আর গভীর।

কফির স্বাদটা খুব ভাল হয়েছে। কাপটাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ডালিয়ার দিকে চেয়ে সে বলল, 'আচ্ছা, তুমি তো এই জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নও। হাঁপ ধরে যায়নি তোমার?'

হাসল ডালিয়া। 'জে, তোমাকে তো বলেছি, যার জন্যে পিছুটান থাকতে পারে এমন কোন মূল্যবান জিনিস আমি পিছনে ফেলে আসিনি। অবশ্য আমার পরিচিত লোকজন কে কী করছে মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছা করে—কিন্তু ফিরে যাবার ইচ্ছা আমার মোটেও জাগে না। বাবা বলতেন আমার মধ্যে নাকি আমাদের ভাইকিঙ পূর্ব পুরুষদের প্রভাবটা বেশি।'

একটু এদিক ওদিক চেয়ে আবার জেকবের দিকে চোখ ফেরাল ডালিয়া। 'বিশ্বাস করো, জীবনে এত আনন্দের স্বাদ আর আমি পাইনি। প্রকৃত সুখের সন্ধান আমি পেয়েছি এখানে।'

পরদিন সকালে সূর্য ওঠার আগেই একটা আবছা ইন্ডিয়ান ট্রেইল ধরে রেইনবো প্ল্যাট্যুর উপর দিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা। পরে একটা ফিরতি ট্রেইল

ধরে পিউটে ক্রীকে নেমে এল।

জেকবকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে। তার উদ্বেগের কারণ ডালিয়ার কাছে প্রকাশ করল সে। 'এই এলাকাটা আমার পরিচিত নয়, লিয়া। এদিক দিয়ে পিউটে মেসায় পৌঁছবার কোন পথ খুঁজে না পেলে আবার আমাদের দক্ষিণে ফিরে যেতে হবে।'

পশ্চিমে মহিলাযাত্রী সাথে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চলাফেরা করা মানেই নিজের বিপদ ডেকে আনা। ডালিয়ার ভালর জন্যই জেকবের ভাবনা হচ্ছে, সে একা থাকলে এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাবার দরকার পড়ত না। এখানকার যতরকম কষ্ট, ক্ষুধা, পিপাসা, গরম আর ঠাণ্ডা সবকিছুর সাথেই তার পরিচয় আছে--সহ্য করার ক্ষমতাও আছে। কিন্তু ডালিয়া সাথে আছে বলেই তার এই উদ্বেগ।

নাকিয়া ওয়াশের তলায় কিছুটা বৃষ্টির পানি জমেছে। ঘোড়াগুলোকে ওখানে একটু বিশ্রাম দিল জেকব। পথ চলা এখনই বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে, হয়তো সামনে আরও কষ্টসাধ্য হবে। এখানে দক্ষিণ দিক থেকে যে ট্রেইলটা এসেছে সেটা বেশ স্পষ্ট। সম্ভবত এটাই মেসার উপর ইন্ডিয়ান বসতির ধ্বংসাবশেষে গিয়ে শেষ হয়েছে।

পানির কাছ থেকে ঘোড়াগুলোকে বেশ কিছুদূর হাঁটিয়ে নিয়ে ঝোপ থেকে একটা পাতাসহ ডাল ভেঙে আবার ফিরে গেল জেকব। ডাল দিয়ে ঘষে পায়ের চিহ্নগুলো মুছে তার উপর বালু ছিটিয়ে দিল সে।

প্রায় মিলিয়ে যাওয়া আবছা একটা ট্রেইল ধরে ক্লিফের ধারে পৌঁছল ওরা। উত্তর দিকে তার বিরাট দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নো ম্যানস মেসা।

প্রায় তিরিশ মাইল পথ চলেছে ওরা আজ। নীচে কোথাও বিশ্রাম নেওয়ার একটা জায়গা খুঁজে নিতে হবে। ওদের পশুগুলো বেশ ক্লান্ত, ওগুলোরও বিশ্রাম দরকার।

উপর থেকে ওদের ঠিক উল্টো দিকে ক্যানিয়নটার ওপাশে হাজার ফুট নীচে নাকিয়া মেসার ছাদ দেখা যাচ্ছে। ক্যানিয়নটার অন্যধারে গাছের আড়ালে একটা গর্ত মত খাঁজ দেখা যাচ্ছে। জায়গাটা ওদের জন্য বেশ নিরাপদ একটা আশ্রয় হতে পারে।

ওই খাঁজটার কাছে যখন ওরা পৌঁছল তখন আকাশে তারা উঠেছে। নিজে নেমে তাড়াতাড়ি ডালিয়াকে ঘোড়া থেকে নামাতে গেল জেকব। হাত বাড়াতেই ক্লান্তিতে ডালিয়া প্রায় এলিয়ে পড়ল ওর উপর।

'ইশ, একী দশা হয়েছে তোমার!' দু'হাতে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল জেকব। 'আমি সত্যিই দুঃখিত,' মৃদু স্বরে বলল সে।

'কি সুখে, কি দুঃখে…বিয়ের সময়ে শপথ করেছি আমরা, মনে নেই? জেনেশুনেই স্বেচ্ছায় বরণ করেছি তোমাকে। একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি–বিশ্রাম পেলেই আবার ঠিক হয়ে যাব।'

ডালিয়াকে ঘোড়াগুলোর কাছে রেখে অন্ধকারে অদৃশ্য হলো জেকব। প্রায় সাথে সাথে ফিরে এসে পশুগুলোকে একটু উপরে পাহাড়ের একটা বড় পাথরের আড়ালে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে এল সে।

পাথরের আড়ালে এক কোণে আগুন জেলে রাতের খাবার তৈরি করে ফেলল ডালিয়া। এতক্ষণ জেকব তার রাইফেল আর পিস্তলে তেল লাগিয়ে পরিষ্কার করে নিল।

খেতে বসে ডালিয়া জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি মনে হয় ওরা আমাদের খুঁজে পাবে, জে?'

'হ্যাঁ, পাবে।'

'তা হলে আমরা কী করব?'

'সেটা ওরা এলে পরে দেখা যাবে।'

ভোরের দিকে হঠাৎ জেকবের ঘুম ভেঙে গেল। জেগেই ঘোড়াগুলোর দিকে চাইল সে। মাথা উঁচিয়ে কান খাড়া করে রয়েছে ওরা।

প্রথমে কিছুই শুনতে পায়নি সে; পরে দূর থেকে একটা শব্দ ওর কানে এল। শব্দটা আস্তে আস্তে বাড়ছে। ঘোড়ার শব্দ। অনেকগুলো ঘোড়া ছুটে চলেছে।

সকালে ডালিয়ার নাস্তা তৈরি করার ফাঁকে ক্যানিয়নের ভিতর গিয়ে তিরিশ-চল্লিশটা বুনো ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখতে পেল সে। ওদের মধ্যে সোনালী স্ট্যালিয়নটার ছাপও রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে ঘোড়াগুলো উত্তর দিকে নাকিয়া ক্যানিয়নের দিকেই গেছে।

তাড়াতাড়ি নাস্তা সেরে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

খেপে রয়েছে লী। অগ্নি দৃষ্টিতে ইউজিনের দিকে চেয়ে সে বলল, 'মাঝে-মাঝে আমার মনে হয় শক্ত-পাল্লাকে খুঁজে পাওয়ার কোন দরকারই অনুভব করো না তোমরা।'

গত কয়েক সপ্তাহ জেকবের খোঁজে অনবরত ঘোড়া ছুটিয়ে ইউজিনের মেজাজও বেশ চড়ে আছে। এই কয়েকটা সপ্তাহে ওর মনের বয়স অনেক বেড়ে গেছে। এতদিন সে সবসময়ে লী-র মন বুঝে চলার চেষ্টা করেছে–কিন্তু আর নয়। সারা জীবন অন্যের মত অনুযায়ী চলতে গেলে মানুষের আর নিজস্ব সত্তা বলে কিছু থাকে না।

'একটা মানুষকে হত্যা করার উদ্দেশে আমি তোমাদের সাথে আসিনি। লোকটা যদি ডেরিককে কাপুরুষের মত পিছন থেকে গুলি করে মেরে থাকে তবে অবশ্যই তার ফাঁসি হওয়া উচিত। কিন্তু ওর পক্ষটাও আমাদের শুনতে হবে। সে দাবি করেছে অন্যায়ভাবে হত্যা করেনি সে।'

'দাবি?' লী-র গলার স্বরটা কুৎসিত শোনাল। 'তুমি কি আশা করো? সাধু পুরুষের মত সে তার দোষ স্বীকার করবে?'

'অনেক সুযোগই সে পেয়েছে, ইচ্ছা করলেই আমাদের কয়েকজনকে সে হত্যা করতে পারত–কিন্তু করেনি। সত্যি কথা বলতে কি আমরা সবাই জানি ডেরিক একটু ঝগড়াটে প্রকৃতির ছিল, গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে পছন্দ করত সে। পিস্তলে ভাল হাত ছিল বলে নিজেকে বাহাদুর মনে করত।'

'ডেরিক সম্পর্কে আমাকে জ্ঞান দিতে চাও তুমি? তোমার আমি...'

'শান্ত হও, লী,' দৃঢ়সংযত কণ্ঠে বাধা দিল কীথ। 'ইউজিনের ওপর তোমার

এভাবে চড়াও হবার কোন মানে হয় না।'

কীথের দিকে ঘুরে চাইল লী। 'তুমিও?'

ইউজিনের ওজন কম, ওকে পাত্তা না দিয়ে অবজ্ঞা করা চলে, কিন্তু কীথের বেলায় তা করা যায় না। কঠিন লোক কীথ। সে কারও সাতে-পাঁচে থাকে না বটে, কিন্তু ওর সাথে কেউ লাগতে গেলে একেবারে বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে। সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে লী নিজের রাগ সামলে নিল। কীথও আর কোন কথা বলল না, আশ্বস্ত হয়ে কনুই-এ ভর দিয়ে কাত হয়ে বসল।

রাতের নিস্তব্ধতায় কেবল আগুনে কাঠ পোড়া পটপট শব্দ উঠছে মাঝে মাঝে। আগুনে আরও কয়েকটা কাঠ চাপিয়ে দিয়ে নীরবতা ভাঙল ইউজিন। 'ন্যায় বিচার হোক, সেটা চাই বলেই আমি এসেছি। ডেরিকের মৃত্যুর ঘটনাগুলো জানি না আমরা–ওই লোকটাকেও চিনি না। দূর থেকে দেখে আমি যেটুকু বুঝেছি তাতে ওকে কাপুরুষ কখনোই মনে হয়নি। ডেরিক শেষ পর্যন্ত যার সাথে পারবে না এমন লোকের সাথেই লাগতে গেছিল।

'অসম্ভব, ডেরিকের মত পিস্তল চালাতে আর কেউ জানে না।' প্রতিবাদ করল লী, কিন্তু তার গলায় এখন আর আগের ঝাঁঝ নেই।

'কেউ না? জিম কোর্টরাইট, ক্লে অ্যালিসন কিংবা ওয়াইল্ড বিল, কেউ পারে না?'

'ওই লোকটা আর ওয়াইল্ড বিল এক হলো?'

'তুমি কী করে জানো? ট্রেইল থেকে যেটুকু বোঝা যায় তাতে তো শক্ত পাল্লাকে শক্ত-পাল্লা বলেই মনে হয়।'

এ কথার কোন জবাব দিল না লী। বাতাসে কয়েকটা শুকনো পাতা উড়ল। আগুনের শিখাটাও একপাশে একটু হেলে গেল।

'কাজ শেষ করার আগেই টের পাওয়া যাবে কত ধানে কত চাল,' মন্তব্য করল কীথ।

'ভেবে দেখো, লী। নতুন একটা শহর গড়তে যাচ্ছি আমরা। স্বীকার করি এটা সবেমাত্র শুরু–কিন্তু একদিন এখানেই সুন্দর একটা শহর গড়ে উঠবে। আমাদেরই ছেলেমেয়েরা হেসে-খেলে বড় হবে ওই শহরে। একজন নির্দোষ মানুষকে যদি শুরুতেই আমরা বিনা বিচারে হত্যা করি, তার ফল কি শুভ হবে?'

এবারেও জবাব দিল না লী। তার চোয়ালের পেশী দু'টো শক্ত হয়ে উঠল। মুখের ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে ওকে হাজারো যুক্তি দেখিয়েও কিছু কাজ হবে না–মনস্থির করে ফেলেছে ও

জ্বালানি কাঠ জোগাড় করে আনতে উঠল ইউজিন। কোমরে দু'হাত রেখে কয়েক মিনিট ভাবুকের মত আকাশের তারার দিকে চেয়ে রইল সে। যাক, মনে যা ছিল বলে ফেলে ভিতরটা অন্তত হালকা হয়েছে। বন্ধু সে নিশ্চয়ই চায়, কিন্তু মোসাহেবি করে বন্ধুত্ব রক্ষা করার মানে হয় না। তার মানে হচ্ছেঃ মুখ বুজে চুপ করে না থেকে যাদের চিন্তা করার ক্ষমতা আছে তারা সবাই মুখ ফুটে তা জানালে সম্ভবত পৃথিবীর অর্ধেক ঝামেলাই মিটে যেত।

সেলুনে যে ঠিক কী ঘটেছিল তা একমাত্র ডেরিক আর শক্ত-পাল্লা ছাড়া কেউ

জানে না। সবাই একমত যে শক্ত-পাল্লার পিস্তল নিয়ে ফেরত না এসে উপায় ছিল না। গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে যায়নি লোকটা—ডেরিকই ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিয়ে নিজের বিপদ ডেকে এনেছে।

কাঠ নিয়ে ফিরে আসার সময়ে দূর থেকে লী-র কথার শেষটুকু ওর কানে গেল। '...খুব বাড় বেড়েছে।'

'মিছেই ওর সাথে খোঁচাখুঁচি করছ তুমি,' ওর পক্ষ সমর্থন করে বলছিল কীথ, 'ছেলেটা নির্ভেজাল। ওর সাথে লাগতে গেলে শেষ পর্যন্ত তোমার ওকে গুলি করতে হবে, নয়তো গুলি খেতে হবে।'

'ওই পুঁচকে ছোঁড়া?'

লী-র স্বরে তাচ্ছিল্যের স্পষ্ট ইঙ্গিতে রাগে আর লজ্জায় লাল হয়ে উঠল ইউজিনের মুখ। ওখানেই থেমে দাঁড়াল সে।

কীথ জবাব দিল, 'গাধার মত কথা বোলো না, লী। নতুন নতুন ছেলেটা নরম ছিল—যে যা বলেছে তাই শুনতে হয়েছে ওকে। কিন্তু এখন কঠিন মাটিতে সংগ্রাম করে টিকে থেকে কঠিন হয়েছে। এখন থেকে নিজের মত মতই চলবে সে।'

রাতে ওরা যখন ঘুমাবার আয়োজন করছে, নিকোলাস তখন তার দুই সঙ্গীকে ক্যাম্প করার নির্দেশ দিল। ওদের মধ্যে দূরত্ব মাত্র এগারো মাইল। তিনটে ক্যাম্প মিলে একটা সমবাহু ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে। তৃতীয় ক্যাম্পে আছে ডালিয়া আর জেকব।

গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠল জেকব। পুবের আকাশটা ভোরের আলোয় ফিকে হয়ে এসেছে। একটা ঘোড়া নাক দিয়ে হাঁচি দেওয়ার মত শব্দ করে ওকে জাগিয়ে দিয়েছে। ঘুম থেকে জেগে উঠেই অভ্যাস মত নিজের বাকস্কিনটার দিকে চাইল জেকব। ঘোড়াটা মাথা উঁচু করে নাক ফুলিয়ে খাঁজের মুখটার দিকে চেয়ে আছে।

'রও! রও!' ঘোড়াটাকে শান্ত থাকার নির্দেশ দিয়ে রাইফেল হাতে ঝোপের আড়াল দিয়ে বাইরের দিকে এগোল জেকব। ধারের কাছে পৌঁছে উঁকি দিল—কিছুই চোখে পড়ল না। কোন শব্দও নেই।

শার্ট আর বুট ছাড়াই বেরিয়ে এসেছে ও। একবার ভাবল ফিরে ওগুলো পরে আসা দরকার। বুট ছাড়া এই অঞ্চলে চলাফেরা করা অসম্ভব। ফিরতে যাবে, ঠিক এই সময়ে আবছা ভাবে কিছু একটা নড়ে উঠতে দেখল সে। একটা ছায়া—একটু আগেও ছায়াটা ওখানে ছিল না—নাকি মনের ভুল?

বুট শার্ট আর কার্তুজের বেল্টসহ ডালিয়া উপস্থিত হলো ওর পাশে। ডালিয়াকে ছায়াটা দেখিয়ে ওদিকে নজর রাখতে বলে বুট আর বেল্ট পরে নিল জেকব। তৈরি হয়ে উঠে দাঁড়াতেই রাইফেলটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিল ডালিয়া। অস্বাভাবিক কিছুই দেখতে পায়নি সে।

কিন্তু কিছু একটা নিশ্চয়ই ছিল ওখানে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার ওদিকেই-আরও দূরে চাইল সে। হ্যাঁ, কিছু বা কেউ ছিল ওখানটায়। রাইফেলটা গাছের সাথে ঠেকা দিয়ে রেখে শান্তভাবে শার্টটা পরে নিল সে।

তা হলে লোকগুলো এসে পৌঁছে গেছে! ওদের মোকাবিলা করার ঝামেলা এড়ানোর অনেক চেষ্টা করেছে, ফল হয়নি। এবার থেকে আর এড়িয়ে চলবে না সে। মানা করার পরেও যখন এসেছে, ওদের যোগ্য মাশুল দিতে হবে।

হঠাৎ একটা লোককে ওদিক থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। কমবয়সী, অপরিচিত।

লোকটার মাথায় একটা ভাঁজ-পড়া ময়লা টুপি। কোমরের দু'পাশে দু'টো পিস্তল ঝুলছে। পিস্তলের মাথা ফিতে দিয়ে উরুর সাথে বাঁধা। হাতে একটা হেনরি রাইফেল। মাটির উপর কিছু একটা খুঁজছে লোকটা! কোন পরিচিত চিহ্ন।

নীরবে দাঁড়িয়ে ওরা লোকটাকে লক্ষ করছে। ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসছে। পিছন ফিরে একবার মেসাটা ভাল করে দেখে নিয়ে ঘুরে উপর দিকে মুখ তুলে ওরা যেখানে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে সোজা সেদিকেই চাইল। আড়ালে রয়েছে বলে জেকবদের দেখতে পাচ্ছে না লোকটা।

'পায়ের ছাপ দেখে এগোচ্ছে না ও,' বলল জেকব। 'উদ্দেশ্য যা-ই হোক, লোকটা আমাদের খুঁজছে না।'

'তা হলে কী খুঁজছে লোকটা?'

হারানো ওয়্যাগন খুঁজছে না তো?

এতদূরে এখানে কী করে থাকবে ওগুলো? বেশ কয়েক মাইল দক্ষিণে ছিল ওয়্যাগন–এখান থেকে অন্তত দশ পনেরো মাইল দূরে। কিন্তু তাই কী? লোকটার আচরণে মনে হয় সে যেন কিছু একটা জানে। এদিক ওদিক খেয়াল খুশিমত খোঁজাখুঁজি না করে বিশেষ কোন চিহ্ন বা জায়গা খুঁজছে সে।

পিছন থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ জেকবের কানে এল। পাথরে মোটা কাপড় ঘষা খাওয়ার আওয়াজ। চট করে বাম হাঁটু গেড়ে বসে ঘুরেই রাইফেল তুলে গুলি করার জন্য প্রস্তুত হলো সে।

মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে কেলভিন।

রাইফেলটা স্থিরভাবে তাক করে বসে রইল জেকব। কেলভিন এগিয়ে এল। ওর পিছনে ওর ঘোড়া–তার পিছনে মালটানা একটা ঘোড়া। বিশ গজ দূরে থাকতেই ওকে থামাল জেকব।

'পথ হারিয়েছ নাকি?'

'তুমি তো আমাকে চেনো,' হাসল কেলভিন। 'ওয়্যাগনগুলোই হারিয়েছে–এখনও খুঁজছি।'

'যেসব লোক পিছন থেকে আমার দিকে আসে, তাদের পছন্দ করি না আমি।'

'সেজন্যে তোমাকে দোষ দিই না; তবে আমাকে পছন্দ না করেও তোমার উপায় নেই। কারণ দেখা যাচ্ছে একমাত্র আমিই তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী।'

'অর্থাৎ?'

'তুমি যাওয়ার পরে লী এসে হাজির। সাথে কীথ আর ইউজিন। বার্ট আর ক্লাইভ তোমাদের স্কাল ভ্যালিতে যাওয়ার কথা জানালে লী হেসেই উড়িয়ে দিল কথাটা।'

'যাক, চেষ্টা যা করার করেছি আমি।'

'নিকোলাসও তার দু'জন সঙ্গীসহ এই এলাকাতেই আছে।'

হাতের ইশারায় নীচের দিকে দেখাল জেকব। 'ওই লোকটা কি ওর সঙ্গীদের একজন?'

এগিয়ে এসে ঝুঁকে উঁকি দিল কেলভিন। ওর মুখ দিয়ে আপনাআপনি একটা গালি বেরিয়ে এল। 'ওই লোকটাই মন্টি, জেকব। হারানো ওয়্যাগনের দলটার সাথে ছিল ও।'

কোনদিকেই খেয়াল না করে জেকবদের মেসার পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মন্টি। 'দেখো!' ফিসফিস করে বলল কেলভিন। 'জায়গাটা চিনতে পেরেছে ও! নিশ্চয়ই কোন চিহ্ন খুঁজে পেয়েছে!'

সেই রকমই মনে হচ্ছে। মন্টির মধ্যে উত্তেজিত ভাব সুস্পষ্ট। বেশ জলদি হাঁটতে শুরু করছে সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠল। সেই সাথে চিৎকার শোনা গেল, 'মন্টি! মাথা খারাপ হয়েছে তোমার? ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?'

স্বাস্থ্যবান আর বেঁটে একটা অপরিচিত লোককে ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখল জেকব। লোকটা নিকোলাসের অপর সঙ্গী।

'জলদি ফিরে যাও তুমি। না বলে না কয়ে হাওয়া হয়ে গেছ দেখে বস্ খেপে আগুন হয়ে আছে। এদিকে কী খুঁজছ?'

'ছাপ খুঁজে বেড়াচ্ছি–মনে হলো যেন কী একটা দেখলাম।'

'ঠিক আছে, চলো এবার ফেরা যাক।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হলো লোকটা। সে পিছন ফিরতেই ওর পিঠ লক্ষ্য করে রাইফেল তুলল মন্টি। তারপর আবার কী ভেবে সেটা নামিয়ে নিল।

জেকবের দিকে আড়চোখে চেয়ে কেলভিন বলল, 'লোকটা জানতেও পারল না মৃত্যুর কত কাছ থেকে আবার ফিরে এল সে।'

'হয়তো এই লোকটাই ওর সঙ্গীদের খুন করেছিল,' বলল জেকব।

'মন্টি?' বিস্ময় প্রকাশ পেল কেলভিনের স্বরে। কিন্তু তার মনেও একই সন্দেহ উঁকি দিয়েছে তাই যতটা অবাক হওয়া উচিত ছিল, ততটা অবাক হলো না সে। 'কিন্তু তখন তো ও একেবারেই ছেলেমানুষ ছিল।'

'মানুষ খুন করতে কত বড় হওয়া লাগে?' শুকনো গলায় প্রশ্ন করল জেকব। তারপর জবাবের অপেক্ষা না করেই আবার বলল, 'আমি ইন্ডিয়ানদের সাথে প্রথম যুদ্ধ করেছি বারো বৎসর বয়সে।'

ঘোড়ায় চড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কেলভিন। ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

'এর মানেটা বুঝতে পারছ তো? এতদিন সবাই মনে করেছিল জায়গাটা আরও অনেক দক্ষিণে, তাই সবাই ওই দিকেই খোঁজ করেছে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি মন্টি কিছু একটা চিহ্ন দেখে জায়গাটা চিনেছে।'

প্রথমে ডালিয়ার দিকে পরে জেকবের দিকে চাইল কেলভিন। তারপরে

উল্লসিত ভাবে সে বলল, 'বুঝতে পারছ তো, আমি শিগ্‌গিরই বড়লোক হতে যাচ্ছি!'

'আমার মনে হয় সোনা খোঁজার কাজে অনেক প্রতিযোগী পাবে তুমি। ওখানে যারা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, সোনার গন্ধ পেলে তারাও সবাই ছুটে আসবে সোনা খুঁজতে। এখন তুমি ওই সোনা পেলে তাতে তোমার বিপদের সম্ভাবনাই বেশি।'

জেকবের কথা কেলভিনের কানে যায়নি। উত্তেজিত ভাবে সে বলে চলল, 'ভেবে দেখো, মন্টিকে ওরা বেঁধে রেখে সোনা লুকাতে গিয়েছিল। তার মানে যেখানে ওকে বেঁধে রাখা হয়েছিল তারই আশেপাশের কোন চিহ্ন দেখে সে জায়গাটা চিনেছে।' আনন্দে বিভোর হয়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে চারপাশে চোখ বুলাল সে। 'আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি এখান থেকে এক মাইলের মধ্যেই কোথাও ওই সোনা লুকানো আছে। এমনকী আরও কাছেও থাকতে পারে!'

লোক দুটো যেদিকে অদৃশ্য হয়েছে সেদিকে চেয়ে রয়েছে জেকব। এই মন্টিই যদি সেই ছেলেটা হয়ে থাকে তবে সে গুপ্তধনের এত কাছে থেকে কিছুতেই এই এলাকা ছেড়ে কোথাও যেতে চাইবে না। তা হলে কী করবে সে? সঙ্গীদের চোখে ধুলো দিয়ে কেটে পড়বে—নাকি আগের মত আবার খুন করবে? যাই ঘটুক, ফাঁসির দড়িটা তার গলাতেই এঁটে বসছে।

এখান থেকে কোনদিকে যাবার পথ নেই। উত্তর দিকে স্যান জুয়ান ক্যানিয়ন। দুই ধারেই বিশাল উঁচু ক্লিফ। ওর ভিতর দিয়ে নির্দিষ্ট একটা দিকেই কেবল যাওয়া সম্ভব। পুব দিকে ভৌতিক স্মৃতিসৌধের উপত্যকা, মাইলের পর মাইল খোলা জায়গা। ওদিকে গেলে সহজেই ধরা পড়ে যাবে ওরা।

একটা মেয়ে সঙ্গে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া এখন ওর আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। কপাল ভাল থাকলে ওরা হয়তো অন্যদিকে চলে যাবে।

'আমি নীচে যাচ্ছি,' বলে রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়াল কেলভিন। কিন্তু সে পা বাড়াবার আগেই জেকব বলে উঠল, 'তোমাকে এখন আর ঝুঁকি নিয়ে যেতে দিতে পারি না আমি—তোমাকে আমাদের সাথেই থাকতে হবে।'

কেলভিনের দিকে তাক করে ধরা রয়েছে জেকবের পিস্তল।

দশ

ঘটনার আকস্মিকতায় বড় বড় চোখে স্বামীর দিকে চাইল ডালিয়া। রাইফেল হাতে কেলভিন জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনাগুলো বিচার করে আপাতত নিষ্ক্রিয় থাকার সিদ্ধান্ত নিল। তাকে রাইফেল ঘুরিয়ে ট্রিগার খুঁজে নিয়ে কক্ করে তবে গুলি করতে হবে—না, কোন উপায় নেই তার।

'কী ব্যাপার, জেকব? আমি তো ভেবেছিলাম আমরা পরস্পরের বন্ধু।'

'এখনও তাই। আমার চেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু তোমার কোনদিন ছিল না। কিন্তু সোনার নেশায় তোমার বিচার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তুমি এখন নীচে গেলে

তোমাকে দেখতে পাবে ওরা–কিংবা তোমার চিহ্ন দেখতে পেয়ে বুঝে নেবে এদিকে তুমি কী খুঁজছ। সবাই মিলে এসে হাজির হবে এখানে। আর ওরা এখানে এসে পৌঁছলে আমাদের ধরা পড়তে হবে। এই কারণেই তোমাকে বাধা দিচ্ছি।'

আশ্বস্ত হলো কেলভিন। 'তাই বলো। তুমি তো ভয়ই পাইয়ে দিয়েছিলে আমাকে, ভেবেছিলাম ওই সোনা তুমি নিজেই নেয়ার তালে আছ।' অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে জেকবের দিকে চাইল সে। 'সেরকম কোন মতলব নেই তো তোমার?'

'ঘোড়া ছাড়া এদিকে আর কিছুর ওপর আমার নজর নেই।'

'ঠিক আছ, পিস্তল নামিয়ে নিতে পারো তুমি। ওরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমি তোমাদের সাথেই থাকব। তবে ওদের কেউ যদি ওই সোনা খুঁজে পায় তখন কিন্তু আমি আর কোন চুক্তি মানব না।'

'সেটা মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই, কেলভিন। ওই সোনার খোঁজে তুমি এতকাল যেভাবে হন্যে হয়ে ঘুরেছ, কষ্ট করেছ, তাতে আমার মতে তোমার একটা দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ঘটনা সেরকম দাঁড়ালে তুমি গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সোনা উদ্ধার করতে ছুটে যেয়ো···আমরাও নিজের পথ দেখব।'

একটা গাছের ছায়ায় বসে কেলভিন নিজের রাইফেলটা দ্রুত ব্যবহারের জন্য কোলের বাঁ পাশেই মাটিতে শুইয়ে না রেখে গাছের সাথে ঠেকা দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল। অভিজ্ঞ লোক, কোন ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ রাখার পাত্র সে নয়।

জেকবের দিকে চেয়ে সে বলল, 'তুমি ঝট করে নিমেষে কোথা থেকে যে পিস্তলটা বের করলে–ব্যাপারটা যাদুমন্ত্রের মত লাগল আমার কাছে। আমার ধারণাই ছিল না কোল্ট ব্যবহারে তোমার হাত এত চালু।'

কাঁধ ঝাঁকাল জেকব। 'প্র্যাকটিস করলে সবই হয়–কারও জলদি হয়, কারও দেরিতে।'

'পিস্তলের বাঁটে কয়টা আঁচড় পড়েছে?'

'যাদের বড়াই করা অভ্যাস, তারাই ওসব করে। নেহাত দায়ে না পড়লে পিস্তল ব্যবহার করি না আমি।'

চুপচাপ বসে আছে ডালিয়া। ভয়ে ওর মুখ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। এখনকার মত মেঘ কেটে গেলেও ওদের চারপাশ থেকে বিপদ ঘনিয়ে আসছে বুঝে ফেলেছে সে। কেলভিনের তরফ থেকেও বিপদ আসতে পারে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে জোর করে আটকে রাখাটাকে কী সহজ ভাবে নিতে পারবে সে?

প্রতীক্ষার মধ্যে দিয়ে কয়েকটা ঘণ্টা কেটে গেল। গাছের তলায় মৌমাছির গুঞ্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই···প্রায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। মাঝে মধ্যে ঘোড়াগুলো মাটিতে পা ঠুকছে বা লেজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো।

'ওরা কি এতক্ষণে চলে গেছে, জে?' প্রশ্ন করল ডালিয়া।

'না।'

'অন্তত মন্টি যে এত সোনা ফেলে কিছুতেই বেশিদূর নড়বে না, একথা নিশ্চিত হয়ে বলা যায়,' বলল কেলভিন।

মাথার পিছনে দুই হাত রেখে গা এলিয়ে ক্লিফগুলোর দিকে চেয়ে ভাবছে

কেলভিন। সোনা কোথায় লুকানো থাকতে পারে? ওদের হাতে সময় ছিল কম, তা ছাড়া এমন জায়গাতেই ওরা গিয়েছিল সেখানে ঘোড়ার পিঠে করে সোনা বয়ে নেওয়া যায়। এই এলাকায় মাত্র কয়েকটা নির্দিষ্ট দিক ছাড়া আর যাবারই উপায় নেই।

লোকগুলো যে কতক্ষণ সময় নিয়েছিল সেটা জানতে পারলেও···মন্টি নিশ্চয়ই সেটা জানে। উল্টো দিকের ক্লিফে যায়নি ওরা–পিউটে মেসা অনেক উঁচু। না, ওটার পিছনে নাকিয়া মেসাতেই কোথাও সোনা লুকিয়ে রাখার সম্ভাবনাই বেশি।

জেকবেরও তাই ধারণা, কিন্তু সে এখন ভাবছে কেলভিনের কথা। ওই এলাকাতেই কোথাও রয়েছে নিকোলাস, মন্টি আর অন্য লোকটা। লী আর তার সঙ্গের লোকজনও এখানেই কোথাও আছে। ক্লাইভ আর বার্টও যোগ দিয়েছে ওদের সাথে।

খিদে পেলেও কেউ আর খাবার কথা তুলছে না। আগুন জ্বালালেই ধোঁয়া উঠবে–ওদের অবস্থান জেনে ফেলবে সবাই।

কেলভিন চিনতে পেরেছে মন্টিকে। জেকবের মনে হঠাৎ খটকা লাগল। কথাটা মনে মনে উল্টেপাল্টে বিচার করে দেখল সে–সমাধান মিলছে না। মন্টিকে কী করে চিনল কেলভিন?

তা হলে হয় সে ওই সতেরো জনের একজন, নয়তো সান্তা ফে শহরে মন্টিকে দেখেছে সে।

জেকবের চারদিকেই ছড়িয়ে রয়েছে শত্রু। তার নিজের ক্যাম্পেরই একজন হয়তো তার শত্রু। যা-ই ঘটুক কেলভিনের কথা ভোলা চলবে না তার।

'জে···?'

মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখল ডালিয়া সামনের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। রুদ্ধশ্বাসে সে চেয়ে দেখল সেই সোনালী স্ট্যালিয়নটা তার দলবল নিয়ে হাজির হয়েছে নীচের খোলা জায়গায়

'চেয়ে দেখো, কেলভিন।' সব ভুলে গেল জেকব। 'পৃথিবীর সব সোনা তুমি নিতে পারো–কিন্তু ওই ঘোড়াটা আমার চাই।'

ওদের থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে পাহাড়ের একটা সরু ফাটলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেল ঘোড়াগুলো।

'সত্যি, লর্ড হ্যারির কসম,' সম্ভ্রমের সাথে বলল কেলভিন। 'তোমার দোষ নেই, লোভ লাগার মতই ঘোড়া বটে!'

হঠাৎ উত্তেজিতভাবে সে আবার বলে উঠল, 'ওই পিছনের মেয়ারটা···যেটার কাঁধে ক্ষত দাগ আর পায়ে তিনটে সাদা মোজার মত ছোপ···ওটার কিন্তু বয়স হয়েছে।'

'তাতে কী? ওই দলে অনেক নবীন ঘোড়াও আছে।'

ঘোড়া ছাড়া আর কিছু ভাববার অবসর ওর এখন নেই। কিন্তু হঠাৎ ঘোড়ার প্রতি কেলভিনের এত আগ্রহ দেখে অবাক হয়ে ডালিয়া খেয়াল করল, ওই সোনালী স্ট্যালিয়নটার দিকে মোটেও নজর নেই ওর–পিছনের বুড়ো মেয়ারটাকেই

বিস্ফারিত চোখে দেখছে সে।

'আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব আমরা,' বলল জেকব। 'ওরা বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে পরে ওদের পিছু নেব। আমি দেখতে চাই ওরা কোথায় যায়।'

উত্তর দিকে যেতে যেতে ইন্ডিয়ানদের দেখে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল লী। একজন ইন্ডিয়ান মহিলা আর দু'জন বাচ্চা সহ মোট পাঁচজন। পুরুষ দু'জনের মধ্যে কমবয়সী লোকটা লী-র পরিচিত। সব সময়েই তার গায়ে পড়ে সস্তায় কাজ করে দেওয়ার আগ্রহ দেখে লী ওর নাম দিয়েছে 'সস্তা জনি'। একসময়ে লী-র র‍্যাঞ্চে কাজও করেছে সে। খুব খাটতে পারে লোকটা। লী নিজেও যেমন খাটে, তার প্রত্যেকটা কাজের মানুষকেও সে তেমনি হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়ে নেয়। তবে এটা সত্যি, এই এলাকায় তারচেয়ে ভাল খাবার কেউ কর্মচারীদের খাওয়ায় না।

'জনি, ট্র্যাকিং-এর একটা কাজ করবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল লী।

নাভাজো লোকটা মাথা নাড়ল। 'টিউবা সিটিতে যাচ্ছি আমি।' একে একে সবাইকে দেখে নিয়ে আবার লী-র দিকে চাইল জনি। 'তোমরা শিকারে বেরিয়েছ?'

'আমাদেরই একজন মানুষকে খুঁজছি—ওর সাথে হয়তো একটা মেয়ে থাকতে পারে।'

একটু ইতস্তত করল জনি। সেধে কাউকে কিছু জানানো ইন্ডিয়ানদের ধর্ম নয়। কিন্তু এই লোকটা তার পরিচিত। বন্ধুও বলা যায়, কারণ সাদা চামড়ার লোকেরা সাধারণত ইন্ডিয়ানদের কাজে নিতে চায় না।

'ওই দিকে,' পিউটে মেসার দিকে হাত দিয়ে ইশারা করল সে। 'চিহ্ন দেখেছি আমি—পাঁচ-ছয়টা পশু, দু'জন আরোহী।'

ওরা চলে যেতেই উল্লসিত হয়ে লী বলল, 'শুনলে তো? এবার ওদের বাগে পেয়েছি আমরা।'

ইউজিন মুখ খুলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত চেপে গেল। এখন কিছু বলে লাভ নেই। যা বলার তা সে সময় মতই বলবে।

সে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল, শক্ত-পাল্লাকে কি লী তার স্ত্রীর সামনেই ফাঁসিতে ঝুলাবে? কিন্তু ওকে যে ওরা ধরতে পারবে তাই বা কী করে বলা যায়? এখন পর্যন্ত সামনাসামনি হয়নি লোকটা, কিন্তু এবার যে সে রুখে দাঁড়াবে না তাই বা কে জানে? সবারই ধৈর্যের একটা সীমা আছে।

দূরে ক্লিফের ধারে খানিকটা ধুলো উড়তে দেখা গেল। খুব বেশি নয়, তবে একসাথে বেশ কয়েকটা ঘোড়া চলছে বোঝা যায়।

'ইউজিন, তোমার কী মনে হয়?' প্রশ্ন করল লী।

'বুনো ঘোড়া।' ওদের মধ্যে ইউজিনেরই দৃষ্টি সবার চেয়ে তীক্ষ্ণ। 'বেশ বড় একটা দল, ধীর গতিতে চলেছে।'

আরও আধঘণ্টা পরে লী দেখতে পেল ওদের।

কয়েকটা গাধা সহ তিনজন মানুষ ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাচ্ছে। ঘোড়াগুলো যেদিকে গেছে সেদিকেই এগোচ্ছে ওরা।

'এবারে ওদের হাতের মুঠোয় পেয়েছি!' উত্তেজনা চাপার বৃথা চেষ্টা করে বলে উঠল লী। 'ওই যে, দেখা যাচ্ছে ওদের!'

'ওখানে তো তিনজন মানুষ দেখা যাচ্ছে,' প্রতিবাদ করল ইউজিন। 'ওদের দু'জন যদি শক্ত-পাল্লা আর তার স্ত্রী হয় তবে তৃতীয় লোকটা কে?'

ওর কথার জবাব দিল না কেউ। ওদের পিছু নিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে লী বারবার আউড়ে চলল, 'এইবার! খোদার কসম, এইবার!'

টিউবা সিটিতে জেকবের সতর্ক বাণীর কথা বার্টের মনে পড়ে গেল। একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল ওর শিরদাঁড়া বেয়ে। ভিতরটা কেমন যেন কুঁকড়ে আসছে। লোকটা স্পষ্ট কথায় জানিয়ে দিয়েছে এর পরে ওরা পিছু নিলে ওদের ভাগ্যে কী ঘটবে।

ওকেই আগে শেষ করতে হবে আমার, মনে মনে ভাবল বার্ট। আমাকে মারার আগেই মারব শালাকে–গুষ্টি মারি ফাঁসির–আগেই গুলি করব আমি।

পিছিয়ে ক্লাইভের পাশে চলে এল বার্ট। 'লোকটা মিথ্যা ভয় দেখায়নি, ক্লাইভ! যা বলেছে তাই করবে সে।'

'তা হলে এখন উপায়?'

'ওকেই আগে শেষ করতে হবে–প্রথম সুযোগেই গুলি করব আমরা।'

'কিন্তু লী যে ওকে ফাঁসি দিতে চায়; দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সে।'

'বাদ দাও ওর কথা।'

'তা হলে কী করতে চাও?'

'লোকটার সাথে মেয়েলোক আছে। মেয়েটাকে বাঁচাতে কথা বলতে চাইবে ও। লী-কে কথা বলতে পাঠিয়ে পিছন থেকে গুলি করব আমরা।'

'নিকোলাস এখানে থাকলে ভাল হত,' বলল ক্লাইভ।

বার্টের মনে ছিল না ওর কথা, কিন্তু এখন আর সে কথা ভেবে লাভ নেই। 'ও যখন নেই, যা করার আমাদেরই করতে হবে।'

পাঁচজনে ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা। সারারাত ঠাণ্ডার পর সকালের রোদটা বেশ লাগছে। কীথের পিছনে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ইউজিন। তার উপর বিপদ ঘনিয়ে আসছে জানে সে। প্রতিবাদ জানানো সোজা–কিন্তু কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে হয়তো সশস্ত্র মানুষের মোকাবিলা করতে হতে পারে। লী-র যা মনোভাব তাতে তাদের মধ্যে গোলাগুলি হওয়াও বিচিত্র নয়। কথাটা ভেবে মনে মনে একটু দমে গেল ইউজিন। এখানেই তার দুর্বলতা। মিথ্যা আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায় সে। কিন্তু কাউকে মারতে গেলে দ্বিধা বোধ করবে ও, অথচ অন্ধবিশ্বাসী লোকের কোন বিকারই হবে না।

কীথের দিকে চাইল ইউজিন। ও কোন পক্ষ নেবে? শক্তসমর্থ লোক কীথ। একমাত্র ওর পক্ষেই লী-কে ঠেকানো সম্ভব। অতীতে এটা প্রমাণও হয়েছে।

ক্লিফের উপর দিয়ে চলেছে ওরা। ঘোড়ার পায়ে লেগে একটা নুড়ি পাথরে বাড়ি খেতে খেতে গড়িয়ে নীচে পড়ল। আর একধাপ নেমে ক্যানিয়নের তলায় পৌঁছে গেল সবাই। বুটের গোড়ালিতে বাঁধা স্পারের খোঁচা খেয়েই লী-র ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠে উপত্যকার ভিতর দিয়ে উত্তর দিকে ছুটল। ওদের বামে উঁচু

দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে আছে পিউটে মেসা। ডান দিকে নাকিয়া ক্যানিয়ন, আরও সামনে নো ম্যান্‌স্ মেসা তার কালো অশুভ চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রাশ টেনে ঘোড়ার গতি কমাল জেকব। বুনো ঘোড়াগুলোর কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা। ওগুলোকে ভয় পাইয়ে ক্লিফের ওপাশে স্যান জুয়ানে চলে যেতে বাধ্য করতে চায় না জেকব। সে দেখতে চায় নিজের ইচ্ছায় ওরা কোথায় যায়।

ভিতরে ভিতরে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছে ও। অস্বস্তিটা ঘোড়ার ব্যাপারে নয়। পিছন ফিরে চাইল সে।

কিছুই না...

'তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?' ডালিয়ার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল জেকব।

মাথা নাড়ল সে। কিন্তু ওর শান্ত সুন্দর মুখে একটা দুশ্চিন্তার ছায়া দেখতে পেল জেকব। ডানদিকে একটা ছোট শাখা ক্যানিয়ন দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় চিন্তা না করে হঠাৎ মোড় নিয়ে ওর ভিতরে ঢুকে পড়ল সে। অন্যেরা অনুসরণ করল তাকে।

'এদিকে এলে কেন?' প্রশ্ন করল কেলভিন। 'ঘোড়াগুলোর কী হবে?'

'বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।'

নীরবেই ওর দিকে একবার চাইল ডালিয়া। কিন্তু কেলভিন আপত্তি তুলল, 'ঘোড়াগুলোর পিছনে এতদূর এসে এখন ছেড়ে দেয়ার কী মানে থাকতে পারে?'

ওর কথায় কোন জবাব না দিয়ে ওখান থেকে বেরুবার আর একটা পথ খুঁজল জেকব। তাড়াহুড়ায় অন্ধ-গলির মত ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ছে কিনা দেখে নিচ্ছে সে। ক্যানিয়নটা মনে হয় নো ম্যান্‌স্ মেসা পর্যন্ত চলে গেছে। ধীরে এগিয়ে চলছে ওরা। দক্ষিণের দেয়ালটা যেখানে বেশ নিচু হয়ে এসেছে সেখানে ওদের অপেক্ষা করতে বলে আবার ক্যানিয়নের মুখের দিকে ফিরে গেল জেকব।

মোড় নিয়ে ওরা এই পথে চলে আসার কিছু চিহ্ন রয়েছে সেখানে। বেশি কিছু করা সম্ভব হলো না, তবু, যতদূর পারা যায় চিহ্নগুলো মিটিয়ে দিয়ে ফিরে এসে দেয়ালের খাড়া ধার বেয়ে সাবধানে পথ দেখিয়ে উপরে উঠতে শুরু করল জেকব।

'এতে তোমার খুব একটা সুবিধা হবে না,' মন্তব্য করল কেলভিন। 'এখন ওই ক্যানিয়নটা রইল তোমার পিছনে, আর একটা ক্যানিয়ন রয়েছে দক্ষিণে। এখান থেকে বেরুবার একটাই পথ আমার জানা আছে—সেটা হচ্ছে নাকিয়ার ভিতর দিয়ে।'

থামল ওরা। আশেপাশে সামান্য কিছু মরু অঞ্চলের গাছপালা আর দু'একটা ভাঙা পাথরের চাঁই আছে, কিন্তু ভাল কোন আশ্রয় নেই। জমিটা ধীরে ধীরে নো ম্যানস মেসার দিকে উঠে গিয়ে বিরাট উঁচু ক্লিফের ধারে হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে।

এই সময়ে ওদের দেখতে পেল সে। একই সাথে ওই দলের সামনের লোকটাও মুখ তুলে উপর দিকে চেয়ে জেকবদের দেখল। চমকে উঠে সে এত জোরে লাগাম টেনে ধরল যে ঘোড়াটা পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠে

থেমে দাঁড়াল। দলের সবাই চেয়ে দেখল ওদের।

ডালিয়া…ওকে বাঁচাতেই হবে।

'তোমরা এখানেই দাঁড়াও,' দৃঢ় কণ্ঠে নির্দেশ দিল সে। যাবার আগে ডালিয়াকে বলল, 'গোলাগুলি শুরু হলে আর এখানে থেকো না। কোথায় দেখা হবে তা আগেই বলেছি–সোজা ওখানেই চলে যেয়ো তুমি।' তারপর বাকস্কিনটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে ওদের সাথে বোঝাপড়া করতে আবার নীচে নামতে শুরু করল জেকব।

এগারো

উজ্জ্বল ঝলমলে দিন। বিপক্ষদলের সবক'টা লোককে অবাক করে দিয়ে একাই ওদের মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে জেকব। ধীর সমান গতিতে এগোচ্ছে বাকস্কিন। জিনের উপর নির্বিকারভাবে বসে আছে শক্ত-পাল্লা। বাম হাতে লাগাম–ডান হাতটা অলসভাবে ঊরুর উপর রাখা।

বাকস্কিনটাও টের পেয়েছে। ঘোড়াটার চলার ভঙ্গিতে তা বুঝতে পারছে জেকব।

ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে চায়নি সে। ওরাই বাধ্য করছে তাকে। ডালিয়ার গায়ে গুলি লাগার ঝুঁকি সে নিতে চায় না বলেই একা এগিয়ে যাচ্ছে। কেলভিনের সাহায্য নেওয়ার কথা একবারও ভাবেনি, কারণ এটা তার ব্যক্তিগত সমস্যা, এর সমাধানও তার নিজেরই করতে হবে।

দূরত্ব কমে আসছে। নির্দিষ্ট কারও দিকে তাকিয়ে নেই জেকব। একসাথে ওদের সবার চাল-চলন লক্ষ করছে তার চোখ। দু'জন পিছিয়ে পড়ে একপাশে সরে গেল। এর মানে কী? ওরা কি গোলাগুলি শুরু হওয়ার আগেই ঝামেলায় থাকতে চায় না বলে সরে গেল? নাকি পাশ থেকে আক্রমণ চালাবে?

ওদের মধ্যে দূরত্ব একশো গজ থাকতেই রাশ টেনে থেমে দাঁড়াল শক্ত-পাল্লা। ওর বাঁয়ে রয়েছে পাথরের ধার থেকে গজানো কয়েকটা গাঁটওয়ালা সীডার গাছ–ফুট তিনেক উঁচু। ডানদিকে আরও সামনে পাথরে একটা সরু ফাটল। একটু সামনে এগিয়ে ওটা প্রায় খাড়াভাবে নীচের ক্যানিয়ন পর্যন্ত নেমে গেছে।

রেকাব থেকে পা দু'টো আলগা করে নিয়ে সোজা হয়ে বসল। তৈরি হয়ে আবার আগে বাড়ল সে। আর মাত্র পঞ্চাশ গজ থাকতে সে চিৎকার করে নির্দেশ দিল, 'ব্যস! ওইখানেই দাঁড়াও!'

ওরা থেমে দাঁড়াতেই সে আবার বলল, 'তোমাদের আগেই বলেছি কাপুরুষের মত পিঠে গুলি করে আমি মারিনি ওকে। বরং তোমাদের ঝগড়াটে বন্ধুই মরদের মত না লড়ে পেটের কাছে গুঁজে রাখা পিস্তল বের করে বেআইনী ভাবে দেহের আড়াল থেকে চোরাগুলি চালিয়ে আমাকে মারতে চেষ্টা করেছিল। বেশি চালাকি করতে গিয়েই পাশে আর পিঠে গুলি খেয়েছে সে।'

'কক্ষনো না! মিথ্যে কথা!' চেঁচিয়ে উঠল লী। 'তুমি খুন করেছ ওকে। এখন মিথ্যা অপবাদ দিয়ে নিজে বাঁচতে চাইছ। ফাঁসিতে ঝুলবে তুমি।' কয়েক কদম এগিয়ে আবার লাগাম টানল সে। 'পিস্তলে জনিকে হারানোর মুরোদ তোমার থাকতে পারে না!'

'প্রমাণ চাও, বন্ধু?' বিদ্রূপ করল জেকব। 'এসো তবে, কেবল তুমি আর আমি সামনাসামনি দাঁড়াই–তুমি নিজেই পরখ করে দেখো ডেরিককে হারাবার মত হাত আমার আছে কি না! সবাই দেখুক? আমি মিথ্যা বলছি কিনা তার প্রমাণ হোক?'

বেকায়দায় পড়ে গেল লী। সমর্থ লোক সে–লড়াই-এর ভয়ে পিছিয়ে না গিয়ে নিজের লড়াই সে নিজেই লড়ে। কিন্তু দলগত ভাবে একটা কাজ করতে এসে এরকম ফেঁসে যাবে ভাবতেই পারেনি সে। এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে তাকেই শক্ত-পাল্লার মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে!

চালাকি করে জেকব পুরো দায়িত্বটা সুন্দর ভাবে লী-র কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে। অন্য সবাই বাদ পড়ে গেছে। এখন যদি লী মারাও যায় তবু ন্যায়সঙ্গতভাবে তার দলের কারও আর জেকবকে কিছু বলার মুখ থাকবে না।

'তবে তাই হোক, হতচ্ছাড়া পাজি!' চিৎকার করে উঠল লী। 'বেঈমানীর উচিত শিক্ষাই আমি দেব। আমি…'

জেকবের পিছন থেকে কে যেন চিৎকার করে কিছু বলল। সাথেসাথেই ওর বুকের উপর কেউ একটা প্রচণ্ড ধাক্কা মারল। ঘোড়াটা পিছনের দু'পায়ের উপর লাফিয়ে উঠল। রেকাব থেকে পা ফসকে মাটিতে পড়ল সে।

বাঁচাব তাগিদে হামাগুড়ি দিয়ে, ছেঁচড়ে কোনমতে ফাটলটার দিকে এগিয়ে চলল জেকব। পায়ে চোট লেগেছে–বুকটা অবশ–টপটপ করে রক্ত পড়ছে পাথরের উপর।

ফাটলের ভিতর পৌঁছে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বের করে ক্ষতের গর্তটার উপর ঠেসে দিল। টাইট শার্টের চাপে রুমালটা জায়গাতেই রইল। আহত হয়েছে–কিন্তু জখমটা মারাত্মক কিনা এখনও বুঝতে পারছে না সে।

পিছন থেকে চিৎকার শোনার পরে কী হয়েছে তা নিমেষের মধ্যেই দেখে নিয়েছিল জেকব। যে লোক দু'টো পাশে সরে দাঁড়িয়েছিল তারাই গুলি করেছে ওকে। তাদের রাইফেল তুলতে দেখেছে সে…কিন্তু তখন আর সময় ছিল না–দেরি হয়ে গেছে।

কে যেন চিৎকার করে বলছিল, 'এটা কী করলে তুমি?'

'আমরা ওকে মারতে এসেছিলাম, তা না; লোকটা মরেছে–আর কী চাও?' জবাব দিয়েছিল বার্ট।

কঠিন চোখে বার্ট আর ক্লাইভের দিকে চেয়ে ইউজিন বলেছিল, 'ছিঃ, এমন নোংরা… '

কথাটা শেষ করার সুযোগ পায়নি সে। পাহাড়ের উপর থেকে একটা রাইফেল গর্জে উঠল। বুলেট গাঁথার শব্দের সাথে সাথে বার্টকে উল্টে পড়ে যেতে দেখল ইউজিন। দ্বিতীয় গুলিতে ক্লাইভের ঘোড়াটা ছাগলের বাচ্চার মত লাফাতে

আরম্ভ করল।

ছত্রভঙ্গ হয়ে পাথরের আড়ালে নিরাপদ আশ্রয় নিল ওরা।

রাইফেল নামিয়ে নিল ডালিয়া। ওর শান্ত নীল চোখ দু'টো নীচের দিকে গুলি করার মত আরও লক্ষ্য বস্তু খুঁজছে।

'ম্যাডাম,' বলল কেলভিন, 'আমার বান্ধবী হয়ে আমার সাথে পালিয়ে যাওয়াই এখন তোমার সবদিক থেকে ভাল।'

'যাও।' ঠাণ্ডা গলায় বলল ডালিয়া, 'দূর হও তুমি আমার সামনে থেকে।'

'ভাল চাও তো আমার কথা শোনো!' হাত বাড়িয়ে ডালিয়ার ঘোড়ার লাগাম ধরল কেলভিন।

হাতের রাইফেলটা প্রচণ্ড বেগে ঘুরাল ডালিয়া। ব্যারেলটা গিয়ে লাগল ওর মুখে। ঘোড়া থেকে উল্টে নীচে পড়ে গেল কেলভিন। সামলে নিয়ে উঠে বসল সে। ঠোঁট থেঁতলে রক্ত বেরুচ্ছে। ওর দিকে রাইফেল তাক করে ধরে আছে ডালিয়া। একেবারে স্থির হয়ে গেল কেলভিন। মুখে বলল, 'শোনো, তুমি ভুল বুঝছ। আমি...'

'সোজা নিজের ঘোড়ায় উঠে বিদেয় হও–আমার আশেপাশে আর তোমাকে দেখতে চাই না আমি।'

'ওই লোকগুলো তোমাকে খুন করে ফেলবে। তুমি বুঝতে পারছ না, ওদের একজনকে গুলি করেছ তুমি–কিছুতেই ওরা তোমাকে ছাড়বে না।'

'জেকব রয়েছে ওখানে,' বলল ডালিয়া। 'আমিও নীচে যাব। তুমি বসে বসে তামাশা দেখলে, ওদিকে তোমার বন্ধুকে ওরা গুলি করে মারল। তুমিও তো লোক দু'টোকে দেখেছিলে–জানতে ওরা কী করতে যাচ্ছে!'

ধীরে ধীরে নিজের ঠোঁটের উপর হাত বোলাল কেলভিন। তারপর বলল, 'জেকব মরে গেছে। তুমি নিজের চোখেই পড়তে দেখেছ ওকে। যে মরে গেছে তার জন্যে মিছে ভেবে কী লাভ? এদেশে মেয়েদের পক্ষে একা চলা অসম্ভব। বিশেষ করে তোমার মত মেয়ের একজন শক্ত পুরুষের দরকার। আমি...'

কথার মাঝেই ঘোড়াটাকে ওর পিছন দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে হঠাৎ তীর বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ঝোপ আর পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল ডালিয়া।

উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশটা একবার ভাল করে দেখে নিল সে। জেকবের বাকস্কিনটা ছুটে কয়েক গজ সামনে চলে গিয়েছিল–এখনও সেটা ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। জেকবের মৃতদেহ বা অন্য কারও দেহ ওর নজরে পড়ল না।

জেকবের মাল-বোঝাই গাধাগুলো ছড়িয়ে পড়ে ডালিয়ার পিছু পিছু ছুটল। এই পরিস্থিতিতে গাধাগুলোর জন্য আর মেয়েটা থাকবে না।

পশুগুলোকে একত্র করে নিজের কাজে লাগাতে পারবে কেলভিন। অনেক খাবার আছে ওদের পিঠে–ওই খাবারে একজন লোকের এই মরু এলাকায় অনেকদিন চলবে।

ঘোড়ার পিঠে উঠল কেলভিন। ঠোঁট দু'টো ব্যথায় টনটন করছে। হাতের তালুতে একটু পানি নিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেলল সে। বজ্জাত মেয়ে। এমন হঠাৎ করে মেরে বসল...মোটেও আশা করতে পারেনি সে। বড্ড দেমাগ! তার সাথে থাকতে

অস্বীকার করল–এখন বুঝবে মজা। পাহাড়ের মধ্যে একা একা কয়দিন টিকতে পারবে সে?

আবার নীচের দিকে চাইল কেলভিন। জেকবের ঘোড়াটা এখনও ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। ভাগ্য খারাপ ওর···লোকটা ভাল ছিল···কিন্তু বুলেট তো আর ভাল-খারাপ বোঝে না? বুলেটের কাছে সবাই সমান।

বোকা মেয়েটার মাথায় এটা ঢুকল না যে জেকবের দম ফুরিয়েছে। মরা মানুষ আর মাটির ঢেলায় কোন তফাৎ নেই।

কেলভিন তার ঘটনাবহুল জীবনে আজ পর্যন্ত অনেক মৃত্যুই দেখেছে। মৃতের পিছনে অযথা সময় নষ্ট করার পক্ষপাতী সে নয়। জেকবের সাথে ভাল খাতির ছিল তার–কিন্তু এটা ছিল তার ব্যক্তিগত লড়াই–ওর করার কিছুই ছিল না এতে। কথাগুলো খাঁটি সত্যি, কিন্তু তবু একেবারে হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে সে ওকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে ভাবতেই এখন লজ্জা করছে তার। কিন্তু লোকটা যখন মরেই গেছে তখন ওই মালগুলোর অপচয় করা বোকামি–তা ছাড়া জেকবের মালটাও খাসা!

জিভ দিয়ে একবার ঠোঁট চেটে পাহাড়ের গা ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে রওনা হলো সে।

ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিয়ে ইউজিন সতর্কভাবে মাথা তুলে চারদিকে তাকাল। যেখান থেকে গুলি এসেছে সেদিকটাতেও কেউ নড়ছে না–কোন শব্দ নেই।

কীথ উপস্থিত হলো ওর পাশে। 'বার্ট আহত হয়েছে···অবস্থা খারাপ ওর,' বলল কীথ।

ইউজিন ওর দিকে ঘুরে বসে মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে আঙুল চালিয়ে চুল ঠিক করল। ওর মুখটা গম্ভীর আর কঠিন দেখাচ্ছে। 'খুব অন্যায় কাজ আমরা করেছি, কীথ। লোকটা কাপুরুষ ছিল না।'

'না।'

পাথরের উপর পায়ের আওয়াজ তুলে লী এসে দাঁড়াল। ওকে আরও বয়স্ক দেখাচ্ছে। ওদের চোখের দিকে তাকাতে পারছে না সে। মাটির দিকে চেয়েই লী প্রশ্ন করল, 'তোমরা–তোমরা ঠিক আছ তো?'

'বার্ট গুলি খেয়েছে। ক্লাইভ ওর সাথে আছে।'

মুখ তুলে চাইল লী। 'আচ্ছা, ওদের মাথায় কি ভূত চেপেছিল? ওরা হঠাৎ গুলি করতে গেল কেন?'

'ক্লাইভ বলেছে শক্ত-পাল্লা নাকি ওদের টিউবা সিটিতে হুমকি দিয়েছিল আবার ওরা পিছু নিলে মারা পড়বে। তাই ভয় পেয়ে প্রথম সুযোগেই গুলি করেছে ওরা।'

'ওকে আমিই সামলাতে পারতাম। ডেরিকের নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার উপযুক্ত সাজা দিতে পারতাম।'

কঠিন দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল কীথ। 'মিথ্যা বড়াই কোরো না, লী। ওর

মুখোমুখি হলে মারা পড়তে তুমি। যাক, ও যে মিথ্যা বলছে কী করে জানো তুমি?'

'লোকটা যে সত্যি বলছে তারই বা প্রমাণ কী? ও কি মরে গেছে।'

'দেখিনি আমি। তবে এত কাছে থেকে ওদের মিস করার কথা নয়।'

'তেজ ছিল লোকটার। হয়তো আমারই ভুল–আমি ওকে কাপুরুষ মনে করেছিলাম।' সিধে হয়ে বসল লী। 'এখন মেয়েটাকে খুঁজে বের করে নিরাপদে এখান থেকে নিয়ে যাওয়াই আমাদের পক্ষে একমাত্র ভদ্রচিত কাজ হবে।'

ইউজিন আড়চোখে চাইল ওর দিকে। যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন ভদ্রতা দেখিয়ে আর কী লাভ? তবু লী ঠিকই বলেছে–মেয়েটাকে নিকোলাসের খপ্পরে একা ফেলে চলে যাওয়া ঠিক হবে না।

'নেকেড়ে নিকোলাসকে আর আমাদের দরকার নেই। এই কাজ থেকে ওকে সরিয়ে নিতে হবে।'

শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে লী একটু ঝাঁঝাল স্বরেই বলল, 'ঠিক আছে, ওকে বিদায় করা যাবে। যেভাবেই হোক আমাদের কাজ তো শেষই হয়ে গেছে।' নিজের ঘোড়ার দিকে রওনা হলো সে। 'মেয়েটাকে আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে–ওর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখন আমাদের কর্তব্য।'

'আমরা ওর খোঁজ পাওয়ার আগে সে-ই হয়তো আমাদের খুঁজে বের করতে চাইবে,' বলল কীথ।

'তার মানে?'

'ওই মেয়েটাই বার্টকে গুলি করেছে।'

'মাথায় দোষ আছে তোমার।'

'আমি নিজের চোখে দেখেছি। লাফিয়ে নীচে না পড়লে ক্লাইভেরও একই দশা হত।'

ঘোড়ায় চড়ে দলের অন্য ঘোড়াগুলোর কাছে এগিয়ে গেল ওরা। দু'বার পিছন ফিরে চেয়ে লী বলল, 'হতে পারে শক্ত-পাল্লা আহত হয়ে পড়ে আছে। আমাদের খুঁজে দেখা দরকার।'

'বাদ দাও,' ছোট্ট জবাব দিল কীথ। 'যদি বেঁচে থাকে গুলি চালাবে সে। আর এর থেকে ও জীবিত ফিরলে নিজেদের জন্যে দুর্গ তৈরি করতে হবে আমাদের।'

অন্য দু'জনের কাছে এগিয়ে গেল ওরা। মাটিতে শোয়ানো বার্টের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ক্লাইভ। 'হয়তো বাঁচবে বার্ট,' বলল ক্লাইভ। 'গুলিটা আর একটু ডানদিকে লাগলেই আর উপায় ছিল না।' নিজের রাইফেলটা হাতে তুলে নিল ক্লাইভ। 'তোমরা ওর দেখাশোনা করো, আমি শক্ত-পাল্লাকে খুঁজতে যাচ্ছি।'

'আর কত?' বলে উঠল ইউজিন। 'যথেষ্ট করেছি আমরা, এবার রেহাই দাও ওকে।'

ক্লাইভ ঘুরে চাইল ওর দিকে। 'তোমার যা খুশি তুমি করো গিয়ে, শক্ত-পাল্লা মরেছে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। নইলে আমার পিছনে লাগবে ও–সবাইকেই শেষ করবে।'

'কিন্তু আগে মেয়েটাকে নিরাপদে শহরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে,' প্রতিবাদ করল লী। 'ওকে এখানে ফেলে যাওয়া যায় না।'

রাগের সাথে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল ক্লাইভের মুখে। 'গোল্লায় যাও তুমি!' চিৎকার করে উঠল সে। 'তুমিই না শক্ত-পাল্লাকে ফাঁসি দেয়ার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছিলে? এখন আবার সুর পাল্টাচ্ছ কেন? ওই মেয়েটাই তো গুলি করে বার্টের এই অবস্থা করেছে—আমাকেও মারতে চেয়েছিল। আমার ঘোড়াটার অবস্থা কি হয়েছে দেখেছ?'

ঘোড়াটার কাঁধের কাছে চামড়ায় ঘষা খেয়ে গুলি বেরিয়ে গেছে। দাগটা লাল হয়ে রয়েছে। 'আমি বার্টের ঘোড়াটা নিয়ে যাচ্ছি, লী। তুমি যদি সত্যিকার পুরুষ হয়ে থাকো তবে তুমিও আমার সাথে এসো। আমরা যেটা শুরু করেছি তার শেষও আমাদেরই করতে হবে।'

'বাদ দাও, লী,' নিজের মত প্রকাশ করল ইউজিন।

দোটানায় পড়ল লী। কাজটা এখন আর ভাল মনে না হলেও সে-ই এর হোতা। যাবার জন্য পা বাড়িয়েও আবার ইতস্তত করল সে। ভুল করছে কিনা বুঝতে পারছে না লী। এতগুলো লোকের মোকাবিলা করতে শক্ত-পাল্লার একা এগিয়ে আসা—তারপরে লী-কে সম্মুখ যুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করা—এতেই মনে সন্দেহ জেগেছে তার—বুঝেছে লোকটা কাপুরুষ তো নয়ই, বরং অত্যন্ত সাহসী। সে যেমন বলেছে ঠিক সেভাবেই ডেরিকের মৃত্যু ঘটেছে কিনা তার প্রমাণ নেই। দেখা যাচ্ছে ওর সাথে একটা নারীর ভাগ্যও জড়িত ছিল। অন্যায়ভাবে যে উপায়ে লোকটাকে মারা হয়েছে তাতে ঘেন্না ধরে গেছে তার। কিন্তু ক্লাইভ যা বলেছে সেটাও সত্যি। এইসব কিছুর মূলেই ছিল লী। তবে ডেরিক ছিল তার বন্ধু—ওপারে দেখা হলে তখন বন্ধুকে সে কী জবাব দেবে?

'কিন্তু লোকটা মরে গেছে। কীভাবে পড়েছে তাতো তুমিও নিজের চোখেই দেখেছ। তুমি আর বার্ট—তোমরাই তো খুন করেছ ওকে।' লী-র স্বরে তিক্ততা প্রকাশ পেল।

'সেজন্যে আমাকে দোষ দিচ্ছ তুমি?' ক্লাইভের স্বর চড়া শোনাল। 'টউবা সিটিতে লোকটা আমাদের শাসিয়েছিল আবার ওর পিছু নিলে একেবারে শেষ করে ফেলবে। মিথ্যা-হুমকি দেয়নি সে—কথাটা বিশ্বাস করেছিলাম বলেই ওকে সেই সুযোগ না দিয়ে আগেই গুলি করেছি। এখনও আমার বিশ্বাস সে যদি বেঁচে থাকে তবে আমাদের ঘুম হারাম করে ছাড়বে।'

ইতস্তত করছে লী। কীথ পকেট থেকে একখণ্ড চিবানোর তামাক বের করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে একটা টুকরো দাঁতে কেটে নিল। 'কথাটা ক্লাইভ ঠিকই বলেছে, লী,' বলল কীথ। 'শুরু আমরাই করেছি, এখন পছন্দ হোক আর না হোক, শেষও আমাদেরই করতে হবে।'

'এর মধ্যে আর আমাকে টেনো না,' বলল ইউজিন। 'প্রথম থেকেই ব্যাপারটা ভাল ঠেকেনি আমার—এখন তো আর প্রশ্নই ওঠে না।'

'ঠিক আছে, তুমি বাদ,' ঝাঁঝের সাথে বলল লী। সবার ছোট হলেও ওর সিদ্ধান্তটাই দেখা যাচ্ছে ঠিক—এটা সহ্য করতে পারছে না ও। 'তুমি সবকিছু থেকেই বাদ—তুমি দুধ-ভাত।'

'হ্যাঁ, এখন তো তা বলবেই!' লাগাম টেনে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিল ইউজিন।

'আমি যাচ্ছি—মেয়েটাকে খুঁজে বের করে সে যদি আমার সাথে যেতে রাজি হয় তবে ওকে নিয়ে শহরে ফিরে যাব আমি। তোমাদের যা খুশি তাই করো।'

একবারও পিছনে না চেয়ে ইউজিন রওনা হলো। চিন্তাযুক্ত মুখে ওর দিকে চেয়ে রইল কীথ।

একসাথেই শক্ত-পাল্লার বাকস্কিনটার দিকে এগিয়ে গেল তিনজন। একটা গুলি জিনের মাথায় লেগে ছিটকে চলে গেছে। সন্দেহ নেই বুলেটের ধাক্কাতেই ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠেছিল। চামড়ার একটা জায়গায় রক্ত লেগে রয়েছে। মাটিতেও রক্ত দেখা যাচ্ছে।

মাটির উপর দিয়ে একটা রক্তের রেখা ফাটলটার দিকে এগিয়ে গেছে। ওখানে পৌঁছে নীচের দিকে চেয়ে অনিশ্চয়তা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। ফাটলটা একটু নীচে নেমে ঘুরে গেছে—একটা অন্ধকার গহ্বর দেখা যাচ্ছে। শক্ত-পাল্লাকে খুঁজে বের করতে হলে ওখানে নামতে হবে—কিন্তু কেউ ঝুঁকি নিয়ে আগে বেড়ে গুলি খেতে রাজি নয়। কিন্তু কে জানে? হয়তো বা সে আগেই ওদিক দিয়ে নীচের ক্যানিয়নে নেমে সরে পড়েছে?

ধারে গিয়ে উঁকি দিল কীথ। এখানে ক্যানিয়নটা বেশি গভীর নয়। নীচে বালু আর কিছু ছড়ানো পাথরের টুকরো দেখা যাচ্ছে।

ফিরে এসে কীথ বলল, 'শক্ত পাল্লা যদি ওই গর্তের ভিতর থেকে থাকে তবে আর আমাদের করার কিছু নেই। আমি নীচে নেমে দেখে আসি ব্যাপারটা কী।'

দু'জনের কেউই কোন জবাব দিল না দেখে সে আবার বলল, 'ক্লাইভ, তুমি এখানে বসে গর্তটা পাহারা দাও।' তারপর লী-র দিকে চেয়ে বলল, 'লী, তুমি কি আসবে আমার সাথে? নাকি তুমিও শক্ত-পাল্লার জন্যে আজীবন এখানে বসেই অপেক্ষা করতে চাও?'

'চলো!' ঘোঁৎ করে উঠল লী। দু'জনে পাহাড়ের নিচু জায়গাটায় পৌঁছে নী নামতে শুরু করল।

ফাটলের নীচে পৌঁছে পাথরের উপর রক্তের দাগ দেখতে পেল ওর। বালি উপর রক্তের দাগ নেই বটে—কিন্তু ওরা জানে চিহ্ন ঢাকার বিভিন্ন রকম কে শক্ত-পাল্লার জানা আছে। আশেপাশে নরম বালুর উপর ঘোড়ার খুরের অ চিহ্নই আছে—কিন্তু নতুন তৈরি বুটের কোন ছাপ ওদের নজরে পড়ল না।

দু'হাত কোমরে রেখে দাঁড়িয়ে কীথ জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কী মনে হয়, লী?'

'মরেনি। কেটে পড়েছে ব্যাটা,' মন্তব্য করল লী। কিন্তু ওর কথা শুনে খুব নিশ্চিত মনে হলো না তাকে। হয়তো এটাকে একটা সম্ভাবনা ধরে নিয়েই কথাটা বলেছে। নইলে এখানে রক্ত এল কীভাবে? 'এখন কোন্‌দিকে যেতে চাও তুমি?' প্রশ্ন করল সে।

কাঁধ ঝাঁকাল কীথ। 'ক্যানিয়ন ধরে যে-কোন দিকেই গিয়ে থাকতে পারে ও।' তারপর একটু ভেবে বলল, 'পানির দরকার হবে ওর। আমার মনে হয় নাকিয়া ক্যানিয়নের দিকেই যাবে লোকটা।'

ক্যানিয়ন ধরে রওনা হলো ওরা। যেতে যেতে কীথ বলল, 'কথাটা কিন্তু

ঠিকই বলেছে ক্লাইভ। আমরা যা শুরু করেছি–তা শেষ করার দায়িত্বও আমাদেরই ওপর।'

'লোকটা যা বলেছে তা সত্যি হলে সে নির্দোষ। কিন্তু প্রমাণ যখন নেই তখন ডেরিকের মৃত্যুর বদলা আমাকে নিতেই হবে।'

সতর্ক চোখ রেখে পথ চলছে ওরা। কিন্তু কোনরকম চিহ্নই ওদের নজরে পড়ল না।

ওদের সামনে যতদূর দেখা যায় ক্যানিয়নটা একেবারে নির্জন। কোন শব্দ নেই–কিছুই নড়ছে না।

বারো

ঘনিয়ে আসা আঁধারের বিরুদ্ধে সমস্ত মনোবল দিয়ে লড়ছে জেকব। চেষ্টা করে চোখ খুলল। তবু অন্ধকার; স্থির হয়ে শুয়ে রইল সে।

কোথায় আছে ও? সে কি মরে গেছে? জীবন্তই কবর দেওয়া হয়েছে ওকে।

ব্যথাটা রয়েছে। তাহলে বেঁচেই আছে। নড়ার চেষ্টা করতেই কোমরের কাছে নতুন একটা ব্যথা আবিষ্কার করল সে।

ধীরে ধীরে সব মনে পড়ছে তার। মাথাটা পরিষ্কার হয়ে আসছে। গুলিতে আহত হয়েছে সে। পড়ার পর খাঁজটার ভিতর ঢুকে পড়েছিল–তারপরেই জ্ঞান হারিয়েছে জেকব। কিন্তু তার আগে একটা কাজ করেছে–হ্যাঁ, রক্ত। এখানে ঢুকে পড়ার আগে রুমাল চিপে কিছুটা রক্ত নীচে ফেলেছে সে।

হাতড়ে দেখল পিস্তলটা এখনও তার সাথেই আছে। পড়ার আগে নিজের অজান্তেই পিস্তলের উপরকার চামড়ার বাঁধুনীটা এঁটে দিয়েছিল সে। ছুরিটাও তার সাথেই রয়েছে।

এখন রাত–বাতাসে রাতের ঠাণ্ডা ভাব টের পাচ্ছে জেকব।

ডালিয়া···ডালিয়ার কাছে যেতে হবে তার। নো ম্যান্স মেসার কাছে তার জন্য অপেক্ষা করবে ডালিয়া। এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরেই সেই জায়গা। ওকে যতটুকু চিনেছে তাতে সে নিশ্চিত জানে বেঁচে থাকলে ডালিয়া অবশ্যই ওখানেই তার জন্য অপেক্ষা করবে। অবশ্য সে যদি বন্দী থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

নড়তে হবে, এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। ওরা নিশ্চয়ই খুঁজবে তাকে, না পেলে আবার এখানেই ফিরে আসবে। সেটাই স্বাভাবিক।

ওরা কি কাউকে পাহারায় রেখে গেছে? হ্যাঁ, আবছাভাবে মনে পড়ছে, উপরে কাদের যেন কথাবার্তা বলতে শুনেছে সে। পাথরের উপর বুটের আওয়াজও কানে এসেছে তার।

নীচে নামলে বেশিদূর যেতে হবে–উপরে ওঠাই বরং সহজ। তা ছাড়া একটা ঘোড়া দরকার–তার বাকস্কিনটা উপরেই কোথাও আছে। খুব সাবধানে হাতে চাপ

দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল। একটু একটু করে উঠে বসল সে।

আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে। ধোঁয়ার গন্ধ এল ওর নাকে।

গুলির শব্দ শুনেছিল মনে আছে–হয়তো ডালিয়া বা কেলভিনের গুলিতে ওদের একজন আহত হয়েছে। আশেপাশে ওদেরই কেউ আগুন জ্বেলেছে। হাতে কোন চোট লাগেনি তার। পাথর আঁকড়ে ধরে একটু একটু করে নিজেকে টেনে তুলল সে। উপরে মাথা বের করার আগে কান পেতে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেল। খুব সতর্কতার সাথে মাথাটা সামান্য তুলে উঁকি দিল সে।

বিশ গজ দূরে আগুনটা জ্বলছে। আগুনের ধারে বসা লোকটার মুখে আলো পড়েছে কিন্তু চেনা যাচ্ছে না। ওদিকে লক্ষ্য রেখে অপেক্ষা করছে জেকব। ভাবছে হামাগুড়ি দিয়ে যদি সে বেরিয়ে পড়ে, আর লোকটা তখনই এদিকে ফিরে তাকায়–সাথেসাথেই ধরা পড়ে যাবে ও।

সাবধানে আশেপাশে চাইল জেকব। ঘোড়াগুলো কোথায় আছে খুঁজছে সে। নিজের জখমের কথা ভুলে থাকতে চেষ্টা করছে ও। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বুকের কাছে কেমন ভেজা-ভেজা লাগছে–বুঝতে পারছে তার ক্ষত থেকে আবার রক্ত বেরুচ্ছে। তার দেহের একপাশে কিছু অসুবিধা হচ্ছে। কোমরের কাছে জায়গাটা শক্ত আর আড়ষ্ট বোধ হচ্ছে। কয়েক ফুট উঠেই সে বুঝতে পারছে চট করে কোন নড়াচড়া এখন তার পক্ষে অসম্ভব।

গর্তের মধ্যে ফিরে লাভ নেই। সকাল হলেই ভাল করে খোঁজা-খুঁজি করবে ওরা। ঠিকমত বাতাস বইলে ধোঁয়া দিয়েই বের করবে তাকে। না, কোন উপায় নেই। তাকে এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। পিস্তল ব্যবহার করতে পারবে না, তাহলে শব্দে অন্যরাও এসে হাজির হবে।

হাতে ভর দিয়ে নিজেকে টেনে উপরে তুলল জেকব। তারপর কোমরের ব্যথাটাকে বাঁচিয়ে একটু একটু করে এগোতে শুরু করল।

উৎকণ্ঠায় ঘামছে জেকব। আগুনের ধারে বসা লোকটা কোন কারণে একবার এদিকে চাইলেই সব শেষ। অথচ তিরিশ গজের মধ্যে আর কোন আড়াল নেই। একেবারে ফাঁকা।

খুব ধীরে নিঃশব্দে এগোচ্ছে সে। তার টেনে চলার সাথে তাল মেলাতে মুহূর্তগুলোও যেন টেনেটেনে চলছে। বারবারই তার মনে হচ্ছে, এই বুঝি লোকটা তাকে দেখে ফেলবে, কিংবা আওয়াজ শুনল। পরনের মোটা জামা পাথরের সাথে ঘষা খেয়ে একটা হালকা খসখস শব্দ তুলছে–কিন্তু এটা ঠেকাবার কোন রাস্তা নেই।

দুই হাত আর একটা হাঁটু ব্যবহার করে প্রায় অর্ধেক পথ চলে এসেছে–আরও একটু এগোল সে। আর একটু সামনেই একটা ঝোপের ছায়া পড়েছে। তাড়াতাড়ি ওখানেই পৌঁছতে চেষ্টা করল। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে জেকব। বুকের কাছে ছুরি বেঁধার মত যন্ত্রণা হচ্ছে।

বুলেটটা ফুসফুস ছোঁয়নি–নইলে শ্বাস ধীর হয়ে আসত। যেমন আশঙ্কা করেছিল সেই হারে রক্তক্ষরণ হয়নি–তবে তাকে বেশ দুর্বল করে ফেলার মত রক্ত সে হারিয়েছে।

প্রথমে হাত, পরে ওর সম্পূর্ণ দেহই ছায়ার উপর পৌঁছে গেল। এতক্ষণে একটু বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পেল জেকব। আড়চোখে চেয়ে দেখল লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙছে। কাছে থেকে এবারে লোকটাকে চিনতে পারল। টিউবা সিটিতে যে দু'জনের সাথে ওর দেখা হয়েছিল, লোকটা তাদেরই একজন। একবার জেকবের দিকে চেয়ে আবার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল লোকটা। এগিয়ে গিয়ে আরও দু'টো কাঠের টুকরো আগুনে চাপিয়ে দিল সে।

এতক্ষণ আগুনের দিকে চেয়ে বসেছিল বলেই ছায়ায় শোয়া জেকবকে দেখতে পায়নি লোকটা। পাথরের উপর দিয়ে নিজেকে টেনে নিয়ে সীডার গাছের আড়ালে চলে এল। তারপর আবার এগিয়ে চলল সে।

ঘোড়ার গায়ের গন্ধ পেল জেকব। পরক্ষণেই ওগুলোকে দেখতে পেল সে। একটা ঝোপের ধারে বাঁধা রয়েছে। আরও একটু এগোল—একটা ঘোড়া ভয় পেয়ে নাক দিয়ে শব্দ করে উঠল। মনে মনে গালি দিয়ে যতদূর সম্ভব কোমল নিচু স্বরে সে বলল, 'রও বেটা! রও!'

ঘোড়াটা গলা টান দিল। সশব্দে নড়ে উঠল ঝোপ। ক্রল করে আরও এগিয়ে গেল জেকব। ঘোড়াগুলোকে চেনার চেষ্টা করছে সে। একটা ঘোড়া মাথা ঝুঁকিয়ে ওকে শুঁকল। দু'হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে উঠে দাঁড়াল জেকব। অন্ধকারেও সে চিনতে পেরেছে এটা তারই বাকস্কিন।

অনেক কষ্টে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে টান দিয়ে বাঁধনটা খুলে দিল। কিন্তু দুর্বল শরীরে তার মনে হচ্ছে পড়ে যাবে সে। পড়লে আবার ওঠার শক্তি আর থাকবে না। উপুড় হয়ে শুয়ে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরল জেকব।

কানের কাছে ফিসফিস করে নির্দেশ দিতেই ধীর পায়ে অন্ধকারের মধ্যে হাঁটতে শুরু করল বাকস্কিন। লাগাম ধরে ঘোড়ার গতি নিয়ন্ত্রণের কোন চেষ্টা করল না সে। নিজের উপর আধ শোয়া থাকার চেষ্টাতেই ওর সব শক্তি খরচ হচ্ছে। নিজের খুশি মতই নীচের দিকে নামতে শুরু করল ঘোড়াটা।

সহজাত প্রবৃত্তিতেই দূরে পালিয়ে যাবার জন্য ছুটেছিল ডালিয়া। মাইল খানেক যাবার পর মাল-বোঝাই গাধাগুলোর কথা মনে পড়ল তার। গতি কমিয়ে পিছন ফিরে চাইল সে। ছড়িয়ে পড়ে ডালিয়াকে ধরার জন্যে ছুটছে গাধাগুলো।

মোট চারটে গাধা এসে পৌঁছল। ডালিয়ার ঘোড়াকে অনুসরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে ওরা। পিছনে কোথাও আরও তিনটে রয়ে গেছে। দরকারী জিনিসপত্র সব এগুলোর পিঠেই আছে—তাই বাকিগুলোর অপেক্ষায় আর সময় নষ্ট না করে এগিয়ে চলল সে।

কখনও ওদের ছাড়াছাড়ি হলে নো ম্যানস মেঁসার একটা বিশেষ জায়গায় তাকে অপেক্ষা করতে বলেছিল জেকব। কিন্তু সেই জায়গা আর ডালিয়ার মাঝখানে রয়েছে কেলভিন আর ফ্রীডমের সেই দলটা। সম্পূর্ণ মেসা ঘুরে উল্টো দিক থেকে ওখানে পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত নিল সে। ঘোড়া থেকে নেমে মাল-টানা জন্তুগুলোকে দড়ি দিয়ে নিজের ঘোড়ার সাথে বেঁধে নিয়ে আবার রওনা হয়ে গেল। সন্ধ্যায় কপার ক্যানিয়নের ট্রেইল ধরল সে।

রাত হয়ে আসছে। একটা তারা উঠল আকাশে···একটা বাদুড় ওর মাথার উপর একটা চক্কর দিয়ে গেল। শূন্য মরুভূমিতে বহুদূর থেকে একটা কয়োটির ডাক ভেসে এল।

রাইফেলটা শক্ত করে ধরে আছে ডালিয়া। এই নির্জন এলাকায় জেকবের অনুপস্থিতিতে রাইফেলটাই ওর সাহস জোগাচ্ছে। ঘোড়াটাই কেবল নির্ভয়ে ট্রেইল চিনে এগিয়ে চলেছে।

ক্যানিয়নের দু'পাশে দেয়ালগুলো আরও উঁচু হলো। অন্ধকার আরও গাঢ় হয়েছে। স্তব্ধ রাত। মাথার উপরে ওই এক চিলতে আকাশের তারাগুলোই কেবল একটু মিটমিট আলো দেখিয়ে ওকে আশ্বাস দিচ্ছে।

ক্লান্ত ঘোড়াটা সমান তালে এগিয়ে চলেছে। গাধাগুলো এখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিছন পিছন আসছে। শক্ত পাহাড়ী ঘোড়া বলেই এখনও এগোতে পারছে। ঘোড়ার পিঠে এতক্ষণ বসে থেকে ডালিয়া নিজেও অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

সময়ের সব রকম বোধ লোপ পেয়েছে তার। হঠাৎ পরিশ্রান্ত ঘোড়াটা থেমে থেমে লাফিয়ে একটা ক্লিফের উপর উঠতে শুরু করল। শেষ মাথায় প্রায় পা পিছলে পড়তে পড়তেও সামলে নিল। রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ার পরশ লাগল ডালিয়ার মুখে। ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা।

পথে একবার থেমে ঘোড়াকে পানি খাইয়ে খালি বোতলগুলো ভরে নিয়েছে সে। ওখানে কিছু খেয়ে ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে নিয়েছে ডালিয়া।

ভোরের দিকে নো ম্যানস মেসার ধার ঘেঁষে মোড় নিল সে। একটু থেমে কান পেতে শুনল—তারপর আবার এগোল।

মেসার ধার ঘেঁষে ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে যাচ্ছে সে। খুব কাছে না এলে কেউ দেখতে পাবে না ওকে। জেকব তাকে যে খাঁজটার কথা বলেছিল, তার প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে সে। কিন্তু ওদিক থেকে যে-কোন মুহূর্তে কেলভিন, নিকোলাস বা ফ্রীডমের দলটা এসে পড়তে পারে। খুব সাবধানে এগোতে হচ্ছে ওকে। ধুলো না উড়িয়ে পাথরের উপর দিয়ে চলছে সে।

হঠাৎ একটা গুলির শব্দ শোনা গেল। ক্লিফের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে দূরে মিলিয়ে গেল শব্দটা। তাড়াতাড়ি আরেকটা বাঁকের কাছে এগিয়ে সাবধানে উঁকি দিল সে। দেখল নীচে আধমাইল দূরে একটা ঘোড়া পাগলের মত ছুটছে—ঘোড়ার জিনে আরোহী নেই—শূন্য। বুকটা ধড়াস করে উঠল—ওটা জেকবের ঘোড়া নয়তো? রেকাবের উপর দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল। বারবার মনকে বোঝাতে চেষ্টা করছে, ভুল দেখেছে সে—এতদূর থেকে চেনা সম্ভব নয়।

ধুলো উড়ছে ওখানটায়। আরও কয়েকটা গুলির শব্দ উঠল। অনেক দূরে রয়েছে ডালিয়া। ঘোড়া ছুটিয়ে গেলেও সাহায্যের জন্য সময় মত ওখানে পৌঁছতে পারবে না। কিচ্ছু করার নেই। জেকব যদি এই বিপদ থেকে রক্ষা পায় তবে সোজা তার কাছেই আসবে। পিছন থেকে একটা শব্দে ফিরে তাকাল সে।

তিনজন ঘোড়-সওয়ার!

জেকব বলেছিল নিকোলাসের সাথে দু'জন লোক আছে। সম্ভবত তার ঘোড়ার চিহ্ন খুঁজে পেয়ে তাকেই অনুসরণ করছে ওরা। দেখে ফেলেছে কিনা ঠিক

বুঝতে পারল না ডালিয় । তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলল সে।

মেসার ধারটা এখানে দ্রুত ঘুরে কিছুটা ভিতরে ঢুকে গেছে। মাঝে একটা খাঁজ দেখা যাচ্ছে। আশপাশে ঘন গাছ-পালা জন্মেছে। আরও একটু নীচে ক্যানিয়নের শুরু। ঘোড়া আর গাধাগুলোকে একত্র করে খাঁজের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে রাইফেল হাতে মাটিতে শুয়ে পড়ল ডালিয়া।

এখানেই আসবে বলেছিল জেকব। যতদিন সে না আসে, কিংবা ওর মৃত্যু সম্পর্কে নিঃসন্দেহ না হয়, ততদিন ডালিয়া এখানেই অপেক্ষা করবে।

চারপাশটা এবার ভাল করে চেয়ে দেখল সে। জেকব নেই–ওর উপস্থিতির কোন চিহ্নই নেই এখানে। বুকের ভিতরে কেমন যেন একটা অপার শূন্যতা অনুভব করছে ও। সুদীর্ঘ পথ চলতে চলতে আশা নেই জেনেও ভেবেছিল এখানে এলেই সে জেকবের দেখা পাবে। হয়তো আহত অবস্থাতেই দেখবে, কিন্তু দেখা সে পাবেই। এখানে পৌঁছে তার যত্নে পুষে রাখা আশা একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে!

কিন্তু এখন ভাবপ্রবণ হলে চলবে না–তার পিছনে ধাওয়া করে আসছে নিকোলাস।

নিজেকে সামলে নিল ডালিয়া।

জায়গাটা বেশ ভাল। ক্লিফটা ঢালুভাবে উঠে গেছে উপর দিকে। বৃষ্টির সময়ে মনে হয় এই পথেই উপর থেকে জলপ্রপাতের মত পানি নামে–এখন শুকনো। পাঁচ-ছয় ফুট জায়গা জুড়ে এখনও কিছুটা পানি জমে রয়েছে।

আশেপাশে কিছু বুনো ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। কেউ যেন বাতাস আড়াল করার জন্য বা আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য পাথর জড়ো করে একটা আশ্রয় তৈরি করে রেখেছে। নিজের পাশে সার বেঁধে কার্তুজ সাজিয়ে হাঁটু গেড়ে পাথরের আড়ালে বসল সে।

বেশ দূরে নিকোলাসকে দেখা গেল। বিনা দ্বিধায় রাইফেল তুলে ঘোড়ার পায়ের কাছে গুলি বেঁধাল ডালিয়া। চমকে লাফিয়ে উঠে ঘোড়াটা দাপাদাপি শুরু করল। ওর সঙ্গী লোক দু'টো চোখের আড়ালে লুকাল।

ঘোড়াটা শান্ত হবার পর কঠিন চোখে যেখান থেকে গুলিটা এসেছে সেদিকে চাইল নিক। কে গুলি করেছে তা ভাল করেই জানে সে।

'কোন লাভ নেই, ডালিয়া,' বলল নিক। 'শেষ পর্যন্ত ধরা দিতেই হবে। তোমাকে না নিয়ে এখান থেকে নড়ব না আমি।'

জবাব দিল না ডালিয়া।

'আমি জানি তুমি কোথায় আছ। ভাল চাও তো বেরিয়ে এসো–নইলে আমরাই তোমাকে ধরতে আসব।'

পকেট থেকে তামাক বের করে সিগারেট বানাতে শুরু করল নিক। 'কোন লাভ নেই,' আবার বলল সে।

'ওরা জেকবকে ছাড়বে না, খতম করবে ওকে। আর তা না হলে কাজটা আমিই শেষ করব। তুমি এখন একা–আমাকে ছাড়া তোমার কোন গতি নেই।'

ডালিয়া টের পেল কথার ফাঁকে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে নিক।

ঘোড়াটা অস্থিরভাবে নড়াচড়া করছে—কিন্তু কৌশলে ওটাকে এগিয়ে নিয়ে আসছে বদমাইশ লোকটা।

আবার গুলি করল সে।

লাফ দিয়ে ঘোড়াটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হলো। ওর পায়ের তলা থেকে পাথর ছিটকে উঠল। বুলেটটা এবার নিকের মাথার মাত্র দু'ইঞ্চি দূর দিয়ে হ্যাটের কোণায় লেগে বেরিয়ে গেছে! মাথা থেকে খুলে মাটিতে পড়েছে হ্যাট।

হুড়মুড় করে আছাড় খেয়ে পড়ল ঘোড়াটা। গালি দিয়ে উঠল নিক। কিন্তু ওই শব্দের সাথে দূরে নীচে থেকেও একটা শব্দ এল না?…নাকি ওর মনের ভুল?

ডাইনে-বাঁয়ে চাইল ডালিয়া। রাতের অন্ধকারে ওদের এগিয়ে আসা কী করে ঠেকাবে সে?

ওর তিনদিকে মেসার দেয়াল—ডাইনে, বাঁয়ে আর পিছনে। এখান থেকে বেরিয়ে উপরে ওঠার কোন পথ সত্যিই আছে কিনা দেখতে যাবারও সাহস হচ্ছে না তার। কান খাড়া করে ওখানেই বসে রইল সে।

সময় কাটছে…এক ঘণ্টা…দু'ঘণ্টা কিন্তু কিছুই ঘটল না। সূর্যের তাপ ওর পেশীগুলোকে শিথিল করে দিচ্ছে। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে। কয়েকবার নড়েচড়ে বসল—কিন্তু বারবারই ক্লান্তিতে ঝিমানি এসে যাচ্ছে তার। সিধে হয়ে বসল সে। দূরের পাহাড়গুলো পড়ন্ত রোদে জ্বলন্ত পাহাড়ের মত দেখাচ্ছে।

সে বুঝতে পারছে রাতের অন্ধকারে তাকে আরও বেশি সজাগ থাকতে হবে। মুহূর্তের জন্য পাশের সীডার গাছটার সাথে মাথা ঠেকিয়ে একটু চোখ বুজল সে। রাজ্যের ঘুম নেমে এল ওর দু'চোখে।

আমিষ-খেকো পাখি ধীর অলস গতিতে চক্কর দিচ্ছে আকাশে। সীডার গাছের তলায় গাধাগুলো অবসন্নভাবে মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডালিয়ার ঘোড়াটা খোলা জায়গায় এগিয়ে গিয়ে পাথরে আটকা স্থির ঠাণ্ডা পানিতে চুমুক দিল।

ক্যানিয়নের ভিতরে পিছনে ফেলে আসা একটা মাইল কোনমতে হোঁচট খেয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে আর ক্রল করে এগিয়েছে জেকব। নাকিয়ার কাছে, যেখানে সোনালী স্ট্যালিয়নটা বেরিয়ে এসেছিল—সেখানকার নরম বালির কথা জেকবের মনে ছিল। তার বাকস্কিনটা ওখান দিয়ে ছুটে যাবার সময়ে পানির বোতল আর রাইফেল হাতে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়েছে সে।

মেসার দেয়ালে সেই খাঁজটার সিকি মাইলের মধ্যে এসে গেছে জেকব। কথাগুলো বুঝতে না পারলেও নিকোলাসের চেঁচিয়ে কিছু বলা, তারপরেই গুলির শব্দ, সব শুনেছে সে। দ্বিতীয় গুলির পরে এখন সব নীরব।

ডান পা-টা টেনে টেনে চলছে সে। তার প্যান্টের কাপড় রক্ত জমে শুকিয়ে শক্ত হয়ে আছে। ভিতরে কোন হাড় ভেঙেছে বলে তার মনে হচ্ছে না। বুকের গুলিটা তাকে সোজা এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেছে। রক্ত হারিয়ে বেশ দুর্বল হয়ে পড়লেও মনে হচ্ছে এতে ওর দেহের মারাত্মক কিছু ক্ষতি হয়নি। কঠিন মাটিতে সংগ্রাম করে বাঁচতে অভ্যস্ত জেকব। কষ্ট সহিষ্ণুতা ওর দ্বিতীয় ধর্ম

উপায় নেই, এখন তাকে এগিয়েই যেতে হবে। নইলে অবধারিত মৃত্যু।

ডালিয়ার কাছে পৌঁছতে হবে তাকে। ওর কাছে গাধার পিঠে রয়েছে ওষুধ আর খাবার। ওর এখন সবচেয়ে বেশি দরকার খুব গরম আর কড়া এক কাপ কফি। পিস্তল আর রাইফেলের গুলির বাক্সগুলোও রয়েছে ডালিয়ার কাছে। অবশ্য বেশি গুলি খরচ হয়নি তার। এখনও ওর কাছে প্রায় ত্রিশ রাউন্ড গুলি রয়ে গেছে।

আরও একশো গজ সহজেই এগোল সে। তারপর একটা শুকনো জলপ্রপাত বেয়ে ষোলো ফুট উপরে উঠল। তার ভাগ্য ভাল যে প্রপাতটা একবারে সোজা না নেমে ধাপে ধাপে তিনচার ফুট করে নেমেছে। পানির পাত্রটা বারবারই বাধার সৃষ্টি করছে—ওটা নিয়ে ক্রল করে চলতে খুব অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু ওকে যদি বেকায়দায় কোথাও আটকা পড়তে হয় তবে ওই পানিই হয়তো ওর প্রাণ বাঁচাবে। খাবার ছাড়াও চলতে পারবে সে—আগেও চলেছে।

ওখানে স্থির হয়ে কিছুক্ষণ পড়ে রইল জেকব। হাঁপাচ্ছে সে। একটু বিশ্রাম নিয়ে একটু পানি মুখে ঢেলে ভিতরটা ভাল করে ভিজিয়ে গলা দিয়ে ওটা নীচে নামাল।

সে বুঝতে পারছে ওরা এতক্ষণে আন্দাজ করে ফেলবে সে কোথায় আছে। ওর খালি ঘোড়াটা কিছুদূর পর্যন্ত অনুসরণ করেই চালাকিটা বুঝতে পেরে আবার ফিরে আসবে ওরা। ঘোড়া থেকে সে কোথায় নেমেছে সেটা খুঁজে বের করতে ওদের বেশি সময় লাগবে না। তারপরই ক্যানিয়ন ধরে সোজা এগিয়ে আসবে।

সময়ের হিসাব অনেক আগেই হারিয়েছে জেকব। চলতে চলতে বারবার মাটিতে পড়েছে, উঠেছে, আবার পড়েছে—কিন্তু তবু এগিয়েছে। এখন আর ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে এগোচ্ছে না সে—যন্ত্রের মত চলছে।

'ডালিয়া...ডালিয়া আমার জন্যে একটু দাঁড়াও।' ভাঙা গলায় ফিসফিসিয়ে উচ্চারণ করল জেকব। কথাটা এই নিয়ে কতবার বলেছে সে?

পিছনের লোকগুলো পিছু ছাড়েনি। শক্ত মানুষ ওরা! আজ সারাটা দিনে বহুবার টের পেয়েছে জেকব—ওদের সহজে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। ওই কঠিন লোকগুলোর একটাই উদ্দেশ্য—শক্ত-পাল্লাকে শেষ করতে হবে। এবারে আদা-জল খেয়ে লেগেছে ওরা। ফেরানো যাবে না।

ওদের কথা মনে পড়তেই আবার এগোতে শুরু করল জেকব। কিছুদূর এগিয়েই আবার পড়ে গেল সে। ধীরে ধীরে উঠে বসতে চাইল।

সামনেই বালুর উপর রয়েছে ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন। নালবিহীন ছাপ—বুনো ঘোড়ার! ওগুলো এখানে কীভাবে এল? তবে কি এখানে পৌঁছবার আর কোন সোজা পথ আছে যেটা তার চোখে পড়েনি? এখানেই বা কেন এসেছিল ওরা?

রাইফেলে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল জেকব। খুঁড়িয়ে এগিয়ে চলল সে। প্রতি পদক্ষেপেই হোঁচট খাচ্ছে, প্রায় পড়ে যাবার অবস্থা হচ্ছে। কতগুলো পাথরের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আরও সামনে নো ম্যানস মেসার খাঁজটা দেখতে পেল। ওটা উপর দিকে ধীরে ধীরে সরু হয়ে গেছে। আরও একটা জায়গায় আবার ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখা গেল।

এখানে নিশ্চয়ই পানি আছে কোথাও। ঠিক—ওই পানির আশেপাশেই কোথাও

অপেক্ষা করবে ডালিয়া।

আবার পড়ে গেল জেকব। হাতে ভর দিয়ে উঠতে গিয়ে খেয়াল করল বালুর উপর রক্ত। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়া অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন আবার সেখান থেকে রক্ত পড়তে শুরু করেছে।

পিছন থেকে পাথরের উপর খটর্ খটর্ আওয়াজ হচ্ছে। চমকে উঠে পিছন ফিরে চাইল। কেউ–কিছু একটা ওর দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে।

তেরো

পাথরের উপর বুটের ঘষা খাওয়ার শব্দে ডালিয়ার ঘুম ভাঙল। চোখ খুলেই একজোড়া বুট দেখতে পেল সে। ওদিক থেকে কেউ একজন হেসে উঠল।

'কী আশ্চর্য! কত ভয়ে ভয়ে এগিয়েছি আমরা…আর এদিকে উনি দিব্যি নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন!'

'মেয়ের ফর্মাটা ভাল। নিক বলেছে তার কাজ শেষ হলে ওকে আমাদের হাতে তুলে দেবে…চমৎকার প্রস্তাব। আমাদের সবাইকে একাই অনেক আনন্দ দিতে পারবে মেয়েটা।'

আধশোয়া অবস্থায় পাথরে হেলান দিয়ে স্থির হয়ে রয়েছে ডালিয়া। সব শেষ–বিফল হয়েছে সে। সম্পূর্ণ বিফল। কত সাবধানে ছিল, সবকিছুই ঠিক ঠিক করেছিল। জায়গাটা খুঁজে বের করে সময় মতই পৌঁছেছিল। ওরা কীভাবে যেন টের পেয়ে পিছু নিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু সব পণ্ড করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত কিনা বোকার মত ঘুমিয়ে পড়ল সে।

আজ কত ঘণ্টা একটানা জেগে থাকার পরে ঘুমিয়েছে সে? এর আগেও কত রাত তাকে শুধু নামমাত্র ঘুমিয়ে কাটাতে হয়েছে? তার শরীরের উপর অবিরাম যাত্রার ধকল কতদিন ধরে যাচ্ছে? নিজেকে এইসব প্রশ্ন করছে না–অজুহাত খুঁজে লাভ নেই। এই অবস্থা থেকে রেহাই পাবার একটা উপায় বের করতে হবে।

রাইফেলটা আর তার পাশে নেই। ওরা সরিয়ে রেখেছে। মোট তিনজন ওরা। ওদের বিরুদ্ধে একা কী করতে পারে সে?

পাথরের উপর বুটের আওয়াজ উঠল। তারপর নিকোলাসের গলা শোনা গেল, 'কোথাও নেই। মনে হচ্ছে ব্যাটা মরেছে, নইলে এখানে ওকে নিশ্চয়ই দেখা যেত।'

'মরুকগে ও ছুঁড়ীটা তো বেঁচে আছে?'

ডালিয়ার দিকে চেয়ে ওকে বুট দিয়ে গুঁতো দিল নিক। 'ওঠো, মটকি মেরে পড়ে থেকে কোন লাভ নেই।'

বিনা প্রতিবাদে শান্তভাবেই উঠে দাঁড়াল ডালিয়া। একে একে সবার দিকে চেয়ে ওদের মুখের ভাব লক্ষ করল। ভাবছে সে…মন্টির মুখে দয়া মায়ার কোন আভাস নেই। ওর কাছ থেকে কোনরকম সাহায্যই আশা করা যায় না।

অন্যজন একটু বেঁটে—খুব শক্ত গড়ন, তবু হয়তো···কিন্তু পরমুহূর্তেই সে যেমন লোলুপ দৃষ্টিতে ডালিয়ার দিকে চাইল, তাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকল না।

খুব বড় রকম বিপদে জড়িয়ে পড়েছে তা বুঝতে পারছে। মাথাটা ঠাণ্ডা রেখে চিন্তা করার চেষ্টা করছে সে। জেকবকে যে সে আশা করছে তা ওদের বুঝতে দেওয়া কিছুতেই চলবে না। আর যে ক্যানিয়ন ধরে সে আসবে, সেদিক থেকে ওদের নজর অন্যদিকে ফিরাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

'কোথায় সে?' প্রশ্নটা এমনভাবে করল নিকোলাস যে মনে হলো তাতে ওর কিছুই যায় আসে না।

'ওরা মেরে ফেলেছে ওকে। ওই ফ্রীডমের দলটা। ওদের সাথে কথা বলতে ঘোড়ার পিঠে করেই এগিয়ে গেছিল সে—দু'জন একপাশে দাঁড়িয়েছিল—ওরাই গুলি করেছে ওকে। মনে হয় ওদের একজনকে খতম করেছি আমি।'

'তুমি মেরেছ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল বেঁটে লোকটা। 'কীভাবে?'

'ওটা দিয়ে,' হাত তুলে সরিয়ে রাখা রাইফেলটা দেখাল ডালিয়া। 'অন্য লোকটাকে পেলে ওকেও শেষ করব আমি।'

খ্যাকখ্যাক করে হেসে উঠল সে। তারপর নিকোলাসের দিকে চেয়ে বলল, 'এই মাগীর ওপর সতর্ক নজর রাখতে হবে, নিক।'

'চিন্তার কোন কারণ নেই, আমি নিজেই নজর রাখব।'

কয়েক পা সরে গিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে ক্লিফ, ঝোপ আর গাছগুলো লক্ষ করছে নিক। উপর দিকে যেখান থেকে বৃষ্টির সময়ে পানি পড়ে, সেই জায়গাটা অনেকটা গাছপালা আর আগাছায় ঢাকা পড়ে আছে। পিছনে সাদা ক্ষত চিহ্নের মত নগ্ন ক্লিফের পাথর উঁকি দিচ্ছে। ওদিকে একবার চেয়ে আবার ফিরে এল সে।

'লোকটা যদি মরেই গেছে, তবে তুমি এখানে ফিরে এসেছ কেন?'

'মানে?' অবাক হবার ভান করল ডালিয়া। 'ওর মৃতদেহ খুঁজে বের করে ওকে কবর দেব বলেই ফিরে এসেছি। ওই লোকগুলো চলে গেলেই আমি ওর দাফনের ব্যবস্থা করব।' সোজাসুজি নিকোলাসের চোখের দিকে চাইল সে। 'ওর দেহটাকে শিয়াল শকুনে ছিঁড়ে খাবে, এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারব না আমি।'

'হয়তো মরেছে সে···হয়তো মরেনি। নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা।' ডালিয়ার দিকে চাইল নিক। 'তুমি থাকায় সময়টা আমার আনন্দের মধ্যে দিয়েই কাটবে।'

দূরে উপত্যকার দিকে ডালিয়ার চোখ পড়ল। উপত্যকার একটা সমতল অংশ বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওখান থেকে। হঠাৎ ঘোড়াগুলোকে দেখতে পেল সে। সোনালী স্ট্যালিয়নটাই দলের সবাইকে পথ দেখিয়ে আগে আগে ছুটছে।

ডালিয়ার হার্ট বিট বেড়ে গেল। বুনো ঘোড়ার দল। বাতাস ওদিক থেকে ডালিয়াদের দিকে বইছে। পথে কোন বাধা না পেলে সোজা এখানেই আসবে ঘোড়াগুলো! গন্ধ পাবে না।

কী ঘটবে? ওরা কি পাশ কাটিয়ে যাবে? নাকি সোজা এখানেই এসে ঢুকবে? ওদের দেখে আবার ছুটে পালিয়ে যাবে? আতঙ্কিত হয়ে ঘুরপাক খাবে—নাকি

ওদের উপর দিয়েই চার্জ করে এগিয়ে যাবে?

'আমি কিছু খাবার তৈরি করব ভাবছি,' বলল ডালিয়া। 'তোমাদের আপত্তি আছে?'

'না,' জবাব দিল নিক।

গাধার পিঠের থেকে যা যা দরকার বেছে নামাতে শুরু করল ডালিয়া। তাড়াহুড়া করছে না। ভাবছে, ঘোড়াগুলো যদি এখানেই আসে কতক্ষণ সময় লাগবে ওদের পৌঁছতে? ওরা যে মাঝেমাঝে এখানে আসে তা জেকবের কাছে শুনেছে সে। ওদের পায়ের ছাপও দেখেছে।

জেকবের পিছনে যারা তাড়া করেছিল তারা ওই দিকেই কোথাও আছে। ওদের দেখে ভয় পেয়ে ঘোড়ার দলটা মোড় নিয়ে ক্যানিয়ন ধরে উপরে উঠে আসাটাই স্বাভাবিক।

জিনিস ক'টা ওখানেই মাটিতে নামিয়ে রেখে ঘুরে ফিরে লাকড়ি জোগাড় করতে শুরু করল ডালিয়া। কেউ ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। ওর দিকে কামুক চোখে চেয়ে চেয়ে ওরা ভবিষ্যৎ সুখ-স্বপ্ন দেখছে। এটাই চাইছিল ডালিয়া...মনে মনে প্রত্যাশা সে-ও করছে। গাধার পিঠে অন্যান্য মালের সাথে জরুরী অবস্থায় ব্যবহারের জন্য একটা ছুরিও রাখা আছে।

আগুন জ্বালাবার জন্য সংগ্রহ করা কাঠ নামিয়ে রেখে আবার গাধাগুলোর কাছে ফিরে গেল। যতক্ষণ সম্ভব আগুন জ্বালা স্থগিত রাখতে চাইছে–ধোঁয়ার গন্ধ নাকে গেলে আর ঘোড়াগুলো এদিকে আসবে না। জিনিসপত্রের ভিতর হাত ঢুকিয়ে মুঠো করে ছুরির বাঁটটা অনুভব করল। পাশেই ওর ঘোড়াটা রয়েছে।

ঠিক সেই সময়ে ক্যানিয়নের দিক থেকে একটা বিকট চিৎকারের সাথে সাথে দ্রুত এগিয়ে আসা খুরের শব্দ শোনা গেল। ছুরি হাতে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ডালিয়া।

ধুলোর মেঘ দেখে হতভম্ব হয়ে গেল সে। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে তাড়াতাড়ি নিজের ঘোড়ার উপর চড়ে বসল।

নিকোলাস ওকে চিৎকার করে থামতে বলল। কিন্তু ততক্ষণ ঘোড়াগুলো ঢুকে পড়েছে ওদের ক্যাম্পে। চট করে ঘুরে লাফিয়ে ঘোড়ার পথ থেকে সরে যেতে গিয়ে নিক হোঁচট খেয়ে পড়ল পাথরগুলোর ফাঁকে। মন্টি সীডার ঝোপের আড়ালে নিরাপদেই আছে। কিন্তু বেঁটে লোকটা ওই ঘোড়াগুলোর পথের মাঝখানে পড়ে গেল।

আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে সোনালী ঘোড়াটার দিকে পিস্তল তুলল সে। কিন্তু গুলি করার আগেই অন্যদিক থেকে একটা গুলির শব্দ উঠল। ঘুরে ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর পায়ের তলায় উপুড় হয়ে পড়ল লোকটা।

এতগুলো বুনো ঘোড়ার মধ্যে পড়ে গিয়ে ডালিয়ার ঘোড়াটাও ওদের সাথে ছুটতে শুরু করল। উপরে সীডারের ঝোপগুলোর দিকে লাফিয়ে এগিয়ে গেল স্ট্যালিয়ন। পাথরের দেয়ালটার কাছে একা একটা বড় পাথরের পিছন দিয়ে ঘুরে সরু একটা পথ ধরে উপরের দিকে ছুটল। ডালিয়ার ঘোড়াটাও হোঁচট খেতে খেতে ছুটছে ওদের সাথে। ঝোপের ভিতর দিয়ে যাবার সময়ে একটা নিচু ডালের

সাথে বাড়ি খাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে মাথা নুইয়ে কোনমতে ওটাকে কাটাল ডালিয়া। আপ্রাণ চেষ্টার পরে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে মেসার ধার টপকে পার হয়ে গেল ঘোড়াটা। নো ম্যানস মেসার মাথায় উঠে এসেছে ওরা!

শক্ত হাতে লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে ফেরাল ডালিয়া।

জেকব!

নিজের বাকস্কিনের পিঠে চড়েই ওদের সাথে উপরে উঠে এসেছে জেকব! লাফিয়ে নীচে নেমে ওর কাছে ছুটে গেল ডালিয়া। নামতে গিয়ে ডালিয়ার বাড়িয়ে দেওয়া হাতের মধ্যে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল জেকব। শার্টের সামনের দিকটা রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে। মড়ার মত দেখাচ্ছে ওকে।

'রাইফেল,' হাঁপ টেনে বলল সে। 'ওদের ঠেকাও!'

বাকস্কিনটাকে ধরে কোনক্রমে দাঁড়াল সে। ওর হাত থেকে রাইফেলটা নিয়ে মেসায় ওঠার মুখটার দিকে ছুটে গেল ডালিয়া। কাউকেই দেখতে পেল না। তবু ভয় দেখানোর জন্য রাইফেল তুলে নীচের দিকে একটা গুলি করল। এখন আর সহজে আগে বাড়তে সাহস পাবে না ওরা।

ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে ডালিয়ার পাশে এগিয়ে এল জেকব। একটা পা সোজা রেখে এক হাঁটুর উপর ভর করে বসল। তারপর কেবল হাতের সাহায্যে নিজেকে টেনে শিলার উপর তুলল।

বন্য ঘোড়াগুলো উপরে উঠে গাছপালার ভিতর এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে। মেসার উপরটা সীডার আর পাইন গাছে ভর্তি। অন্য গাছগুলো চিনতে পারল না ডালিয়া। এখানে ওখানে মাঝারি আকারের মাঠগুলোতে সুন্দর ঘাস জন্মেছে। বোঝাই যাচ্ছে ঘোড়াগুলো এখানে নিয়মিতই আসে।

রাইফেলটা জেকবের হাতে ধরিয়ে দিয়ে গাধাগুলোর কাছে এগিয়ে গেল ডালিয়া। ঘোড়াগুলোর সাথে ওরাও ছুটে উপরে উঠে এসেছে।

তাড়াতাড়ি একটা আগুন জ্বেলে পানি বসিয়ে দিল সে। তারপর জেকবের কাছে এসে ওর শার্টের বোতামগুলো খুলে ফেলল।

বুকের ক্ষতটা কিছুটা ফুলে উঠে কুৎসিত দেখাচ্ছে। যত্ন করে অল্প গরম পানিতে ওটা ধুয়ে দিল সে। কোমরের জখমটা সামান্যই–গুলিটা আঁচড় কেটে হাড়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ঘোড়া থেকে পড়াতেই পায়ে চোট লেগেছে বেশি। নীল হয়ে আছে ওর ঊরু! ওটাও ধুয়ে পরিষ্কার করা শুরু করতেই ওকে বাধা দিল জেকব।

'ওই যে গাছটা দেখছ,' বলল সে। 'যেটায় ঘিরে রঙের ফুল ধরে আছে–ওটা এনে ছেঁচে পানিতে ফুটিয়ে নাও।'

'কী গাছ ওটা?'

'ক্লিফ রোজ। এসব মেসায় ওই গাছ প্রচুর জন্মায়। হোপি ইন্ডিয়ানরা ওটা দিয়ে জখম ধোয়–বেশ কাজ হয় ওতে।'

জেকবের নির্দেশ মতই কাজ করল ডালিয়া। পিউটে মেসার দেয়ালটায় অস্তগামী সূর্যের রঙ লেগেছে। নো ম্যানস মেসার ছায়াটা ধীরে ধীরে আরও লম্বা হচ্ছে।

'এখন আমরা কী করব?' প্রশ্ন করল ডালিয়া।

'আগুনটাকে জিইয়ে রাখতে হবে। ওই গাছটার তলায় আমাকে শুইয়ে দাও। যতক্ষণ আক্রমণ না আসে, কিংবা ঘণ্টা দুই আমাকে ঘুমাতে দাও, তারপর তুলে দিয়ো এরপরে আমি পাহারায় থাকব। আগুনটা যদি জ্বেলে রাখা যায় তা হলে কারও পক্ষে অলক্ষ্যে উপরে উঠে আসা অসম্ভব।'

একটু পরে জেকবকে শক্ত করে ধরে দাঁড় করাল ডালিয়া।

জেকব হঠাৎ বলে উঠল, 'আমার বাকস্কিনটা বুনো ঘোড়ার দলের সাথে গিয়ে মিশেছিল। একেবারে অবসন্ন অবস্থায় পড়েছিলাম, আর এক পা-ও এগোবার শক্তি ছিল না আমার। আমাকে খুঁজে পেয়ে ওর কী খুশি–ঠিক ছোট্ট কুকুরের বাচ্চার মত করছিল। কোনমতে ওর পিঠে চড়ে বসেছিলাম।'

'ওরা কি ওপরে ওঠার চেষ্টা করবে, জে?' ওকে ধরে গাছটার তলায় শুইয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল ডালিয়া।

'লিয়া···তুমি দেখো । আমি···' কথা জড়িয়ে গেল। ঘুমিয়ে পড়ল জেকব।

চারদিক নিস্তব্ধ। সূর্য ডুবে গেছে। আগুনে দেওয়ার জন্য অনেক শুকনো ডালপালা জোগাড় করে স্তূপ করে রাখল ডালিয়া।

পায়ে সাদা মোজার মত ছোপওয়ালা বুড়ো ঘোড়াটা কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের কাছ থেকে সরে যাবার বড় একটা তাগিদ নেই ওর। মনে হয় ক্যাম্পের ধোঁয়ার গন্ধে পুরোনো স্মৃতি ফিরে আসছে তার।

রাইফেলটা চেক করে তাতে আবার গুলি ভরে নিল সে। জেকবের পিস্তলেও খালি ঘরগুলোতে গুলি ভরে রাখল। আগামীতে কী হতে যাচ্ছে ভেবে একটু ভয় ভয় করছে ওর–কিন্তু ঠিক ভয়ও বলা যায় না একে। জেকব পাশে থাকতে তার আবার ভয় কীসের? হোক না সে আহত–পাশে জেকব থাকলে কাউকে সে ভয় পায় না।

গভীর কালচে নীল রঙ ধারণ করল আকাশ। একটা দু'টো করে তারা ফুটে উঠছে। আশেপাশের ছোটবড় পাহাড়গুলোকে কালো আর রহস্যময় দেখাচ্ছে। রাতের ঠাণ্ডা ফুরফুরে হাওয়ায় চাঙ্গা বোধ করছে ডালিয়া। গাধার পিঠ থেকে কম্বল এনে জেকবের দেহটা ঢেকে দিল সে।

অস্থির বোধ করছে। ক্লিফের ধারে গিয়ে কিছুক্ষণ কান পেতে রইল। নীচে ওদের ক্যাম্পে আগুন জ্বলতে দেখা যাচ্ছে।

দক্ষিণ দিকে চাইল সে। ওদিকে দূরে গুহার মত দেখা যাচ্ছে। ওরা দু'জনে মিলে যেখানটায় সব্জি বাগান করেছিল সেখানেও মেসার উপরে এইরকম গুহা ছিল। সাধের বাগানটা ছেড়ে আসতে বেশ খারাপ লেগেছিল ওর।

আজ রাতেই আক্রমণ আসবে। মনে মনে এটা নিশ্চিত জানে ডালিয়া। কিন্তু এবারে সে তৈরি থাকবে।

চোদ্দ

ঘোড়ার পিঠে বাঁধা বার্টের দেহটা নিয়ে ফ্রীডমে পৌঁছল ইউজিন। সোজা ফ্রেডের বারের সামনে গিয়ে থামল সে।

এরমধ্যেই লোক জড়ো হতে আরম্ভ করেছে। গিবন, ডিক, ডেভ, অ্যালেন সবাই উপস্থিত। আড়ষ্টভাবে ঘোড়া থেকে নামল ইউজিন।

'হ্যাঁ, এই লোকটাই বার্ট,' বলল সে। 'মারা গেছে ও। আর এখনই যদি অন্য সবাইকে ঠেকানো না হয় তবে আরও লোক মারা পড়বে। নিরপরাধ শক্ত-পাল্লার সাথে ওর স্ত্রীকেও হত্যা করবে ওরা।'

'স্ত্রী?' প্রশ্ন করল গিবন।

'হ্যাঁ, সে-ই বার্টকে গুলি করেছে। লী-র সাথে কথা বলছিল শক্তপাল্লা, বলছিল ডেরিক ওর দিকে পিঠ দিয়ে গোপনে কোমরের সামনে গুঁজে রাখা পিস্তল বের করে বগলের তলা দিয়ে ওকে গুলি করার চেষ্টা করেছিল বলেই ওর গুলি ডেরিকের পিঠে লেগেছে। কিন্তু ওকে কথা শেষ করার সুযোগ না দিয়েই আত্মসম্মানহীন ইতরের মত বার্ট আর ক্লাইভ ওকে গুলি করে।'

'মরেনি সে?' কে যেন প্রশ্ন করল।

'মনে হয় না।'

'অন্য সবাই কী করছে?' জটলার ভিতর থেকে প্রশ্ন এল। 'ও যদি সত্যি কথা বলে থাকে?' আর একজন বলল। 'কোন প্রমাণ তো নেই?' সবাই একসাথে কথা বলছে–কারও কথা কেউ শুনছে না।

'চুপ করো!' চিৎকার করে ধমকে উঠল গিবন। 'সবাই একসাথে কথা বললে কোন লাভ হবে না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হবে।' সবাই চুপ করলে ইউজিনের দিকে ফিরল সে। 'লী-র কী মত?'

'ওর ধারণা নিজেকে বাঁচাবার জন্যে শক্ত-পাল্লা এখন ওই কথা বলছে–ডেরিক অমন করতেই পারে না।'

বার থেকে বেরিয়ে এসে এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিল ফ্রেড। এবার এগিয়ে এল সে। 'প্রমাণ আছে।' বোমার মত শোনাল কথাটা। 'আমি নিজের চোখে ডেরিককে পেটের কাছে পিস্তল গুঁজতে দেখেছি। জিজ্ঞেস করতেই ধমক দিয়ে আমাকে নিজের চরকায় তেল দিতে বলেছিল সে।'

'তা হলে বোঝা যাচ্ছে অন্যায়ভাবে পিঠে গুলি করে হত্যা করা হয়নি ওকে,' চিন্তিত গম্ভীর স্বরে বলল গিবন।

'কিন্তু এটা শুধু আমরা বুঝলে কী লাভ? ওদের বোঝাবে কে? ওরা যদি ভুল বুঝে দু'জন নির্দোষ মানুষকে হত্যা করে তবে আমাদের শহরের এই কলঙ্ক আর জীবনেও ঘুচবে না,' হতাশ সুরে বলল ইউজিন।

'যে করেই হোক ওদের ঠেকাতেই হবে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল গিবন। 'ফ্রেড,

দোকানের ভার আর কারও কাছে দিয়ে তুমিও চলো আমাদের সাথে। এক্ষুণি রওনা হচ্ছি আমরা।'

পনেরো মিনিটের মধ্যেই গিবন, ইউজিন আর ফ্রেডের সাথে আরও তিনজন রওনা হয়ে গেল।

দুই ঘণ্টা কেটে গেছে। তবু জেকবকে ঘুম থেকে জাগায়নি ডালিয়া। আহত হওয়ার পরে এই প্রথমবারের মত বিশ্রাম নিচ্ছে সে। ডালিয়া যখন বুকের ড্রেসিং বদলে দিয়েছে তখন জাগেনি ও। আরও ক্লিফ রোজ ব্যবহার করেছে সে। ঘুমের মধ্যেই বিড়বিড় করে কী যেন বলে উঠেছিল, কিন্তু ঘুম ভাঙেনি তার।

এর মধ্যে দু'বার সে ক্লিফের ধারে গিয়ে আগুনে কাঠের জোগান দিয়ে এসেছে। দু'বারই খুব সাবধানে এগিয়েছে—ধারের কাছে গিয়ে কান খাড়া করে থেকেছে, কিন্তু নীচে থেকে কোনরকম শব্দই তার কানে আসেনি।

রাত বাড়ছে। সেই সাথে আরও সতর্ক হয়ে উঠছে ডালিয়া। অনেক আগেই রাত বারোটা বেজে গেছে। আর পারছে না সে—তার ভয় হচ্ছে আবারও ঘুমিয়ে পড়বে আগের মত। তা হলে আর রক্ষা নেই, ঘুমের মধ্যেই খুন হয়ে যাবে ওরা। আর ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না ভেবে এক কাপ গরম কফি হাতে জেকবকে ডেকে তুলল।

একটু নড়ে কয়েকবার মিটমিট করে চোখ খুলল জেকব। ডালিয়াকে দেখে একটু হেসে কাপটা হাতে নিয়ে উঠে বসল। একদিনেই তার স্বামীর চোখ-মুখ একেবারে বসে গেছে। কিন্তু কফি শেষ করে বিনা সাহায্যেই উঠে দাঁড়াল জেকব।

বাতাসে আগুনের তেজ কমে এসেছে। দূরে মেঘের গর্জন শোনা গেল। ঘুরে আকাশের দিকে চাইল জেকব। আকাশের একটা অংশ কালো হয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে মেঘ। চারদিক আলো করে দূরে একটা পাহাড়ের মাথায় বাজ পড়ল।

রাইফেলটা তুলে নিল জেকব। 'গাধাগুলোকে একত্র করে সামলে রাখতে হবে,' বলতে বলতেই বৃষ্টির কয়েকটা বড় ফোঁটা পড়ল। 'আগুনটা এখনই নিভে যাবে।'

একটু খুঁড়িয়ে বাকস্কিনটাকে কাছে এগিয়ে নিয়ে এল। তারপর হঠাৎ কী মনে করে জিন তুলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দিল সে। গাধাগুলোকে জড়ো করে এনে ডালিয়া দেখল তার ঘোড়াও সাজা হয়েছে। ডালিয়াকে গাধাগুলোর পিঠে সব মাল তুলতে বলে আগুনের উপর বেশ কিছু কাঠ চাপিয়ে দিল জেকব।

নিজেকে টেনে জিনের উপর বসিয়ে মেসার উপর দিয়ে উত্তরে রওনা হয়ে জেকব বলল, 'নীচে থেকে মাইলখানেক উত্তরে কিছু ভাঙাচোরা নিচু জমি দেখেছি আমি—ওখানে হয়তো একটা আশ্রয় মিলতে পারে। তা ছাড়া নিচু জায়গায় আমাদের ওপর বাজ পড়ার সম্ভাবনা কম।'

ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হলো। সেই বুড়ো ঘোড়াটাই ওদের আগে যাচ্ছে। জেকবের ঘোড়ার সাথে বাঁধা গাধাগুলো পিছন পিছন চলেছে!

সামনের ঘোড়াটাই যেন ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সামনে কয়েকটা ভাঙা জায়গা পড়ল। ওরই একটা বেছে নিয়ে ঘোড়াটা নীচে নামতে শুরু করল।

প্রায় দু'শো ফুট নামার পরে বাঁক নিয়েই বিশাল গুহাটা দেখতে পেল ওরা।

বৃষ্টি অনেকটা ধরে এসেছে। জিন আর মালপত্র নামিয়ে পশুগুলোর জন্য একপাশে জায়গা করে দিল জেকব। অন্যদিকে ডালিয়া বিছানা পেতে ফেলেছে।

আবার মুষলধারে বৃষ্টি নামল। ঘনঘন বিকট শব্দে বজ্রপাত হচ্ছে। পাশাপাশি শুয়ে ডালিয়াকে আরও কাছে টেনে নিল জেকব। এই ঝড়বাদলের মধ্যে কেউ ওদের খুঁজতে আসবে না। আর এলেও খুঁজে পাবে না–বৃষ্টিতে ওদের সব চিহ্ন ধুয়ে মুছে যাবে। পরস্পরের নিশ্চিন্ত সান্নিধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

ভোর বেলা লী, কীথ আর ক্লাইভ এসে হাজির হলো মেসার ধারে নিকোলাসের ক্যাম্পে। ওদের দেখে খুশি হওয়ার কোন ভাব দেখাল না নিক। ওদের সাথে কেলভিনকে দেখে মন্টির মুখের ভাবও কঠিন হয়ে উঠল।

'ওরা কোথায়? পালিয়ে গেছে?' প্রশ্ন করল লী।

ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে পিছনে উপরদিকে দেখাল নিক।

'ওখানে উঠল কীভাবে? উপরে ওঠার কোন রাস্তা আছে বলে তো শুনিনি?' প্রশ্নটা নিককে করলেও কেলভিনের চোখ মন্টির উপর। ওর আশেপাশে কিছুটা জায়গা বেশ খুঁটিয়ে দেখল সে। ও যে কী ভাবছে তা বোঝা মুশকিল

'রাস্তা একটা খুঁজে পেয়েছে ওরা,' মন্টি বলল। 'কতগুলো বুনো ঘোড়ার পিছু পিছু সোজা উঠে গেছে।'

'তোমরা ওপরে ওঠোনি?'

'উপায় ছিল না। মেসার ওপর কিনারা ঘেঁষে আগুন জ্বেলে রেখেছিল ওরা। বৃষ্টিতে নিভে গেছে। আগুনটা আর জ্বালা হয়নি–মনে হচ্ছে ওখান থেকে অন্যদিকে কোথাও সরে গেছে ওরা।'

কীথ ওকে থামিয়ে বলে উঠল, 'তোমরা তিনজন ছিলে না? আর একজন কোথায় গেল?'

'ঘোড়াগুলো ওপরে ওঠার সময়ে ওকে পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলেছে। অবশ্য তার আগে জেকব গুলি করেছিল ওকে। ওর মৃতদেহ ওদিকে নিয়ে রেখেছি আমরা।'

ওদিকে একবার চেয়ে দেখল সবাই কিন্তু কেউই ওর মরদেহের কাছে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করার তাগিদ অনুভব করল না। ওকে এই এলাকার সবাই চেনে। অত্যন্ত নিচু জাতের বদমাইশ ছিল লোকটা। ওর মৃত্যুতে ভাল বই খারাপ হবে না কারও।

'তা হলে আর দেরি কীসের?' বলল লী। 'চলো উপরে উঠে ওকে শেষ করে আসি?'

নিকোলাস নড়ল না। 'তোমরা কাজের ভারটা আমার ওপর দিয়েছ,' বলল সে। 'ওটা আমার দায়িত্ব।'

'আমরা সবাই যখন আছি এখানে–চলো একসাথে যাই।'

'সাহায্যের দরকার হবে না আমার,' দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল নিক।

'ওপরে ওর সাথে যে মেয়েটা আছে ডেরিকের মৃত্যুতে ওর কোন হাত ছিল না–ওকে শহরে ফিরিয়ে নিয়ে যাব আমরা,' বলল কীথ।

'ওই মেয়ের ব্যবস্থাও যা করার আমিই করব,' জবাব দিল নিক।

জীবনে প্রথমবারের মত অনিশ্চিত বোধ করছে লী। নিকোলাস একজন ভয়ানক লোক সন্দেহ নেই, ওকে ভয় পাচ্ছে না সে–সে ভাবছে লোকটাকে সে-ই ক্ষমতা দিয়ে মার্শালের পদে বসিয়েছে। সে-ই উদ্যোক্তা হয়ে ওকে এই কাজটা দিয়েছিল।

'ওই মেয়েটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমরা আমাদের কর্তব্য মনে করি,' বলল কীথ। 'আমরা ওকে ফ্রীডমে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে স্টেজ কোচে তুলে দেব।'

'এখানে যা করার আমিই করব। তোমাদের সাহায্যের দরকার নেই আমার–তোমরা এখান থেকে বিদেয় হও এবার।'

'গুষ্টি মারি ওই ছুঁড়ীর!' খেপে উঠল ক্লাইভ। 'হারামজাদী বার্টকে খুন করেছে–আমাকেও মারতে চেয়েছিল।'

'আমরাও তোমার সাথে যাব নিকোলাস,' দৃঢ় স্বরে বলল লী।

'আমি তোমাদের নির্বাচিত আইনসম্মত প্রতিনিধি,' বলল নিক। 'আমার কাজে বাগড়া বাধাতে এলে তোমাদের গ্রেপ্তার করব আমি।'

'সে সাহস তোমার হবে না,' ফুঁসে উঠল কীথ।

'তোমাকে বরখাস্ত করা হলো, নিকোলাস,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল লী। 'ফ্রীডমে ফিরে যেতে পারো তুমি।'

হাসল না নিক। তাচ্ছিল্যের স্বরে সে বলল, 'আমাকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। তোমাদের ভোটের নিয়ম আমার জানা আছে।'

মন্টি এক পাশে সরে গেছে। লী জানে ওখান থেকে ওদের সবাইকেই বন্দুকের নলের মুখে পাচ্ছে সে। কিন্তু এত কথার পরে পিছিয়েও যেতে পারছে না ও।

'আমি এর মধ্যে নেই,' বলে উঠল ক্লাইভ। 'ওই মাগী মরলেই বরং আমি খুশি হব।'

'তর্ক করে কী লাভ?' বলল মন্টি। 'ওকে সবাই পালা করে ভোগ করলেই তো হয়?'

রেগে উঠে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল লী, কিন্তু ওকে বাধা দিয়ে ঠাণ্ডা গলায় কীথ বলল, 'ছাড়ো, লী। ওই মেয়েকে নিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। চলো, যাওয়া যাক।' ফিরে কীথের দিকে চেয়ে ওর চোখে বিপদ সঙ্কেত দেখতে পেয়ে চুপ করে গেল লী।

'অনেক হয়েছে, চলো এবার ফেরা যাক,' আবার বলল কীথ।

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল লী। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'মরো গে যাও–চলো, কীথ,' বলেই ঘোড়া আগে বাড়াল সে।

পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গিয়েই কীথের দিকে ফিরে বলে উঠল লী, 'তুমি যদি মনে করে থাকো যে আমি…'

'চুপ করো, লী,' নিচু গলায় ধমক দিয়ে বলল কীথ। 'ওরা শুনতে পাবে।

মাথা গরম করে বোকার মত প্রাণটা খোয়ালে কার কী লাভ হবে? ওই লোকটার হাতে শটগান ছিল, দেখোনি?'

'ভয় আমি পাইনি, কীথ,' এভাবে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে আসাটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না।

'ভয় তুমি পাওনি জানি। কিন্তু মিছেমিছি ওদের সাথে বিরোধে গিয়ে কী দরকার? একটু মগজ খাটাও। একবার একটা কিছু তোমার মাথায় ঢুকলে তুমি আর বিকল্প কোন উপায়ের কথা ভাবতেই চাও না। ওরা যাক না উপরে, ওরা উঠে যাবার অল্পক্ষণ পরেই আমরাও উঠব–কে বাধা দেবে?'

সত্যিই তো! নিজের বোকামির জন্য নিজের উপরই রাগ হলো। এই সোজা কথাটা ওর মাথায় আসেনি কেন?

ক্লাইভ আপত্তি জানাল। 'তোমরা যদি ভেবে থাকো তোমাদের সাথে আমি উপরে উঠব, খুব ভুল করেছ। আমি...'

আর সহ্য করতে পারল না লী, তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল সে। 'তোমাকে আমার খুব চেনা হয়ে গেছে। আমাদের ফ্রীডম শহরে তোমার মত লোকের কোন জায়গা নেই। তুমি নিজে থেকে না গেলে তোমাকে ঘাড়ে ধরে বিদায় করার ব্যবস্থা আমি করব।'

একঘণ্টা পরে লী কীথ নো ম্যানস মেসার উপরে উঠল। কেলভিন নিকোলাসদের সাথেই থেকে গিয়েছিল, আর ক্লাইভ ফিরে গেছে।

বৃষ্টিতে সব চিহ্ন ধুয়ে গেছে। কোন্‌দিকে যাবে মনস্থির করতে পারছে না ওরা। ঠিক এই সময়েই গুলির শব্দ শোনা গেল।

পনেরো

খুব ভোরে জেকবের ঘুম ভেঙে গেল। বেশ চাঙ্গা বোধ করছে সে এখন। হোপি ইন্ডিয়ান ওষুধে খুব ভাল কাজ হয়েছে। শুয়ে শুয়েই পা-টা নাড়াতে চেষ্টা করল–আশ্চর্য! ব্যথা প্রায় নেই বললেই চলে। ডালিয়াকে না জাগিয়ে সন্তর্পণে কম্বলের নীচ থেকে বেরিয়ে এল সে।

শেষ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে আজ। তৈরি হতে হবে ওকে। কিন্তু তার আগে গতরাতে ঘুমাবার পূর্ব মুহূর্তে যে সম্ভাবনার কথা তার মনে উঁকি দিয়েছিল সেটা চেক করে দেখতে হবে।

গুহার ভিতরে একটু খেয়াল করতেই যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেল। অবাক চোখে সে লক্ষ করল বাইরের চিহ্নগুলো মুছে গেলেও গুহার ভিতরে কয়েকটা নাল লাগানো ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

তবে কী...?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। বেশি খুঁজতে হলো না। গুহার এক কোণায় পাথরের আড়ালে রাখা রয়েছে হারানো ওয়্যাগনের সোনা। চারটে মাঝারি আকারের বাক্সে

রয়েছে সোনার বার, আর নয়টা বড় থলেতে স্বর্ণমুদ্রা আর কিছু অত্যন্ত দামী হীরার অলঙ্কার।

যে ঘোড়াগুলোর পিঠে চাপিয়ে সোনা আনা হয় বুড়ো ঘোড়াটা নিশ্চয়ই তাদেরই একটা। জায়গাটা আগে থেকেই ওর চেনা ছিল বলে বৃষ্টিতে আশ্রয় নিতে সোজা এখানে চলে এসেছে।

কিন্তু সোনার পিছনে আর মিছে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তার বিশ্বাস মানুষের জীবনে সোনা কেবল অনর্থই ডেকে আনে।

ডালিয়ার দিকে চাইল সে। বেচারী নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। অনেক ধকল গেছে মেয়েটার উপর দিয়ে, তবু মুখে বিন্দুমাত্র অসন্তোষের ছাপ নেই। ঘুমন্ত অবস্থায় ওর মুখটা আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু আজ শেষ পর্যন্ত ওর ভাগ্যে কী আছে কে জানে!

বাইরে বেরিয়ে গেল জেকব। দিনের আলোয় আশেপাশের জায়গাটা খুব ভাল করে চিনে নিতে হবে তাকে। এতগুলো লোকের সঙ্গে একা লড়ে জিততে হলে যুদ্ধক্ষেত্রের সুবিধা-অসুবিধাগুলো তার জানা থাকতেই হবে।

আধঘণ্টা পরে আবার গুহায় ফিরে এল সে। ডালিয়া এখনও ঘুমোচ্ছে। ওর মাথার কাছে বসল জেকব। ঘুমের মধ্যেও যেন টের পেয়েই চোখ খুলল ডালিয়া। ওকে দেখে মিষ্টি করে হাসল সে।

যে-কোন সময়ে এসে হাজির হতে পারে ওরা। ডালিয়াকে যা বলার তা সময় থাকতে এখনই বলে ফেলা দরকার। 'শোনো লিয়া, আজ ওদের সাথে শেষ বোঝাপড়া হবে আমার। ফলাফল কী হবে কিছুই বলা যায় না। আজ যা-ই ঘটুক না কেন, এটা জেনো, তোমাকে সত্যিই ভালবাসি আমি।'

'আমিও!' বলে উঠল ডালিয়া। ওর চোখ দু'টো ছলছল করছে।

হাত বাড়িয়ে ওর গাল দু'টো আদর করে একটু টিপে দিল জেকব। 'জানো, হারানো ওয়্যাগনের সোনা এই গুহার মধ্যেই আছে। তুমি সোনা খুঁজতে চেয়েছিলে–ওগুলো সব আমি তোমাকে দিলাম।'

উঠে বসে জেকবের মাথাটা দু'হাতে নিজের বুকে চেপে ধরল ডালিয়া। 'না, সোনা আমি চাই না, জে। পৃথিবীর সব সোনার বদলে আমি শুধু তোমাকে চাই।'

দূরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেল। চোখ বুজে আরও কয়েক সেকেন্ড শক্ত করে জেকবকে বুকে আঁকড়ে ধরে রেখে ওকে ছেড়ে দিল ডালিয়া।

ঢালের মাথায় তিনজন ঘোড়সওয়ারকে দেখা যাচ্ছে।

তিনজন? তবে কি লী-র সঙ্গীরাও যোগ দিয়েছে নিকোলাসের সাথে? বাকি লোকগুলো কোথায়?

'তুমি এখানেই থাকো লিয়া, গোলাগুলির মধ্যে বেরিয়ে পোড়ো না।' এগিয়ে গেল জেকব। ওরাও নীচে নামছে। তিনশো গজের ব্যবধান। প্রায় সমতল জায়গাটায় এসে ঘোড়া থেকে নামল ওরা। আরও এগিয়ে যাচ্ছে জেকব।

তৃতীয় লোকটাকে এবার চিনতে পারল সে। কেলভিন। ওর আসল পরিচয়ও এখন আর অজানা নেই তার। ওই সতেরোজনের দল থেকে এই লোকটাই মরমন কুয়ার কাছে এসে অদৃশ্য হয়েছিল। সোনার উপর প্রথম থেকেই চোখ ছিল তার,

কিন্তু ঘুমের মধ্যে খুন হয়ে যাবার ভয়েই আগে থেকে সরে গিয়েছিল সে।

ওদের থেকে মাত্র পনেরো গজ দূরে এসে থামল জেকব। জেনেশুনেই এই ঝুঁকি নিয়েছে সে। দূর থেকে রাইফেল দিয়ে একবারে একজনের বেশি লোককে ঘায়েল করা যাবে না—বাকি দু'জন পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়বে। তখন আর এই বদ্ধ জায়গা থেকে বেরুবার কোন উপায় থাকবে না। কিন্তু সামনাসামনি ওর দুই পিস্তল দিয়ে দু'জনকে ঘায়েল করতে পারলে বাকি থাকবে একজন—একজনকে চালাকি করে ফাঁদে ফেলা তার পক্ষে খুব একটা কঠিন হবে না।

নিকোলাসই প্রথম মুখ খুলল। 'মরণের ডাক এসেছে তোমার, তাই স্বেচ্ছায় মৃত্যুর মুখে এগিয়ে এসেছ।'

ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে কেলভিনের উদ্দেশে বলল জেকব, 'তুমি সারাটা জীবন বৃথাই সোনার পিছনে ঘুরে কাটালে।'

'ওকথা বলছ কেন? আমি জানি এই মেসার ওপরই কোথাও আছে ওগুলো।'

'আমি জানি কোথায়—কিন্তু মন্টিও কি তোমাকে চিনতে পারেনি?'

চট করে মন্টির দিকে ফিরে চাইল কেলভিন।

নিঃসন্দেহ হলো জেকব। 'তোমার গালের কাটা দাগগুলোর জন্যে হয়তো ও চিনতে পারেনি তোমাকে। মরমন কুয়ার কাছ থেকে তুমিই অদৃশ্য হয়েছিলে।'

শটগান হাতে কেলভিনের দিকে ঘুরেই পরপর দু'টো গুলি করে খালি বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মন্টি।

গুলির শব্দে চকিত হলে পিস্তল বের করল নিকোলাস। কিন্তু তার আগেই জেকবের গুলিতে নিকোলাস আর মন্টি এক সাথে ধরাশায়ী হলো।

ঘোড়ার খুরের শব্দ পেল জেকব। আরও দু'জন অশ্বারোহীকে দেখা গেল ঢালের মাথায়। দ্রুত নেমে আসছে লী আর কীথ। দু'জনেরই রাইফেল তৈরি।

শান্তভাবে পিস্তল খাপে ভরে রাখল জেকব। কীথ কাভার করে আছে ওকে। নীচে নামল লী।

'বন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নিতে এসেছি আমি—তৈরি হও,' বলল সে।

'ঘটনাটা কীভাবে ঘটেছে সে তো বলেছি তোমাদের—এরপরেও কেন মিছে ঝামেলা করছ?'

'যদি তুমি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে বলে থাকো? পরপারে বন্ধুর কাছে আমি কী জবাব দেব?'

'এই কারণে তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করবে? দেখেছ ওদের কী অবস্থা হয়েছে?' মৃতদেহগুলো দেখাল জেকব।

'তোমার কথার কোনরকম কোন প্রমাণ থাকলে তোমাকেও বন্ধু বলে মেনে নিতে আপত্তি ছিল না আমার—তোমার সাহস আছে স্বীকার করি। কিন্তু আমি নিরুপায়।'

'ডেরিকের বন্ধু-ভাগ্য দেখে হিংসা হচ্ছে আমার। সে যদি তোমার মত সরল হত তবে আজ এই পরিস্থিতি দাঁড়াত না।'

'কথা বাড়িয়ে লাভ নেই—তৈরি হও।'

'তোমাকে অযথা হত্যা করতে চাই না, লী। আমি সত্যি কথাই বলেছি। বিশ্বাস করো।'

'বাজে কথা রাখো। প্রমাণ যখন নেই, তোমার কোন কথাই মানি না আমি। আর বলব না, এবার তৈরি থেকো।'

মেসার উপরে এই সময়ে একসাথে অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া গেল। লী-র দিকে চেয়ে আছে জেকব। মেসার ধারটাতে ছয়টা ঘোড়া এসে দাঁড়িয়েছে। একটা ঘোড়া দ্রুত ছুটে নীচের দিকে এগিয়ে আসছে।

'থামো, লী!' চিৎকার করে বলল ইউজিন। 'প্রমাণ পাওয়া গেছে!'

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। পিস্তল বের করে ফেলেছে লী। দেখল জেকব তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে। কোথা থেকে কী হয়ে গেল ঠিক বুঝতে পারল না লী। ভোজবাজির মত পিস্তল চলে এল জেকবের হাতে, পিস্তলের মুখে ধোঁয়া। প্রচণ্ড ঝাঁকি লেগেছে লী-র ডান হাতে। হাত ধরে বসে পড়ল সে। পিস্তলটা ছিটকে পড়ে গেছে মাটিতে।

ঘোড়া ছুটিয়ে এসে ওর পাশে নামল ইউজিন। 'প্রমাণ পাওয়া গেছে লী! ডেরিককে পিস্তল লুকাতে দেখেছে ফ্রেড। ওর মুখেই শোনো।'

বিস্ফারিত চোখে বোকার মত ইউজিনের দিকে চাইল লী। বিশ্বাসই করতে পারছে না সে এখনও বেঁচে আছে। যেভাবে দ্রুত পিস্তল বের করে গুলি করেছে জেকব তাতে সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, ইচ্ছা করলেই গুলিটা পিস্তলে না লাগিয়ে অনায়াসে ওর হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিতে পারত শক্ত-পাল্লা।

হাত বাড়িয়ে জেকবের দিকে এগিয়ে গেল ইউজিন। ওর সঙ্গীরা নীচে নেমে লী-র পশে দাঁড়াল।

'জেকব, আমার নাম ইউজিন। তোমাকে আমরা ভুল বুঝে এত হয়রানি করিয়েছি বলে আমি খুব দুঃখিত।'

ফ্রেডের কাছ থেকে পুরো ঘটনা শুনল লী। তারপর, এগিয়ে এল, 'সব আমার দোষ! আমিই সবাইকে উস্কে তোমার পিছনে লাগিয়েছিলাম। আসল ঘটনা জানলাম এখন। পারলে আমাকে ক্ষমা কোরো।'

'আমি তো জানিই তোমরা ভুল করছ, তোমার ওপর রাগ থাকলে আমার গুলি অন্যখানে লাগত,' জবাব দিল জেকব। ডালিয়া পিছন থেকে ছুটে এসে একহাতে ওকে জড়িয়ে ধরল। ওর অন্য হাতে ধরা রয়েছে জেকবের দেওয়া রাইফেলটা।

নিকোলাস, কেলভিন আর মন্টি, তিনজনই মারা পড়েছে। এর মধ্যে কেলভিনের মৃত্যুটাই সবচেয়ে বীভৎস। কাছে থেকে শটগানের দু'দুটো গুলিতে ওর দেহটা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

সবাইকে গুহার ভিতরে ডেকে নিয়ে জেকব বলল, 'হারানো ওয়্যাগনের সোনার কথা তো তোমরা সবাই শুনেছ। দেখবে সেই সোনা?'

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে সবাই। বাক্স আর থলেগুলো বের করে এনে মেঝের উপর রেখে একেএকে সব ক'টাই খুলল জেকব। এত সোনা ওরা একসাথে কেউ কোনদিন চোখেও দেখেনি।

'সত্যিই ভাগ্যবান তুমি, জেকব,' মন্তব্য করল কীথ।

'হ্যাঁ, কেলভিন সারাজীবন হন্যে হয়ে খুঁজেও যা পায়নি, ভাগ্যক্রমে সেটাই আজ আমার হাতে।' ডালিয়া এগিয়ে গিয়ে ওর কানে কানে কী যেন বলতে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়ে সে আবার বলল, 'আমার স্ত্রী বা আমার, কারোই ধন-সম্পদের প্রতি লোভ নেই। তাই আমরা ফ্রীডমের সবাইকে আমাদের শুভেচ্ছা সহ এগুলো উপহার দিলাম।'

কথাটার পুরোপুরি মর্ম বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় পার হয়ে গেল। সবাই বিস্ময়ে অভিভূত–কারও মুখে টুঁ শব্দটি নেই।

সবার পক্ষ নিয়ে লী-ই প্রথম মুখ খুলল। বলল, 'জেকব, তোমাদের প্রস্তাবটা খুবই উদার আর মহৎ। সবার কথা আমি বলতে পারি না, তবে আমি নিজে কিছুতেই তোমার এই প্রস্তাব মানতে পারব না।'

গিবনও যোগ দিল ওর সাথে। 'তোমার অনেক ক্ষতি আমরা করেছি, জেকব, কিন্তু আর না। আমাদের আর ছোট কোরো না তুমি।'

ইউজিন বলে উঠল, 'আমারও তাই মত। কিন্তু জেকব দম্পতির মহত্ত্বকে ক্ষুণ্ন করারও কোন অধিকার আমাদের নেই। তা ছাড়া ওদের সোনার প্রতি লোভ না থাকলেও নতুন জীবন শুরু করতে হলে, একটা খামার, গরু-মহিষ-ঘোড়া, এসব কেনার জন্যেও সোনার যথেষ্ট দরকার আছে। সবদিক বিবেচনা করে আমি বলতে চাই যে নিজেদের জন্যে অন্তত অর্ধেক রেখে বাকিটা ফ্রীডমের লোকদের দান করলে ব্যাপারটা মানানসই হয়। তোমরা কে কী বলো?'

ইউজিনের প্রস্তাবটাই মেনে নিল সবাই।

সব কিছুরই এমন সুন্দর মীমাংসা হয়ে গেল দেখে সব ভুলে আনন্দে জেকবকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করল লী। ব্যথায় ককিয়ে উঠল জেকব।

আবারও ভুল করেছে বুঝতে পেরে লজ্জায় লাল হয়ে ক্ষমা চাইল লী।

এই নিয়ে একই দিনে দু'বার হলো -গুণল ইউজিন। একটু মুচকি হেসে সে ভাবল: তবে কি শক্ত-পাল্লার পাল্লায় পড়ে ভাল হয়ে গেল লী?

***